সতীর সিন্দুর

(১)

"মা ?"

কেন মা হেমরাণি ?"

ভগবান কি সত্য সত্যই আছেন মা ?"

"ছিঃ ! ও কথা বলতে নাই। ও রকম সন্দেহে মহাপাপ ! আর সে পর মার্জ্জনাও নাই।"

"ভগবানকে তো আমরা দু'জনে দিনরাত ডাকছি। যদি তিনি ছন, ত আমাদের এত কষ্ট কেন মা ?"

"আমাদের এ দুঃখ কষ্ট তাঁর দেওয়া নয়তো'মা। এ আমাদেরই পর ফল !"

"তাই যদি হয়, তা হ'লে জ্ঞানে আর অজ্ঞানে, তুমি আমি ত তাঁর কাছে ন অপরাধের কাজ করি নাই মা ?"

"কেমন করে বলবো ? এ জন্মে না করলেও, পূর্ব্ব জন্মের [illegible]

দিতে পারি না মা।"

"এখন যেন কতকটা বুঝিয়াছি। কিন্তু—

"কিন্তু বলিয়া থামিয়া গেলে [illegible]

"মা—[illegible] একটাও [illegible] চলবে ?"

"ওতো আর [illegible] অভ্যস্ত ভাবনা। চলবে কার ?

তোমার আর আমার তো ? এতদিন যেমন করে চলেছে, আজও তেমনি করে চল্‌বে। চালের ভাবনাটা দূর করে দিয়ে, একবার সেই ভগবানকে ডাক দেখি। তিনিই আমাদের এ সব সামান্য অভাব মোচনের ভার নেবেন। তাঁর এই এত বড় ব্রহ্মাণ্ডে কেউ তো উপোসী থাকে না।"

"এত বিশ্বাস তোমার অই ভগবানের উপর ? এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার মনে নাই ? তোমার গর্ভে—কি হতভাগা মেয়েই জন্মেছি আমি মা !"

রাণী আর বলিতে পারিল না। তাহার পটলচেরা বড় বড় চোখ দুটি, জলে ভরিয়া আসিল। সে আঁচল দিয়া, চোখের জল মুছিয়া—বলিল, "তোমার কথাই ঠিক মা। আমি সেই ভগবানকে গিয়াই ডাকি।"

হেমরাণীর মা আদর করিয়া কন্যাকে 'রাণী' বলিয়া ডাকিতেন। আমরাও অতঃপর তাহাকে রাণী বলিয়া ডাকিব। মায়ের কথা শুনিয়া তাহার সন্দেহ-চঞ্চল হৃদয়ের ঘোর অবিশ্বাস দমন করিয়া, রাণী তাহাদের ঠাকুর-ঘরে চলিয়া গেল। গৃহে শালগ্রাম আছেন। নিত্য তাঁর পূজা হয়। তবে সে পূজা দরিদ্রের কষ্টের পূজা। রাণীর বাড়ীর পার্শ্বেই, তাদের একজন দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি কাকা আছেন। তাঁর নাম সারদা ঠাকুর। তিনি প্রত্যহ নিয়মমত নারায়ণের নিত্যপূজাটি সারিয়া যান। রাণীদের সৌভাগ্যের দিনে, তাহার পিতার জীবদ্দশায়, ইনিই বেতনভোগী পূজক ছিলেন। কিন্তু এখন বিনা বেতনেই সেই কাজ করেন।

ঠাকুর-ঘরে ঢুকিয়া, রাণী শালগ্রামের সিংহাসনের সম্মুখে অবনত হই ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিল—"নারায়ণ ! জনার্দ্দন তোমার করুণায় অবিশ্বাস করিয়া আমি যে বড়ই অপরাধিনী হইয়াছি কিন্তু এত আমার জ্ঞানকৃত অপরাধ নয় ঠাকুর ! বড় দুঃখ কষ্ট যে আমাদের। ইজগতের আর কোন সুখ চাইনা আমি। যাহাতে কাহারো দ্বারস্থ না হইয়া, [illegible] কাছে হাত না পাতিয়া, ইজ্জত বজায় রাখিয়া দিন চলিয়া যায়, তাহ

উপায় করিয়া দাও প্রভু! আর এ হতভাগিনীর মনে এমন একটা শক্তি আনিয়া দাও, যেন আর কখনও তোমার করুণার উপর আমার অবিশ্বাস না আসে।”

সেই বিশীর্ণ অথচ মালন লাবণ্যময় গণ্ডে ভাক্তর অশ্রুধারা। রাণী চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইল। তাহার প্রাণটা যেন খুব হাল্‌কা হইয়া পড়িল। তার বুকে যে একটা পাষাণের ভার চাপিয়াছিল, সেটা তখন সরিয়া গিয়াছে। প্রাণটা খুব সাহসভরা হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে রাণীর মা বিন্দুবাসিনী নীচে হইতে ডাকিলেন—“রাণি! রাণি! শীঘ্র একবার এখানে আয় দেখি?”

রাণী মায়ের আহ্বানে নীচে আসিয়া দেখিল, তাহার ধর্ম্মছেলে সনাতন চাষী, দালানে বসিয়া তাহার মার সহিত কথা কহিতেছে। এই সনাতন, রাণীদের প্রতিবেশী বলিলেই হয়। সে জাতিতে কিন্তু তাহার পৈতৃক পুণ্যে সে অপার্থিব গুণসমূহের অধিকারী। যে সময়ে রাণীর পিতার অবস্থা খুব ভাল ছিল, এই সনাতনের পিতা নবকুমার মণ্ডল, তাহাদের সেই ...য়ের একজন বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা। নবকুমার মণ্ডলের একমাত্র সন্তান এই সনাতন। রাণীকে সে ধর্ম্ম-মা বলিয়াছে। আর রাণীদের এই মহা দুঃখের দিনে প্রকৃত সন্তানের কর্ত্তব্য পালন করিতেছে।

রাণী নিকটে আসিয়া তাহার মাকে বলিল—“আমায় ডাকিলে কেন মা?”

রাণীর মা বলিলেন—“সনাতন গৌরীবেড়ে গ্রামের এক প্রজার খাজনা আজ আদায় করিয়া আনিয়াছে। এইনে তুই দশটা টাকা। একটু আগে ত ...লের ভাবনা ভাব্‌তেছিলি মা! আমার বোধ হয়, তুই ঠাকুরঘরের অই নারায়ণের কাছে, নিজের দুঃখ জানাইয়াছিস্—তাই সেই কাঙ্গালের বন্ধু আমাদের এই কপর্দ্দক বিহীন ভাণ্ডারে, এই দশটা টাকা দয়া করিয়া পাঠা...

রাণীর মুখখানা, কি যেন একটা অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে সে বুঝিল, সত্যই ভগবান অনাথের সহায়। সত্যই শ্রীনারায়ণের কৃপা হইলে অসম্ভব সম্ভব হয়। তাঁর করুণায়, এ জগতে কেহই না খাইয়া মরে না। তবে তাঁর উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতার অভাবে অনেকে "জ্যান্তে-মরা" হইয়া থাকে।

ভগবানের উপর এতটা বিশ্বাসের মধ্যেও, এই খাজনার টাকাটার অতর্কিত আগমন ব্যাপারে, রাণীর মনে যেন একটু সন্দেহ হইল। তাহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, যে এই গৌরীবেড়েতে তাহাদের কোন প্রজা নাই। সে গ্রাম এখান হইতে অনেক দূরে। অবশ্য সনাতন সময়ে সময়ে তাহাদের দূর গ্রামের খাজনাপত্র, আদায় করিয়া আনিয়া দেয় বটে। কিন্তু গৌরীবেড়ের নাম সে তো ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কাণে শুনে নাই। যতটা তার মনে পড়ে, তাহার পিতার মৃত্যুর-পর সেখান হইতে সনাতন আর কখনও খাজনা আদায় করিয়া আনে নাই।

ভিতরের কথাটা হইতেছে এই, যে এই সনাতনের একটা রোগ আছে, যে সে রাণীদের দারিদ্র-পীড়িত সেই সংসারটীর উপর একান্ত ভাবে স্নেহশীল। অনেক সময়ে কোন না কোন কল্পনাপ্রসূত অছিলায়, সে তাহাদের ধামা ভরিয়া চাউল, ক্ষেতের দাল, শাক-সবজী আর কখনও কখনও প্রজাদের খাজনা বলিয়া নগদ টাকাও দিয়া যায়। কিন্তু রাণী তাহা বুঝিতে পারে।

রাণী মনে মনে ভাবিল, এ দশটাকা সেইরূপ কোন কিছু নয় ত? কেননা তাহাদের তখনকার শোচনীয় অবস্থার সকল খবরই এই সনাতন রাখে। তাহাদের যে ভয়ানক অর্থাভাব হইয়াছে, তাহাও এই সনাতন জানে।

এজন্য সনাতনকে একটু জেরা করিবার জন্য, হেমরাণী বলিল,—"কোন গ্রামের খাজনা বলিলে সনাতন?"

তীক্ষবুদ্ধি সনাতন, তখনই রাণীর এ প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিয়া মৃদু হাসিল।

মনে মনে বলিল,—"তবে রে দুষ্ট বেটী! তুমি আমার পেট থেকে আদত কথাগুলো বার করে নেবে?"

তারপর সে বিনা সঙ্কোচে বলিল,—"গৌরীবেড়ে গ্রামে মহেশ সমাদ্দার বলে একজন প্রজা আছে। গত সনে ফসল ভাল হয়নি বলে—তারা খাজনা দিতে পারে নি। এবার বাবা গিয়ে অনেক ধমক-ধামক দিয়ে, সেই বাকী খাজনা আদায় করে এনেছেন। আর তারা তোমাদের পাওনা টাকার সুদ দিতে পারবে না বলে, সুদের বদলে আধমণ চাল পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি কি সব খবর জান মা? প্রজা-পাঠকের কথা আমার বাবা জানেন, আর এই দিদিমা ঠাকরুণ কতক কতক জানেন।"

রাণী দেখিল—সেই দালানের এক পাশে একটি চালের বস্তাও বসান রহিয়াছে। বলা বাহুল্য—তাহার বলিষ্ঠ ছেলে এই সনাতনই সেই ভারি বস্তাটি দূরগ্রাম হইতে মাথায় করিয়া আনিয়াছে।

রাণী সনাতনের কথার উপর কোন কথা বলিতে পারিল না। সে কেবলমাত্র বলিল—"অত বড় বস্তাটা মাথায় করে এসেছ তুমি! খুব মেহনত হয়েছে তোমার। আজ এখানেই প্রসাদ পাও।"

সনাতন সহাস্যে বলিল—"খাচ্ছি কার মা! সবই ত তোমাদের। আমার মা নেই। তোমাকে মা বলে খুব একটা তৃপ্তি পাই। বাড়ীতে আজ কতক কুটুমসাক্ষাৎ এসেছে। আজ এখানে খাওয়াটা ঠিক নয়।"

এই কথা বলিয়া সনাতন মণ্ডল উঠিয়া দাঁড়াইল। সে গলায় কাপড় দিয়া দণ্ডবৎ হইয়া, রাণী সুন্দরী ও তাহার মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

রাণীর পিত্রালয় হইতেছে দেবানন্দপুর। এই দেবানন্দপুরের পার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তাহার নাম কৃষ্ণরামপুর। সনাতনের পিতা এই ক্ষুদ্র কৃষ্ণরামপুরের একজন অবস্থাপন্ন চাষী। তাহার চারিখানি লাঙ্গল—পঞ্চাশ বিঘা জোত, বাড়িতে চারিটি মরাই ভরা ধান। গোয়ালে চার

পাঁচটি পয়ঃস্বিনী গাভী। বাড়ীর আশে পাশে দুইখানি ফলবান বৃক্ষভরা বাগান, পুকুরে প্রচুর মাছ, সমাজের স্বজাতীয়গণের মধ্যে সম্মান। আর তাহার উপর নবকুমার বড় তরফের জমীদার বাবুদের একজন গোমস্তা ও বর্দ্ধিষ্ণুপ্রজা বলিয়া, তাহার স্বজাতীয়েরা তাহাকে মুরুব্বি রূপে গণ্য করিত।

নবকুমার মণ্ডলের একমাত্র সন্তান আমাদের এই সনাতন মণ্ডল। নবকুমার রাণীর পিতার একজন খুব বিশ্বাসী প্রজা ছিল। নবকুমারের বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থার প্রধান কারণ হইতেছেন—বড়তরফের নিরুদ্দিষ্ট সদর নায়েব, হেমরাণীর পিতা—রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। সনাতন, বলিতে গেলে বাল্যকাল হইতে এই ব্রাহ্মণ সংসারের স্নেহের ছায়ায় মানুষ হইয়াছে। কাজেই সে আর তাহার পিতা, এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের দুঃখের অবস্থার সূচনা হইতে নানা অছিলায় ইহাদের নানা বিষয়ে সাহায্য করিয়া আসিতেছে।

কৃষ্ণরামপুর গ্রামের শেষ প্রান্তে সনাতনদের বাড়ী। মধ্যে দুই একখানি বড় বড় বাগান। কিন্তু পথটা বেড়িয়া গিয়াছে বলিয়া, রাণীদের বাড়ী হইতে সনাতনের বাড়ীর দূরত্ব যেন এক পোয়া পথের কিছু উপর।

সনাতন চলিয়া গেলে রাণী তাহার মাকে বলিল—"কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না মা!"

রাণীর মা বলিলেন—"বুঝিবার ত এতে কিছুই নাই মা! তবে আমার যেন মনে হইতেছে, তোমার পিতার নিকট এই গৌরীবেড়ে গ্রামের নাম আমি দুই একবার শুনিয়াছি।"

রাণীসুন্দরী বলিল—"হইতে পারে। কিন্তু এই আধ মণ চাল আর এই দশটী টাকা, নিশ্চয়ই সনাতনের গুপ্ত দান। কখনই গৌরীবেড়ের প্রজার খাজনার টাকা নয়।"

রাণীর মা বলিলেন—"আমারও সেই সন্দেহ হয়। কিন্তু রাণি! পরম-দয়াল ব্রহ্ম সনাতন, নিজে হাতে করিয়া বহিয়া আনিয়া ত কাহাকে কিছু

দেন না। অপর লোককে উপলক্ষ্য করিয়াই, তিনি প্রকারান্তরে দুঃস্থ আশ্রিতদের তাঁর দয়ার দান দিয়া থাকেন। আমাদের দুঃখ জানিতে পারিয়া তিনিই এই সনাতন মণ্ডলের হাত দিয়া হয়তঃ এই টাকা কয়টী ও চাউল-গুলি আমাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন। নি'তে আপত্তি কি মা? এই সনাতন তোমাকে মা বলেছে। দান হলেও সন্তানের হাত থেকে তার মা অনায়াসে দান নিতে পারে।"

হেমরাণী আর কিছু না বলিয়া সনাতনের প্রাণের মহত্ত্বের কথা ভাবিতে ভাবিতে, রন্ধন-শালায় চলিয়া গেল।

(২)

হেমরাণীর পিতার নাম ছিল, রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। তিনি "বড়-তরফের" প্রধান নায়েবের কাজে বহুদিন নিযুক্ত থাকিয়া, যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহার অধিকাংশই কন্যার বিবাহে, পূজা পার্ব্বণে, বারব্রতে ক্রিয়াকলাপে, খরচ করিয়া, নগদ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কাজেই তাহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পরিত্যক্ত দেনার জন্য আর তাঁর পত্নী ও কন্যার পেটের দায়ে, জমীজমা যাহা কিছু ছিল সবই "মহাজনি-পন্থা" অবলম্বন করিল। ক্রমশঃ এমন অবস্থা দাঁড়াইল, যে দিন চ'লা ভার হইয়া উঠিল।

রাণীর পিতা রমাপ্রসন্নের এই মৃত্যু ব্যাপারটা, খুবই কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন। তবে এ জনরব খুবই প্রবল, আর তাহার সপক্ষে প্রমাণও অনেক, যে তিনি কাশীতে বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। আবার দেবানন্দপুরের কেউ কেউ তখনও বিশ্বাস করে, যে তিনি মরেন নাই, পুলিসের ওয়ারেণ্টের ভয়ে সন্ন্যাসী সাজিয়া, জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছেন।

পুলিস কি কারণে এই রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর নামে হুলিয়া এবং ওয়ারেণ্ট

বাহির করে, সে সব কথা জানিতে হইলে, ছোট ও বড় তরফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা আগে একটু বলিয়া রাখা উচিত।

বহুদিন পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে, নিমকীর দেওয়ানি করিয়া স্বর্গীয় হরানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয় প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেন। আর এই সময়ে কয়েকখানি তালুক নীলামে খরিদ করিয়া, তিনি জমীদার রূপে খ্যাতি লাভ করেন। হরানন্দ ক্রিয়াবান্ তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন—সুতরাং পরাক্রান্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ জমীদার বলিয়া তাহার নামটা অল্প দিনেই সাধারণে জাহির হইয়া পড়িল।

হরানন্দের স্বর্গলাভের পর তাঁহার দুই পুত্র, দেবানন্দ ও রামানন্দ তাঁহার পরিত্যক্ত বিশাল জমীদারীর মালিক হইলেন। উভয় ভ্রাতায়, কয়েক বৎসর এজমালি ভাবে জমীদারী চালাইয়া, বেশ মনের সুখে কাল কাটাইলেন। কিন্তু এইভাবে শেষ রক্ষা হইল না।

কনিষ্ঠ রামানন্দ একটু কোপন স্বভাব ও ক্রুর বুদ্ধি ছিলেন। জ্যেষ্ঠের প্রচুর সামাজিক সম্মান ও সংসারে একাধিপত্য, ক্রমশঃ তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। যে সকল সামান্য কারণে, বড় বড় সংসার ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়, ক্রমে ক্রমে সেই সব কারণও দেখা দিতে লাগিল। শেষ অবস্থা এমন দাঁড়াইল—যে উভয় ভ্রাতার মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইল।

কনিষ্ঠ রামানন্দ পৈত্রিক ভদ্রাসনের অর্দ্ধাংশের মূল্য, আর সম্পত্তির চুলচেরা অর্দ্ধেক ভাগ লইয়া, তাঁহাদের পৈত্রিক বাসস্থল ধূলপুর হইতে বাস উঠাইয়া চিরজন্মের মত জ্যেষ্ঠের সহিত পৃথক হইলেন। ধূলপুর হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র গ্রামে পৈত্রিক ভিটার তুল্য এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তিনি সেই গ্রামের নাম রাখিলেন—রামানন্দপুর। ইহাই "ছোট-তরফ" বলিয়া সাধারণে পরিচিত।

জ্যেষ্ঠ দেবানন্দ, কনিষ্ঠের এই ব্যবহারে যথেষ্ট মর্ম্ম পীড়িত হইলেন বটে,

কিন্তু ভাই-ভাই কখনও একঠাঁই হয় না ভাবিয়া, তিনিও নিজ বাসগ্রাম ধুলপুর নামটিকে দেবানন্দপুরে পরিবর্ত্তিত করিয়া পূর্ণ দাপটে জমীদারী চালাইতে লাগিলেন।

ইহার পর হইতে ছোট ও বড় তরফের বাবুদের মধ্যে নানা ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া, মামলা মোকদ্দমা চলিল। আদালতের উকীল, পেয়াদা অনেক টাকা খাইল। দেওয়ানী ফৌজদারী অনেক হইল। কিন্তু মনের অমিলটা দূর হইল না।

যথাসময়ে কালধর্ম্মে একটু আগে পিছে, দেবানন্দ ও রামানন্দ পরলোক গমন করিলেন। দেবানন্দের পুত্রের নাম হেমেন্দ্রকুমার আর রামানন্দের পুত্রের নাম সুরেন্দ্রকুমার।

লোকে ভাবিয়াছিল, কর্ত্তাদের স্বর্গারোহণের পর উভয় তরফের জমীদার দুজনের মধ্যে আবার মনের মিল হইবে। কিন্তু ঘটনাচক্রবশে, তাহা হইল না। ভাঙ্গা কাচপাত্র জুড়িয়া যাওয়া বড় শক্ত কথা।

বড়-তরফের দেবানন্দের পুত্র হেমেন্দ্রকুমার নবীন বয়স্ক। তিনি সুশিক্ষিত, সুবিনয়ী, সদালাপী, পরোপকারী। কিন্তু তাঁহার খুল্লতাত পুত্র সুরেন্দ্রকুমার ঠিক তাহার বিপরীত। হেমেন্দ্রের সুযশ তাঁহার কার্য্যগুণে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু পরশ্রীকাতরপ্রাণ সুরেন্দ্রের কর্ণে এ সুখ্যাতি যেন বজ্রনাদের মত ধ্বনিত হইত। সে হিংসার জ্বালায় ছট্‌ফট করিত। কিসে অগ্রজ হেমেন্দ্রকুমার লোকের কাছে, সমাজের চোখে, অপ্রতিভ হন, কেমন করিয়া সঙ্গীন মামলা মোকদ্দমায় ফেলিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করা যায়, এই সব চিন্তাতেই সুরেন্দ্রকুমার সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিত।

তাহাদের মধ্যে যে সব কারণে মনোবাদ বাধিত, তাহার প্রধান কারণ উভয়ের বিভিন্নমুখী স্বভাব চরিত্র। সুরেন্দ্র যে প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া

জোত বাস্ত কাড়িয়া লইয়া তাড়াইয়া দিতেন, হেমেন্দ্র তাহাকে আশ্রয় দিয়া ঘর বাঁধিয়া দিতেন।

সুরেন্দ্রকুমার নষ্টচরিত্র, মদ্যপায়ী ও মৃতদার। তাহার বিপত্নীক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট চরিত্র হীনতাও ঘটিয়াছিল। সুবিধা পাইলে, দরিদ্র কুলকামিনীর উপর অত্যাচার করিতে, এই হৃদয়হীন সুরেন্দ্র কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এই সব শক্তিসামর্থ্যহীন, দরিদ্রের প্রধান সহায় ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার। তাহাদের করুণ চীৎকার হেমেন্দ্রের কাণে পৌছিলে, তিনি সাধ্যমতে তাহাদের সাহায্য করিতেন।

রাবণের কালনেমির মত, দুর্য্যোধনের শকুনির মত, সুরেন্দ্রবাবুর এই সব দুষ্কর্ম্মের সহায় ছিল, তাহার সদর—নায়েব রুদ্রবাম মণ্ডল। এই রুদ্রবামের কথা পাঠক পরে খুবই শুনিবেন।

প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে উভয় ভ্রাতায়, একটি জমীর ধান কাটা লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। আর রুদ্রবামের পরামর্শে, এই বিবাদটা দেওয়ানীতে না গিয়া, ফৌজদারী আদালতে প্রবেশ করে।

রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়, যিনি হেমেন্দ্রের পিতার আমল হইতে নায়েবী করিয়া আসিতেছেন,—আর তখনও সর্ব্ব বিষয়ে হেমেন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন, তিনি ফৌজদারী মামলাকে বড় ভয় করিতেন। কিন্তু তিনি হইতেছেন এক পরাক্রান্ত জমীদারের সদর নায়েব। সুতরাং এ সব মোকদ্দামা উপস্থিত হইলে, তদারক ও তরিবতের জোরে, মামলায় জয়লাভ করিয়া প্রভুর প্রাধান্য বজায় রাখিতেন। এসব কাজে উপস্থিত বুদ্ধি তাঁহার খুব ছিল।

এই ধানকাটা উপলক্ষ্য করিয়া ছোট—বড় তরফের মধ্যে যে বিবাদ বাধিয়াছিল, তাহাতে ছোটতরফের কূটবুদ্ধি নায়েব রুদ্রবামের চেষ্টা ও প্রতিপক্ষের সাক্ষী ভাঙ্গাইবার ও মিথ্যা সাক্ষীজোগাড় করিবার তরিবতে

ছোটতরফই সেবার মামলায় জয়লাভ করেন। আর এই পরাজয়ে রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বড়ই দমিয়া পড়েন।

হেমেন্দ্রকুমার এই পরাজয়ের জন্য তাঁহাকে কোন অনুযোগ না করিলেও রমাপ্রসন্ন তাঁহার প্রধান শত্রু, ছোট তরফের নায়েব রুদ্ররামের সহিত, বুদ্ধির সংগ্রামে পরাজিত হইয়া, বড়ই মর্ম্ম পীড়া ভোগ করিতে লাগিলেন। তাহার উপর এই রুদ্ররামের চেষ্টাতেই খুনজখমের দাবিতে তাঁহারই নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হওয়ায়, তিনি নিরুপায় হইয়া মনিবকে না বলিয়া, গোপনে দেশত্যাগ করিলেন।

রমাপ্রসন্নের দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার পরিবারবর্গের বড়ই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নায়েবী করিয়া যে কিছু বিষয় সম্পত্তি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা একে একে গোপনে বাঁধা পড়িতে লাগিল। তাঁহার বিধবা, স্বামীর ঋণশোধ ও সংসার চালাইবার জন্য সেগুলি বন্ধক দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহা উদ্ধারেরও কোন উপায় রহিল না। সুদে সুদে, তস্য সুদে, ঋণের টাকাটা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, নগদ যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যা হেমরাণীর বিবাহে ও জগদ্ধাত্রী কালীপূজা প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্মে জাঁকজমক করিয়া, সবই ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

কেবল পুলিসের ওয়ারেণ্টের ভয়ে নয়, এর পূর্ব্ব হইতে আর একটী ব্যাপারে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মনটা বড়ই দমিয়া পড়িয়াছিল। সে কারণটী বলিতে গেলে, তাঁহার গুণধর জামাতা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা প্রয়োজন।

সে কালের পাশকৌলিন্য বিহীন দিনেও, অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, প্রায় দুই হাজার টাকার বিনিময়ে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে যুবককে তাঁহার জামাতা রূপে পাইয়াছিলেন—তাহার নাম রাসমোহন। রাসমোহনের পিতার অবস্থা খুবই ভাল ছিল। এই জন্যই তিনি এই উন্নত অবস্থার গৃহস্থ পুত্রের

সহিত, তাঁহার একমাত্র আদরিণী কন্যা হেমরাণীর বিবাহ দেন। কারণ তিনি আশা করিয়াছিলেন, যে প্রথমে কিছু বেশী খরচ করিলে মেয়েটী যদি চিরদিন সুখে থাকে, সেটা দেখিতে শুনিতে সকল দিকেই ভাল। তিনি রসালের রসপ্রার্থী হইয়াছিলেন—পাইলেন কিন্তু তিক্ত মাকাল। রাজপুত্রের মত দেখিতে অতি সুন্দর হইলেও বিধাতা রাসমোহনকে যেন সকল রকমের শয়তানি বুদ্ধিতে পুষ্ট করিয়া, এ ধরায় পাঠাইয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহা ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই, তাঁহার কন্যার ভাগ্য অন্ধকারময় হইয়া পড়িয়াছিল। আর এই রাসমোহনের পিতা, রুদ্ররামের এক গ্রাম বাসী। রুদ্ররাম তখন বড়তরফে রমাপ্রসন্নের অধীনস্থ কর্ম্মচারী। সেই-ই এই বিবাহের ঘটকালি করিয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর এই কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবক রাসমোহন তাঁহার পিতৃত্যক্ত বিষয়গুলি ওয়ারিশান সূত্রে পাইয়া, কুক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িল। বিষয়ের পনর আনা সে দুই এক বৎসরের মধ্যেই নষ্ট করিয়া ফেলিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার জামাতার এই মতিচ্ছন্ন অবস্থা দেখিয়া, বহুবার এ সম্বন্ধে তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন, তিরস্কার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সেই বিকৃতবুদ্ধি দুষ্ট পথানুসারীর সুবুদ্ধি সঞ্চার হইল না দেখিয়া, অতি ত্যক্ত হইয়া তিনিও হাল ছাড়িলেন।

সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট করিয়াও এই নরকুলকলঙ্ক রাসমোহনের একটুও চৈতন্য সঞ্চার হইল না। কলিকাতার মত প্রলোভনময় সহরে অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকিলে, অনেক মতিচ্ছন্ন যুবকের যে শোচনীয় পরিণাম ঘটে, রাসমোহনের তাহাই ঘটিল।

তাহার গৃহ আলো করিয়া উদ্ভিন্নযৌবনা পরমাসুন্দরী পত্নী হেমরাণী। হাজারের মধ্যে অমন একটা নিখুঁত সুন্দরী মেলে কিনা সন্দেহ! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—ছন্নমতির দোষে, পত্নীর এই ভুবন আলো করা রূপ

আর তাহার হৃদয়ের মহত্ত্বভরা শ্রেষ্ঠ গুণ গুলি, কিছুতেই এই হতভাগ্য রাসমোহনকে কুপ্রবৃত্তির পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। সে দেবীকে পদদলিত করিয়া, এক প্রেতিনীকে আশ্রয় করিয়া, রসরঙ্গে জীবনের দিনগুলি কাটাইতে লাগিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়—জনরব মুখে সবই শুনিতেন, আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, অসহ্য মর্ম্মবেদনায় বলিয়া উঠিতেন—"ভাগ্য! কর্ম্মফল!! আমি ত কন্যাকে সুখী করিবার জন্য অর্থ ব্যয়ের ত্রুটি করি নাই!"

বহুদিনের পর রাসমোহন তাঁহার শ্বশুরকে পত্র লিখিয়া, অনেক হেতুবাদ দেখাইয়া, হেমরাণীকে তাহার পৈত্রিক ভিটায় আনাইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় জামাতা বাবাজীউর সুমতি হইয়াছে ভাবিয়া, সালঙ্কারা কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইলেন। আর এই হতভাগ্য জামাতা রাসমোহনের ছন্নদশার ফলে, পনর দিন পরে নিরালঙ্কারা হেমরাণী মলিনমুখে, পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল।

বলা বাহুল্য—পত্নীর অলঙ্কার গুলির উপরই এই হতভাগ্য রাসমোহনের একটা প্রবল আকর্ষণ জন্মানতেই, সে হেমরাণীকে বহুদিন পরে স্বগৃহে আনাইয়া, কৌশলে সেই সরলার অলঙ্কারগুলি হস্তগত করিয়া, একদিন প্রত্যুষে গোপনে কলিকাতায় পলাইয়া গেল। তাঁহার সংসারে এক বৃদ্ধা পিসি বই তখন আর কেহই ছিল না। পিসিমা এই গুণধর ভাইপোটীকে লইয়া হাড়েনাড়ে জ্বালাতন হইয়া সর্ব্বদাই নিজের মৃত্যু কামনা করিতেন। আর তাঁহাকে অক্ষয়বটের মত দীর্ঘ পরমায়ু দানের জন্য, তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে সহস্রবার অভিসম্পাত করিতেন।

এই ঘটনার পরদিন মধ্যাহ্নে এই পিসিমাই কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ হেমরাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৌমা! তোমার শাশুড়ী অতি ভাগ্যবতী, তাই সে এসব জ্বালা না সহিয়া আগেই চলিয়া গিয়াছে। আমার এ গুণধর ভাইপোটীর রকম সকম আমিও ভাল জানি।

অই হতভাগা বখাটে যখন তোমার গয়নাগুলি পাইয়াছে, তখন আর সহসা বাড়ী ফিরিতেছে না। তা—এখানে থাকিয়া তোমার ফল কি মা? বৃথা কেন কষ্ট পাইবে? তোমাকে আজই দেবানন্দপুরে পাঠাইয়া দিব।"

কচি বউ হেমরাণী, মুখ ফুটিয়া পিসিমার এ ব্যবস্থার উপর কোন কথা কহিতে পারিল না বটে, কিন্তু সে মনে মনে বলিল—"তাহা হইলেও এখানে থাকায় আমার অনেক সুখ। একদিন না একদিন তিনি তো এ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে পারেন। মার মুখে শুনিয়াছি, স্বামীর-ভিটা স্ত্রীলোকের পবিত্র তীর্থ। তা সেখানে যত দুঃখকষ্ট হোক না কেন, মুখ বুজিয়া থাকিলেই ইহ পরকালে মহা পুণ্য।"

কিন্তু তাহার হৃদয়ের নিভৃত-কন্দরে উত্থিত এই মর্ম্ম কথাগুলি, মনেই রহিয়া গেল। সে মুখ ফুটিয়া পিসিমার সম্মুখে কিছুই বলিতে পারিল না। আর—রোরুদ্যমানা পিসিমা, তাহার এই মৌনভাবটীকে সম্মতিলক্ষণ জানিয়া, নিজের কষ্ট সঞ্চিত টাকা হইতে একখানি পালকী ভাড়া করিয়া, তাঁহার ভাইপো বউ হেমরাণীকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

বলা বাহুল্য—হেমরাণীর পিতা রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়, জামাতার এই পিশাচোচিত নিষ্ঠুরতায় বড়ই মনে আঘাত পাইলেন। জামাতা কর্ত্তৃক অপহৃত এই অলঙ্কারের জন্য, তিলমাত্র তাঁর মনক্ষোভ হয় নাই। কিন্তু বিনাদোষে যে নরাধম এমন সুশীলা, সুরূপসী, সুগুণান্বিতা পত্নী ত্যাগ করিয়া, এক কলঙ্কিতার সেবার জন্য সহধর্ম্মিণীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে পারে, তাহার কৃতপরাধ কখনই মার্জ্জনাযোগ্য নয়। তাহার মুখদর্শনেও পাপ।

ঠিক এই ঘটনার দুইমাস পরেই ছোট ও বড় তরফের জমীদারদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ফৌজদারী বাধিল। সে ফৌজদারীতে খুন জখমও হইল। এই সাংঘাতিক বিবাদে, খুন জখম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী হইলেও শত্রুপক্ষ পুলিসকে হস্তগত করিয়া, মিথ্যা রিপোর্ট দিয়া, তাঁহার

নামেই ওয়ারেণ্ট বাহির করাইল। বলা বাহুল্য, প্রতিপক্ষের দুষ্টবুদ্ধি নায়েব রুদ্ররামই ইহার প্রধান উদ্যোগী। এই স্থলে রুদ্ররাম ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মধ্যে শত্রুতার কারণটী বলিয়া রাখা ভাল।

ছোটতরফের প্রধান কলকাটী রুদ্ররাম নানা কারণে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শত্রু হইয়া উঠে। তাহার প্রধান হেতু এই যে, এই রুদ্ররাম এক সময়ে বড় তরফের অধীনে মফঃস্বলের গোমস্তার কাজে বাহাল হইবার জন্য, খুব একটা চেষ্টা করে। কিন্তু সদর নায়েব, এই রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী তাহাতে একটু বাধা প্রদান করেন। তাহার কারণ, এই রুদ্ররামের তহবিল তছ্ রুপের সম্বন্ধে বড়ই একটা দুর্নাম ছিল।

তাহা হইলেও কৈবর্ত্তজাতীয় এই রুদ্ররাম, চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া, শেষ গোমস্তাগিরি চাক্‌রিটী পাইল। পাঁচ ছয়মাস কাল চাক্‌রি করিবার পর রমাপ্রসন্ন তাঁহার কোন বিশ্বাসী কর্ম্মচারির নিকট হইতে গোপনে সংবাদ পাইলেন, যে নব-নিযুক্ত গোমস্তা রুদ্ররাম, বিপক্ষ পক্ষের জমীদার সুরেন্দ্রবাবুর টাকা খাইয়া, বড় তরফের অনেক প্রজাকে ভাঙ্গাইয়া, ছোট তরফের জমীদারীতে বাস করাইবার চেষ্টা করিতেছে।

রমাপ্রসন্ন তাঁহার মনিবকে সবকথা জানাইয়া, ব্যাপারটীর তথ্যানুসন্ধান জন্য কয়েক জন মাতব্বর প্রজাকে দেবানন্দপুরের সদর কাছারিতে আনাইলেন। বলাবাহুল্য, রুদ্ররামের অপরাধটা এই সব প্রজাদের সাক্ষ্য হইতেই হাতে হাতে প্রমাণ হইয়া গেল। প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে, রুদ্ররামের চাক্‌রী গেল। সে এই জন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপর খুবই জাতক্রোধ হইল। আর সামান্য চেষ্টাতেই ছোট তরফের অধীনে এক নায়েবী চাক্‌রী জোগাড় করিয়া, রমাপ্রসন্নের উপর প্রতিশোধ লইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

ধানকাটা লইয়া পূর্ব্বোক্ত ফৌজদারিতেই তাহার প্রতিশোধের প্রথম চেষ্টা সফল হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন দেখিলেন, যে তিনি ফৌজদারী মোকদ্দমার

প্রধান আসামী, আর তার উপর এই সাক্ষাৎ শয়তান রুদ্ররাম তাঁহার বিপক্ষে খুনের দাবিটা প্রমাণের জন্য উঠিয়া প্রড়িয়া লাগিয়াছে, তখন নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে তিনি সহসা গা-ঢাকা দিতে বাধ্য হইলেন। এ দুনিয়ার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া, সংসারের উপর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বড়ই একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। তাঁহার একমাত্র আদরিণী কন্যা হেমরাণীর উপর জামাতার সেই কঠোর হৃদয়হীন ব্যবহার, আর এই সাংঘাতিক ফৌজদারী মোকদ্দমাই ধরিতে গেলে, তাঁহাকে দেশত্যাগী করিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দেশত্যাগে দমিয়া না গিয়া তাঁহার প্রভু হেমেন্দ্রবাবু জেলাকোর্টের ভাল ভাল উকীল মোক্তার নিযুক্ত করিয়া, খুনী মোকদ্দমার তদ্বির আরম্ভ করিলেন।

প্রধান আসামী রমাপ্রসন্নের নামে, ওয়ারেণ্ট ও হুলিয়া পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। কিন্তু পুলিস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কোন সন্ধান না পাওয়ায় মোকদ্দমাটা 'অশ্বত্থামাহতইতিগজ' গোছ হইয়া শেষ হয়।

নানা স্থানে গোপনে লোক পাঠাইয়া, হেমেন্দ্রবাবু তাঁহার সদর নায়েবের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। কেবল তিনি কেন—পুলিসও হুলিয়া জারি করিয়া, প্রধান আসামী রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীকে ধরিবার অনেক চেষ্টা করিয়া শেষ নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িল।

ইহাই হইতেছে, রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর দেশত্যাগের কথা। এখন তাঁহার অনাথিনী পত্নী ও স্বামী পরিত্যক্তা কন্যাকে লইয়া, আমাদের উপন্যাস আরম্ভ করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই চক্রবর্ত্তী পরিবারের একদিন বড়ই সুখের দিন ছিল। বড় তরফের জমীদারের সদর নায়েব এই রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর বাড়ীখানি, একদিন প্রজা-পাঠকের আগমনে, ক্রিয়াকর্ম্মে, পালপার্ব্বণে, কোলাহল-সংকুল অবস্থাপূর্ণ ছিল। আর রমাপ্রসন্নের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে, সে

সব আনন্দের দৃশ্য যেন ছায়াবাজির মত সরিয়া গেল। যখন অনেক চেষ্টা করিয়াও নিরুদ্দিষ্ট চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন তাঁহার স্নেহময় মনিব হেমেন্দ্রকুমার, নিজেই তাঁহার সন্ধানে বারাণসী ক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। কেন না তিনি শুনিয়াছিলেন, কাশীর বাঙ্গালীটোলার এক নিভৃত পল্লীতে রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আত্ম-গোপন করিয়া আছেন।

কিন্তু এই উদ্যমশীল নবীন জমীদারের অতি সতর্ক অনুসন্ধান চেষ্টা, একেবারেই নিষ্ফল হইল। তিনি সেই মহল্লার কোন পরিচিত লোকের মুখে কথাপ্রসঙ্গে শুনিলেন, তাঁহার কাশী পৌছিবার এক মাস আগে বিসূচিকা রোগে, রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর দেহান্ত হইয়াছে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে বাড়ীতে থাকিতেন, তাহা কেদারঘাটের নিকট এক সরু গলির ভিতর। অনেক কষ্টে, তিনি সে বাড়ীর সন্ধান করিলেন। বাড়ীখানি ছোট—আর ভাড়াটিয়া বাড়ী। বাড়ীর মালেক একজন হিন্দুস্থানী। কিন্তু চেষ্টা করিয়াও এই মালেকের কোন সন্ধান মিলিল না। আর সে বাটীও তখন জনশূন্য। কারণ—তাহার বহির্দ্বারে চাবি লাগান।

সেই পল্লীর আরও দুই একজন অপরিচিত কাশীবাসী বাঙ্গালীর নিকট অনুসন্ধানে হেমেন্দ্রকুমার জানিলেন—সেই তালা দেওয়া বাটীতে যে ব্রাহ্মণের দেহান্ত হয়, তাঁহার নিবাস ছিল দেবানন্দপুর।

এই রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, জমীদারী শাসনব্যাপারে হেমেন্দ্রকুমারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার পিতার আমলের কর্ম্মচারী তিনি। তাঁহার পিতা জমীদারীর যা কিছু উন্নতি করিয়াছিলেন, কিম্বা নূতন তালুক মুলুক কিনিয়াছিলেন, অর্থাগমের উন্নতি করিয়াছেন, তার মূলে ছিলেন—এই রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। সুতরাং এই প্রভুভক্ত কর্ম্মচারীর নিঃসহায় অবস্থায় প্রবাসমৃত্যু, তাহার প্রাণে বড়ই আঘাত করিল।

নবীন জমীদার হেমেন্দ্র, কাশীতে অতি সাবধানতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিলেন, দেশে ফিরিয়া আসিয়া সে সংবাদ, মৃতের পত্নী ও কন্যাকে জানাইতে বিরত হইলেন না। কারণ—এটা তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গত কর্ত্তব্য, আর কতকগুলি শাস্ত্র-সম্মত ক্রিয়া ইহার সহিত জড়িত।

হেমেন্দ্রবাবু জানিতেন, যে তাঁহার সদয়-নায়েব এই রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, চিরদিনই খরচে লোক ছিলেন। তিনি বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এ জন্য দুই পুরুষের বিশ্বাসী এই কর্ম্মচারীর অনাথ পরিবারবর্গের কষ্ট মোচনের জন্য, তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নীর নিকট গোপনে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য—রমাপ্রসন্নের তেজস্বিনী পত্নী, বিন্দুবাসিনী দেবী অতি বিনয়ের সহিত সে গুলি ফিরাইয়া দিয়া, বলিয়া পাঠাইলেন—"আপনার খাইয়াই আমরা মানুষ। আমার পরলোকগত স্বামী, যখন আপনাদের অন্নেই প্রতিপালিত, তখন যে কোন সাহায্য আপনি আমাদের করিবেন, তাহা আমরা সানন্দে লইব। কিন্তু এখনও আমাদের সে শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয় নাই। যখন হইবে, তখন আমরাই আপনাকে জানাইব।"

বলা বাহুল্য—ইহার পর হইতে হেমেন্দ্রকুমার এই অনাথ পরিবারকে কোনরূপ অর্থ সাহায্য করা সম্বন্ধে, আর কোন প্রস্তাব করেন নাই।

ইহার পর স্বামীর দেনার দায়ে, পেটের দায়ে, হেমরাণী ও তার মার বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইল। সে কষ্ট অতি ভয়ানক! কোন দিন দু'বেলা জোটে, কোন দিন তাও হয় হয় না। যেমন মা, তেমনি মেয়ে। লোকের কাছে হীনতা জানাইতে কেহই প্রস্তুত নহে। কিন্তু ভগবান যেন তাহাদের এই নিরাশ্রয় অবস্থা বুঝিয়া, সনাতনকে তাহাদের সাহায্যের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া দিলেন।

(৩)

ভগবানে বিশ্বাসী কোন ভাবুক ভক্ত একদিন মনের আবেগে গাহিয়াছিলেন—

"দয়াময় ! এ দীনের দিন যাবে বই আর রবে না।"

কথাটা খুবই সত্য। দিন সবারই যায়, তবে সুখে আর দুঃখে। আনন্দে আর নিরানন্দে। হাসিমুখে, আর চোখের জল ফেলিয়া। অনাদি কাল হইতেই, এই সনাতন নিয়ম অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। আর পৃথিবীর ধ্বংশ পর্য্যন্ত চলিবেও এই ভাবে।

সুতরাং এই সনাতন নিয়মের অধীনে হেমরাণী ও তাহার অভাগিনী মাতার দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

সহসা এক দিন এক গ্রাম্য পোষ্ট পিয়ন আসিয়া হাঁকিল—"একখানা চিঠি আছে গো মা ঠাক্রোণ !"

পোষ্ট-পিয়নের উচ্চ চীৎকার রাণীর কাণে পৌছিল। সে ভাবিল, কই তাহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে কেহই ত খোঁজ করিয়া তাহাদের আর পত্রাদি লেখে না। সুখের দিনে যাহারা খুব আপনার ছিল, এই দুঃখের দিনে তাহারা খুবই পর হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও, সহসা চিঠি আছে কথাটা শুনিয়া, রাণীর প্রাণটা যেন ছনাৎ করিয়া বাজিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল—"তবে কি তাঁর চিঠি ! এ ও কি সম্ভব ?"

রাণীর মা আধ-ঘোমটায় মুখটি আবরণ করিয়া, দ্বারের অপর দিক হইতে বলিলেন—"চিঠিখানা ঐখানে রাখিয়া যাও বাছা। আমি লইতেছি।"

পিয়ন সদর দরোজার চৌকাঠের উপর চিঠিখানা রাখিয়া চলিয়া গেল। বিন্দুবাসিনী দেবী সেই চিঠিখানি তুলিয়া লইয়া সদর দ্বারে খিল দিয়া, ভিতরে

আসিয়া রাণীর হাতে চিঠিখানি দিয়া বলিলেন—"পঁড়ে দেখ্‌তো মা রাণি এতদিনের পর আবার আমাদের মত দুঃখীদের চিঠি লিখ্‌লে কে ?"

রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তাঁহার কন্যা হেমরাণীকে চলন সই বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। রাণী সেই চিঠির হস্তাক্ষর চিনিতে পারিয়া, আগ্রহের সহিত তাহা খুলিয়া পড়িল। চিঠিখানি ছোট, আর তাহাতে লিখিত কথাগুলি সোজাসুজি ধরণের হইলেও, রাণীর মনে একটা খুব মস্ত ভাবনা আনিয়া দিল। আর এই আগন্তুক ভাবনায়, তাহার সেই হাস্য প্রফুল্ল মুখখানি, যেন আরও মলিন হইয়া গেল।

বিন্দুবাসিনী কন্যার এ পরিবর্ত্তিত মুখভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"জামাইএর চিঠি বুঝি—রাণি ?"

রাণী একটী ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হাঁ"।

বিন্দু। তা চিঠি পড়ে তোর মুখখানা শুখিয়ে গেল কেন ? খবর সব ভাল ত ? বাছা আমার ভাল আছে ত ?

রাণী। তাঁর খপর ভাল। কিন্তু—

সে আর বলিতে পারিল না। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অনেক কষ্টে সে আত্মসম্বরণ করিয়া স্থিরভাবে মনটাকে বাঁধিলেও, তাহার মা বুঝিলেন চিঠির মধ্যে এমন কোন চিন্তাজনক কথা আছে, যাহা পড়িয়া রাণী এতটা বিচলিত হইয়াছে।

কন্যার অবসন্ন মনের মধ্যে একটু সাহস জাগাইয়া দিবার জন্য, বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"চিঠিখানি পড় দেখি শুনি"।

রাণী অনুচ্চস্বরে চিঠিখানি পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল—

সাবিত্রী সমানেষু—

"হেমরাণি! আমি তোমার উপর বড়ই অন্যায় করিয়াছি। আর এজন্য এখন বড় অনুতপ্ত হইয়াছি। আমি দুই চারি দিনের মধ্যে তোমাদের বাটী যাইব। আমার

কষ্টে দিন কাটিতেছে। হাতে একটীও পয়সা নাই। শুনিয়াছি, স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয় যথেষ্ট নগদ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁর জামাতা। সুতরাং তাহার কতক পাইবার আশা রাখি। যাহা হউক সাক্ষাতে সকল কথা হইবে।" আশীর্ব্বাদক—শ্রীরাসমোহন শর্ম্মা।

জামাতার এই অপ্রত্যাশিত পত্রের অর্থটী অবগত হইবামাত্রই, বিন্দুবাসিনীরও মুখখানা দুশ্চিন্তার মেঘে মলিন হইয়া উঠিল। যে জিনিসটার তাঁদের খুবই অভাব, তাঁহার জামাতা একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসে পড়িয়া, সেইটীরই দাবি করিতেছেন। কি করিয়া কি হইবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া, তিনি মলিনমুখে কন্যাকে বলিলেন—"কি হবে মা তা'হলে ?"

রাণী বলিল—"একটু আগে ভগবানে বিশ্বাস করিয়া আমরা যে ফল পাইয়াছি, এইবার সেইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসেই আমাদের এই ভাবনার কুলকিনারা পাইব। মা! ভগবানে বিশ্বাস কর। ভগবান ইচ্ছা করিলে, তোমার জামাতা এখানে আসিয়া হয়তঃ আমাদের প্রকৃত অবস্থা, অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া নিশ্চয়ই তাঁর দয়া হইবে।"

এই বিশ্বাসটা রাণীর প্রাণের নিভৃত স্তরের। কাজেই সে উপস্থিত দুশ্চিন্তা ভুলিয়া, বহুদিন পরে স্বামী আসিতেছেন এ সংবাদে, খুবই আনন্দিত হইল।

রাণী এখন পূর্ণ যুবতী। ষোলকলা চাঁদের সৌন্দর্য্যের মত, তাহার প্রত্যেক অঙ্গে, যৌবনের অফুরন্ত লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামী যে কি জিনিষ, দীর্ঘ বিরহের অনাদরের ও উপেক্ষার ফলে তাহা সে খুব ভালরূপই বুঝিয়াছে। আরও সে বুঝিয়াছে, পিপাসিতের পক্ষে যেমন তৃষ্ণার বারি, চির দরিদ্রের চক্ষে যেমন দ্রবিণরাশি, চির রোগীর পক্ষে যেমন শান্তিকর মহৌষধ অতি দুর্ল্লভ বস্তু, এখন এই স্বামীও তাহার পক্ষে তাই।

আশায় আশায় সে দুইটী দিন কাটাইল। আগে সে কেশ রচনায় বড়

একটা মন দিত না, মায়ের তাড়া খাইয়া কখন কখন তেলের বাটী, আয়না চিরুণী লইয়া বসিত বটে, কিন্তু এ সংবাদ পাইবার পর তাহার নিজের চির সুন্দর কান্তিটিকে আরও সমুজ্জ্বল করিবার জন্য তাহার বড়ই সাধ হইল। একদিন অপরাহ্ণে সে খুব ভাল করিয়া চুল বাঁধিল। ধুইয়া পুঁছিয়া, মাজিয়া ঘসিয়া, সেই সুন্দর মুখ খানি আরও সুন্দর করিল। সীমন্তের সিন্দুর রাগ আরও উজ্জ্বল করিয়া দিল। বিধাতা তাহাকে যে অনুপমের রূপরাশি দিয়াছেন, সামান্য চেষ্টাতে তাহা যেন আরও ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার এ সাধন প্রসাধন বিফলে গেল না। কেননা সেইদিন আকাশ-ললাট হইতে অস্তগামী তপনের আরক্ত কিরণরাগ মলিন হইবার পূর্ব্বে, একজন তাহাদের বাটীর বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"বাড়ীতে কে আছেন গা?"

রাণী ও তাহার মা, প্রতিদিনই উৎকণ্ঠার সহিত জামাতা রাসমোহনের আগমন প্রত্যাশা করিতেছেন। বিন্দুবাসিনী এই নূতন আগন্তুকের কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন, তাঁহার জামাতা রাসমোহনই তাঁহার বাটীর দ্বারে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত।

মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া, রাণীর মা তাড়াতাড়ি সদর দরোজা খুলিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—"এস বাবা এস! এতদিন পরে কি আমাদের মনে পড়িয়াছে?"

রাসমোহন শাশুড়ীর পদধূলি লইয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"আপনারা কেমন আছেন সব? উপস্থিত সংবাদ ভাল ত?"

শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ, যথাসময়েই রাসমোহনের কাণে পৌঁছিয়াছিল। তার পর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সহিত দুই তিন বৎসর পরে দেখা। তার উপর এই নীরস কঠোর কুশল প্রশ্ন!

বিন্দুবাসিনী, শোকোচ্ছ্বাস রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"ভগবান এখন আমাদের যে অবস্থায় রেখেছেন, তাইতেই কষ্টে শ্রেষ্টে দিনগুলি চলে যাচ্ছে!"

শাশুড়ীর এই উত্তরে রামমোহনের মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে চায় অর্থ—কিন্তু এ যে দারিদ্রের উচ্ছাসরুদ্ধ অস্ফুট ক্রন্দন!

সে সবিস্ময়ে দেখিল, সেই বাটীর চারিদিকেই যেন একটা মলিনতার ছায়া। উঠানে---ঘাস জঙ্গল। দীর্ঘকাল বেমেরামতী অবস্থার জন্য, লোণা ধরিয়া দেয়ালের নানা স্থানের বালী খসিয়া পড়িতেছে। রান্নাঘরের চালের খড় গুলি অনেক স্থানেই বিরল। রামমোহন মনে ভাবিয়াছিল, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যুর পর, তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির আয়ে তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও পত্নী খুব সুখেই আছে। কিন্তু তাহাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, তাহার হরিভক্তি উড়িয়া গেল। তাহার মনটা খুব দমিয়া পড়িল। সে সেই বাটীর চারিদিক দেখিতে দেখিতে, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নির্দ্দেশিত একটী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

বাড়িটী একতালা। দোহারা দালান। ছাদের উপরে একটী ছোট ঘর, সেটি গৃহদেবতা নারায়ণের অবস্থান মন্দির।

উঠানের এক প্রান্তে মাটীর দেওয়াল দেওয়া বড় একটী রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, গোয়াল ঘর ছিল। এই পাঁচ ছয় বৎসরের অযত্নেও বেমেরামতে তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। উঠানের উত্তর কোণে যে ধানের মরাইটী ছিল, তাহা এখনও আছে বটে, কিন্তু তাহা ধান্য শূন্য আর মরাইয়ের বাহ্যিক অবস্থাও অতি শোচনীয়।

বহুদিন পরে শ্বশুর বাড়ীতে পত্নী সন্দর্শনে আসিয়া, রামমোহনের মুখে কোথায় একটা প্রফুল্লতার বিকাশ হইবে, তাহা না হইয়া তাহার মুখে এরূপ একটা বিরক্তি ও অসন্তোষের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল, যে সে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে, যেন একটু সংকোচ বোধ করিতে লাগিল। সে মনে মনে বিরক্তির সহিত বলিল—"দূর ছাই! না জানিয়া শুনিয়া এদের ভিতরের সকল খপর না লইয়া, এখানেই বা মরিতে আসিলাম কেন? ধুলো পায়েই না হয়

চলিয়া যাই।" তারপর আবার সে মনে ভাবিল—"আমার গায়ে ত হাজার হোক্ একটা মানুষের চামড়া আছে। এরূপভাবে সহসা চলিয়া যাওয়াটা একাবারেই ভাল দেখায় না।" কাজেই সেই গুণধর রাসমোহন, তখনকার মনের বিরক্তিটা মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া, আগন্তুক ঘটনাস্রোত কোথায় পৌছায়, তাহার সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আহারাদির ব্যবস্থা, যত্ন পরিচর্য্যা, রাণীদের তখনকার অবস্থার অনুরূপ যতটা হওয়া সম্ভব, তাহার কোন ত্রুটিই হইল না। সনাতনের আনীত সেই দশটী খাজনার টাকায় হয়তো তাঁহাদের একটী মাস চলিয়া যাইত। কিন্তু জামাতার এক দিনের অর্চ্চনার জন্য তাহার অর্দ্ধেক নিঃশেষ হইয়া গেল। সেই ভাঙ্গাবাড়ীতেও শুভ্রমল্লিকাবৎ সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র রোহিত মৎস্যমুণ্ড, ঘনদুগ্ধ, মুখরোচক ব্যঞ্জনাদির কোন অভাবই হইল না।

পরিচর্য্যার এইরূপ উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা দেখিয়া, সেই নষ্টচরিত্র রাসমোহন মনে মনে ভাবিল—"রাগ করিয়া তখন যে চলিয়া যাই নাই, ভালই করিয়াছি। ইহাদের বাহিরের হাল দেখিয়া যতটা গরীব বলিয়া বোধ হইতেছিল, বোধ হয় ইহাদের ভিতরটা তত শূন্য নয়। শ্বশুর মহাশয় নিশ্চয়ই কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। তা না হইলে আজ আমার জন্য এতটা আয়োজনের ঘটা কেন?"

কিছু নগদ হাতাইবার একটা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে ভাবিয়া, রাসমোহন তামাকু সাজিয়া, তাহার ছোট হুকাটির মুখে আধহাত একটী নল লাগাইয়া, এক মনে তামাকু টানিতে লাগিল। কলের চিমনির মুখ দিয়া যেমন গল্‌গল্ করিয়া ধোঁয়া বাহির হয়, হুঁকার নলের মুখ দিয়া প্রতিটানের সঙ্গে সেই রকমভাবে প্রচুর ধূমপুঞ্জ বাহির হইয়া, সেই ক্ষুদ্র কক্ষটীকে প্রায় অন্ধকারময় করিয়া তুলিল।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। পল্লীগ্রাম—সুতরাং চারিদিকেই একটা নিশুতি অবস্থা। সে জানিত, তাহার অনাদৃতা উপেক্ষিতা পরিত্যক্তা পত্নী

হেমরাণী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। কিশোরের ও যৌবনের সন্ধিসমাগম কালের—সেই আধফুটন্ত সুন্দর ফুলটী, এই উদ্ভিন্ন যৌবনে দেখিতে কেমন হইয়াছে, ইহা দেখিবার যে একটা কৌতূহল তাহার হয় নাই, তাহাও বলিতে পারিনা।

রাসমোহন, একবার সতৃষ্ণ নয়নে দ্বারের দিকে চাহিল। সে সবিস্ময়ে দেখিল, সেই দরোজাটী ঈষৎ ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া, এক মোহিনী মূর্ত্তি। এত রূপ তার, যে সেই নরাধম সেই বিদ্যুৎপ্রভাময়ী অপূর্ব্ব মূর্ত্তির দিক হইতে চোখ ফিরাইতে পারিল না। সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"কে তুমি?"

স্ফুরিতাধরা—হসন্মুখী, বিদ্যুৎকান্তিময়ী হেমরাণী, দ্বারটী ভেজাইয়া দিয়া কক্ষমধ্যে আসিয়া, স্বামীচরণে অবনত হইয়া, তাঁহার পদধূলি মাথায় দিয়া বলিল—"আমায় চিনিতে পারিতেছ না?"

রাসমোহন পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই হেমরাণীকে যাহা দেখিয়াছিল, এখন দেখিল, তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ষার গঙ্গা কূলে কূলে সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে।

কিশোর উত্তীর্ণ, যৌবন সমাগত, সুতরাং সে রূপ যেন নব বসন্তের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্য ভরা। আয়ত সমুজ্জল নেত্র, লজ্জাবনত মুখ, কোমল কণ্ঠস্বর, রাজহংসীর মত চঞ্চল গতি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনী, সবই যেন অপূর্ব্ব মাধুরী মাখা।

সেই পাপিষ্ঠ সবিস্ময়ে বলিল—"এত সুন্দরী তুমি? হেম! এত সুন্দরী তুমি?" তারপর সে মনে মনে বলিল—"হায়! সেই সময়ে যদি তুমি এই দেবীদুর্লভ রূপ লইয়া আমার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে, তাহা হইলে আজ হয়তো আমাকে এ অধঃপতনের স্তরে নামিতে হইত না। আজ হয়তো আমাকে যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইতে হইত না।"

লালসার মন্দিরে, মোহের যূপকাষ্ঠে, চোখের নেশার রজ্জুতে আবদ্ধ রাসমোহন, কখনও হেমরাণীর অপূর্ব্ব মাধুরী, দেখিবার মত করিয়া দেখে

নাই। সুতরাং সে যেন হতভম্বের মত একদৃষ্টে, তাহার পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময়ে দুর্ব্বুদ্ধি তাহার কাণে কাণে বলিল—"রূপ দেখিয়া মজিবার এ সময় নয়। ভুলিয়াছ কি,—তোমার বিরুদ্ধে তিনখানি হ্যাণ্ডনোটের ডিক্রী ঝুলিতেছে। তোমার দেশে ফিরিবার উপায় নাই, সেখানেও মহাজন ক্রোকী-পরোয়ানা রূপ শাণিত অস্ত্র লইয়া বসিয়া আছে। এ তোমার লালসা তৃপ্তির অবসর নয়, আত্মগ্লানি ও অনুশোচনার সময়ও নয়। যদি দেনার দায়ে সিভিল-জেলে পড়িতে না চাও, তাহা হইলে যে উপায়ে পার, তোমার শ্বাশুড়ী কিম্বা তোমার পত্নীর নিকট হইতে অন্ততঃ দুইশত টাকা আদায় করিয়া লও। সহজ কথায় কাজ হইবে না। যদি রক্ষা পাইতে চাও, তাহা হইলে একটু চোখ চাহিয়া কাজ কর।"

দুষ্টবুদ্ধির ছলনায়, রাসমোহন মনে মনে ভাবিল "সত্যই ত তাই। টাকা আদায় করিতে হইলে এতটা হাল্কা হইলে ত চলিবে না। পত্নীর সুন্দর মুখ খানির দিকে হাঁ করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে ত কাজ উদ্ধার করিতে পারিব না।"

রাসমোহন কঠোরস্বরে বলিল—"ওখানে কলের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? আমার কাছে আসিয়া বসো। তোমার সঙ্গে গোটাকতক কাজের কথা আছে।"

বহুদিন পরে সমাগত, তাহার আশার ধন, প্রত্যাশার দেবতার মুখে, এই অপূর্ব্ব সম্ভাষণের ভূমিকায়, হেমরাণী যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বিস্ফারিত লোচনে স্বামীর মুখের দিকে চাহিবামাত্রই বুঝিল, সে মুখের একটা ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু সহসা এ পরিবর্ত্তনের কারণ যে কি, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

গৃহ প্রবেশকালে রাণী তাহার সুন্দর মুখখানি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত করিয়া

আসিয়াছিল। এখন তাহার সে ভাব নাই। মেঘঢাকা চাঁদের বুকের উপর হইতে মেঘগুলি সরিয়া গেলে, চাঁদ যেমন আরও সমুজ্জল হয়, স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনাবগুণ্ঠিতা অবস্থায়, রাণীর মুখের লাবণ্য যেন তার চেয়েও বেশী ফুটিয়া উঠিল।

স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া সে সহাস্যমুখে বলিল—"আজ তোমার অনেক পরিশ্রম হইয়াছে। অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছ। তোমার পা দুটী টিপিয়া দিই এস।"

মূর্খ রাসমোহন বিরক্তির সহিত রাণীর এই আগ্রহভরা, সোহাগের প্রস্তাব, উপেক্ষা করিয়া বলিল—"ওসব মামুলী আত্মীয়তা এখন থাক। আমি তোমাকে গোটা কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তাহার সত্য জবাব পাইব কি?"

রাণী মনে একটু ব্যথা পাইয়া, একটু অপমান বোধ করিয়া, বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি আমার ইষ্ট দেবতা, আমার সর্ব্বস্ব। তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলিতে গেলাম কেন?"

রাসমোহন কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—"ভাল! তোমার কথা শুনিয়া ভারি খুসী হইলাম। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পিতা মৃত্যুর সময়ে কতটাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাকে বলিবে কি?"

এতক্ষণের পর রাণী, তাহার স্বামীর মনের কথা বুঝিয়া বলিল—"তিনি একটী পয়সাও নগদ রাখিয়া যান নাই। জমাজমা যাহা কিছু ছিল, তাঁহার অবর্ত্তমানেও আমাদের বর্ত্তমান অভাবের দায়ে তাহাও ক্রমে ক্রমে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এখন থাকিবার মধ্যে আছে. কেবল এই বাস্তু-ভিটা আর এই ভিটার পিছনে একখানি বাগান। আর আমাদের এই দুটো পোড়া পেট্!"

রাসমোহন বক্রনেত্রে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"বটে।

আমার সঙ্গে প্রতারণা! আমি কোন ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি—যে তোমার পিতা নগদ দুই এক হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।”

রাণী গর্ব্বিতভাবে, গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বলিল—“মহাগুরু স্বামীর সম্মুখে মিথ্যা বলিতে নাই, ইহা শাস্ত্রবাক্য। যাহা সত্য, তাহাই তোমাকে বলিয়াছি; তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, তাহাতে আমার কোন জোর নাই; কিন্তু কার মুখে তুমি এই কথা শুনিয়াছ—তাহা বলিতে তোমার আপত্তি আছে কি? আমাদের মিত্র না থাকিলে, শত্রুর ত অভাব নাই।”

রাসমোহন। তা যদি বলিলে, তাহা হইলে সত্য কথাই আমি তোমায় বলিব। ছোট-তরফের নায়েব, রুদ্দুর মোড়ল আমাকে ভিতরের সংবাদ দিয়াছে।

রাণী। কি সর্ব্বনাশ! যে আমাদের চিরশত্রু—যার জন্য আমার পিতা দেশ ত্যাগী—যার চক্রান্তের ফলে, ভাবনায় চিন্তায়, পিতা আমার বিদেশে বিঘোরে প্রাণ হারাইলেন, সেই সর্ব্বনেশে লোকের কথায় তুমি বিশ্বাস করিয়াছ?

রাসমোহন। তাহার বা তোমার কথায় বিশ্বাস করা না করা, সম্পূর্ণ-রূপে আমার স্বাধীন ইচ্ছার অধীন। ও সব বাজে কথা থাক্। এই রাত্রেই আমি দুইশত টাকা চাই। এ টাকার জোগাড় না হইলে, দেনার দায়ে আমাকে হয়তো জেলে পচিতে হইবে।

রাণী এ কথা শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তাহাদের তখন কিরূপ কষ্টে দিন চলিতেছে, তাহা ভগবানই জানেন। কিন্তু তাহার স্বামী তাহা বিশ্বাস করিবেন কি?

রাণী বলিল—“তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহা মিথ্যা কথা। আজকাল আমাদের দিন চলা ভার হইয়াছে। দু’শো দূরে থাক, দশটী টাকা ঘরে আছে কি না, সন্দেহ।”

রাসমোহন কথাটা শুনিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল,—"এমন অবস্থা যাদের, তাদের মরাই যে ভাল।"

কথাটা শুনিয়া অভিমানে রাণীর ঠোঁটছুটী ফুলিয়া উঠিল। চোখে দুই চারি ফোঁটা অশ্রু জমিয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহা এই অভিমান ও অপমানের উত্তাপে, যেন শুখাইয়া গেল। এই ক্রোধ সে মনে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বলিল—"দুটো টাকা নগদ আমাদের ঘরে নাই, তা দু'শো টাকা! হায়! তুমি যদি আমাদের দুঃখ ও অভাব বুঝিতে, তাহা হইলে বোধ হয় এমন হৃদয়হীন কথা বলিতে পারিতে না। আমাদের প্রকৃত অবস্থা যে কি, তাহা যদি জানিতে—"

নিষ্ঠুর হৃদয় রাসমোহন, রাণীর শুষ্ক মুখ, স্পন্দিত হৃদয়, অশ্রুজলে আধোভাসা চোখ দুটি দেখিয়াও, ঠিক বুঝিতে পারিল না, যে তাহার উক্তির মধ্যে একটুও মিথ্যা নাই। প্রাণ থাকিলে ত লোকে অপরের প্রাণের বেদনা বুঝিতে পারে।

রাসমোহন শয্যায় বসিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া, রাণীর দিকে সরিয়া আসিয়া, তাহার হাতের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"তোমার হাতে ত দিব্য সোণার বালা রহিয়াছে। খাইয়া দাইয়া ভোগে থাকিয়া চেহারা খানিও ত বেশ করিয়াছ। তবে এত অভাবের কান্না কেন? কিছু না থাকে, ঐ বালা দু'গাছা এখনি আমায় খুলিয়া দাও।"

এই পরুষ কথায়, রাণীর চোখের জলের বাঁধ ভাঙ্গিল। সে অনেক কষ্টে প্রাণের জ্বালাময় বেদনা চাপিয়া রাখিয়া এতক্ষণ যুঝিতেছিল বটে, কিন্তু আর যেন পারিল না। চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—"একবার আমার সব অলঙ্কার তুমি কাড়িয়া লইয়া, আমায় বিদায় করিয়া দিয়াছিলে। তাহাতে আমার তিল মাত্র দুঃখ হয় নাই। অলঙ্কার আমার চোখে বড় নয়, তুমিই আমার বড়। কিন্তু আমার হাতে যাহা দেখিতেছ—তাহা যদি

পিতলের বালা না হইয়া সোণার বালা হইত, তাহাহইলে তোমার প্রয়োজনে লাগিবে বুঝিয়া, আমি এখনই ইহা খুলিয়া দিতাম। হায়! ভাগ্য। এখনও তুমি আমার মর্ম্মবেদনা বুঝিলে না? এ দরিদ্র আশ্রয়হীন সংসারের মুখের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলে না?"

বিধাতার জীব-সৃষ্টির বাহাদুরী আছে। কেননা তিনি এই গুণধর রাসমোহনকে "চতুরঙ্গ" শ্রেণীর জীব করিয়া ধরায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। সিদ্ধি গাঁজা এখন রাসমোহনের নিত্য নেশা। পয়সার খুবই টানাটানি বলিয়া যোড়শোপচারে সুরেশ্বরীর উপাসনাটা এদানীং বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। আর ক্রমাগতঃ এই সব উগ্র নেশার ফলে, তাহার মাথাটা একবারে বিগড়াইয়া গিয়াছিল।'

রাণীর মণিবন্ধ-সংলগ্ন বালাগাছটী পরীক্ষা করিয়া যখন সে বুঝিল, সত্যই তাহা সোণার নয়, তখন সে বিরক্তির স্বরে বলিল—"যদি আবার তুমি আমার সাক্ষাৎ পাইতে চাও, তাহা হইলে যে উপায়ে পার, তোমার মার নিকট হইতে অন্ততঃ একশত টাকাও আদায় করিয়া দাও।"

রাণী দেখিল, এই নির্ব্বোধ যে নির্ব্বন্ধ ধরিয়াছে, তাহা পূর্ণ করিতে না পারিলে, এখনই একটা মহা অনর্থ ও কেলেঙ্কারী উপস্থিত হইবে। সনাতনের আনীত সেই দশটী টাকার মধ্যে পাঁচটি মাত্র খরচ হইয়া গিয়াছিল। পাঁচটি তখনও ছিল। রাণী বিষণ্ণমুখে অগত্যা সেই টাকা পাঁচটি আনিয়া স্বামীর সম্মুখে ধরিল।

তারপর অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"আমাদের বাড়ীতে টাকা বলিয়া যাহা কিছু ছিল, সবই তোমাকে দিতেছি। যদিও কাল ইহার অভাবে আমাদের খুব কষ্টে পড়িতে হইবে, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই। আমার কথায় বিশ্বাস কর। তোমার এ হতভাগিনী পত্নীর উপর কৃপাদৃষ্টি কর। তুমি আমার ইষ্ট—অভীষ্ট। তুমি আমার গুরু, তুমি আমার আরাধনার দেবতা। আমায় চরণে ঠেলিও না। নিষ্ঠুর হইও না।"

এই কথা বলিয়া হেমরাণী ভূমিতলে বসিয়া, স্বামীর চরণ দুখানি ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার চোখের দুই চারি ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দু, সেই পাষাণ, নির্ম্মম, হৃদয়হীনের চরণ স্পর্শ করিল। এই পাষণ্ড রাসমোহন যদি মানুষ হইত, তাহা হইলে বুঝিত—কতটা মর্ম্ম বেদনায়, রক্তধারার মত এ অশ্রুবিন্দু, তাহার ধর্ম্ম পরিণীতা পত্নীর চক্ষু ফাটিয়া বাহির হইয়াছে।

কিন্তু সে তখন বিবেকজ্ঞান বর্জ্জিত। শয়তানের শক্তির অধীন। দুর্ব্বুদ্ধির ক্রীতদাস। নরকের পথে অগ্রসর। সে সেই অনুরক্তা, রোরুদ্যমানা, মর্ম্মবেদনা কাতরা, পত্নীকে সজোরে পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, তাহার ব্যাগটী লইয়া গভীর রাত্রেই সেই বাটী ত্যাগ করিল।

পাছে কোন গোলমাল হয়, পাছে তাহার মা এ সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া লজ্জাসংকোচপূর্ণ হৃদয়া, ত্রাসকম্পিতা, অভি-মানিনী, স্বামীকে আট্‌কাইয়া রাখিতে সাহস করিল না।

দুর্ভাগ্য রাসমোহন, দ্বার খুলিয়া রজনীর সেই মধ্যযামে বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। আর সে তাহার পশ্চাতে রাখিয়া গেল—অশ্রু, গভীর মর্ম্মবেদনা ও আকুল দীর্ঘ নিশ্বাস।

স্বামীর সঙ্গে হেমরাণীর সম্পর্ক এই ভাবেই লোপ হইল। সে—উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্তকরে, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, বেদনা কাতর হৃদয়ে, অস্ফুটস্বরে বলিল—"উনি আমায় পদাঘাত করুন, চরণে দলিত করুন, তাহা হইলেও উনি আমার ইষ্ট দেবতা। লোকে বলে, দেবতাই মানুষকে বিপদ ও দুঃখ আনিয়া দেন। আবার এই বিপদের ও দুঃখের মাঝে পড়িয়া, উদ্ধারের জন্য, মানুষ সেই দেবতাকেই কাতর ভাবে ডাকে। এই করিও—ভগবান! যেন আমার সীমন্তের সিন্দুর চির উজ্জ্বল থাকে। আমি যে চরণের আঘাতে হৃদয়ে আজ দারুণ বেদনা পাইয়াছি, আমার চক্ষু ফাটিয়া শোণিতরূপী অশ্রুধারা বাহির হইতেছে, ঐ চরণে মাথা রাখিয়াই আমি যেন মরিতে

পারি। যিনি আমার লজ্জা নিবারণের কর্ত্তা, তাঁর কাছে আমার আবার মান অপমান কি? সামান্যা নারী আমি, অভাগিনী পত্নী আমি। তাই আজ—উনি যা চাহিয়াছিলেন, আমি তাহা দিতে না পারায়, এই লাঞ্ছনা ভোগ করিলাম। দোষ ত তাঁর নয়, দোষ আমার এই পোড়া অদৃষ্টের। হায়! আজি যদি আমার পিতা থাকিতেন?”

এই সব কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া, সে সেই রাত্রে ঘুমাইতে পারিল না। একবার সে মনে ভাবিল, হয়তঃ তিনি চলিয়া যান নাই চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া শুইয়াছেন। অতি সাহসে ভর করিয়া, হাতে একটী আলো লইয়া, সে অতি নিঃশব্দে সদোর দরোজা খুলিয়া, চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া দেখিল—সেখানে বরাবর যেমন একটী মাদুর পাতা থাকে, তাহাই আছে, কেহই সেখানে নাই।

রাণী সদর দরোজাটা মৃদুভাবে অর্গলাবদ্ধ করিয়া, অতি সন্তর্পণে তাহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, শয্যায় শয়ন করিল।

কিন্তু সে শয্যায় যেন কে আগুণ ছড়াইয়া দিয়াছে। শয্যায় শুইয়া সে অনেক কাঁদিল। আশাভঙ্গে—কে না কাঁদে? কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সে প্রতিদিনই অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া সংসারের কাজ কর্ম্মে মন দেয়। জামাতা গৃহে আছেন ভাবিয়া, রাণীর মা প্রভাতে তাহাকে আর ডাকেন নাই। সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় রাণী দেখিল, জানালার ভিতর দিয়া স্বর্ণবর্ণ রৌদ্র কিরণ আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিবামাত্রই দেখিতে পাইল, তাহার মা দরদালানে বসিয়া ঠাকুরের নাম জপ করিতেছেন।

রাণী তাহার মাকে দেখিয়া যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—“ও মা! আজ উঠ্‌তে এত বেলা হয়ে গেছে?”

রাণীর মা বলিলেন—"তাতে আর হয়েছে কি? পাট্-ঝাট্ আজ আমিই শেষ করে নিয়েছি। জামাই কি এখনো ঘুমুচ্ছেন?"

রাণী এ কথার যে কি উত্তর দিবে, তাহা খুঁজিয়া পাইল না। জীবনে কখনও সে মিথ্যা বলে নাই। কিন্তু জানিনা, কি ভাবিয়া সে বলিল—"তিনি ভোরে উঠে চ'লে গেছেন। কি একটা বিশেষ কাজ তাঁর আছে।"

বিন্দুবাসিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমার সঙ্গে একবার দেখা করে গেলেন না? তা যাই হোক্, আবার আসবেন কবে তা কিছু বলে গেলেন কি?"

রাণী তার মায়ের এই সব জেরার মুখে বড়ই দমিয়া গেল। সে বুঝিল সেখান হইতে কোন একটা অছিলায় সরিয়া না পড়িলে, তাহার আর নিস্তার নাই। এজন্য সে কেবল মাত্র বলিল—"না বিশেষ কিছুই ত বলে যান্নি।"

এই কথা বলিয়া রাণী পুকুর-ঘাটে চলিয়া গেল। বিন্দুবাসিনী হেমরাণীকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না পাইয়া, জপের মালা ফিরাইতে লাগিলেন। কিন্তু মালায় তাঁহার মন বসিল না। তাহার মনের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াই, একটা সন্দেহময় চিন্তার মৃদুনাদ ক্রমাগতঃ প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। সে চিন্তাটা এই—"এতদিন পরে জামাই যদি আসিলেন ত সহসা চলিয়া গেলেন কেন? আর রাণীর মুখখানাই বা অত ভার ভার কেন?"

(৪)

সেই দ্বিযামাতীত রাত্রে রাগ করিয়া শ্বশুর-বাটী হইতে বাহির হইয়া একটা ঝোঁকের বশে আর খেয়ালের প্রভাবে রাসমোহন, দেবানন্দপুরের জমীদার বাবুদের ঠাকুর-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর-বাটীর সম্মুখেই একটী প্রশস্ত বাঁধা ঘাট। ঘাটের উপর চাঁদনী। সেই চাঁদনীর একধারে 'বিস্তারা' বিছাইয়া, দুই এক জন ব্রজবাসী সাধু শুইয়া ঘুমাইতেছে।

রাসমোহনের আগমন ব্যাপার তাহারা কিছুই জানিল না। সুতরাং সে চাঁদনীতে বসিয়া, ঢালসাজ করিয়া দুই এক ছিলিম বড় তামাকু পোড়াইয়া দিল।

"সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়" বলিয়া একটা বহুদিনের প্রবাদ বাক্য এদেশে চলিত আছে। রাসমোহনের অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপে, সেইটী যেন অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। কিন্তু যাহারা সর্ব্বদা নেশা ভাঙ্গ করে, তাহারা প্রায়ই একরোখা। তাহার উপর এই মতিচ্ছন্ন রাসমোহন, দেনার দায়ে বড়ই বিপন্ন। পাওনাদারেরা তাহাকে ধরিবার জন্য দস্তকী-পরোয়ানা পর্য্যন্ত বাহির করিয়াছে। কাজেই তাহার বিকৃত মস্তিষ্কে টাকার খেয়ালটাই বেশী জাঁকিয়া বসিয়াছিল। এ জন্য পত্নীর নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে না পারিয়া, সে তাহার উপর খুবই রাগিয়া গিয়াছিল।

কোন রকমে তা-না-না-না-না, করিয়া রাত্রের শেষ কয়েকটা ঘণ্টা সেই চাঁদনীতে কাটাইয়া দিয়া, রাসমোহন দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "দেখিতেছি---টাকাই তোমার বড় হইল! তুমি না আমার ধর্ম্মপত্নী? বেশ! এই টাকা লইয়াই তুমি থাক। স্বামীর মানসম্ভ্রম ও জীবনের চেয়ে টাকাকেই যখন তুমি বড় বলিয়া ভাবিয়াছ, তখন আমিও দেখিতে চাই, তোমার এই টাকা তোমাকে কেমন করিয়া রক্ষা করে। নারীজীবনের সুখস্বচ্ছন্দ আনিয়া দেয়।"

মোটের উপর কথা হইতেছে এই, যে সে তাহার ধর্ম্মপত্নী হেমরাণীকে ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। কোন কুলোকের পরামর্শে, তাহার মনে এমন একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে তাহার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর হাতে কিছু না হয় তো হাজার খানেক টাকা নিশ্চয়ই আছে! সে যদি তাহার শ্বশুর-বাড়ীর তদানীন্তন শোচনীয় অবস্থাটা একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়া বুঝিতে যে তাহাদের তৎনকার অবস্থা যাহা দেখাইয়া

দিতেছে, তাহাই—সত্য আর রাণী মিথ্যা কথা বলে নাই, তাহা হইলে সে এতটা রাগ করিত না।

কিন্তু কর্ম্মফল লঙ্ঘন করে কে? যত্নে রচিত সুখশয্যা, সুন্দরী স্নেহশীলা পতিব্রতা পত্নীর সেবা যত্ন, বহুদিনের অদর্শনের পর দর্শনের ও আসঙ্গলিপ্সার তৃপ্তি, এ সব স্বর্গীয় সুখ উপভোগ না করিয়া নিজের কর্ম্মদোষে, নষ্ট বুদ্ধির ফলে সে ঘটাইল কিনা, মশকদংশনে নিদ্রার ব্যাঘাত, সরকারী চাঁদনীতে সমবেত দুঃস্থ অতিথিগণের সহিত নিদ্রাহীন নেত্রে রাত্রি যাপন!

যাই হোক্, যখন ঊষার ধূসর আলোককে নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্ধকার সে রাত্রের জন্য বিদায় লইল, তখন রাসমোহন তাহার ক্যাম্বিসের ব্যাগটা হাতে করিয়া লইয়া মনে মনে বলিল—"যাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া এই বিপদের সময় শ্বশুর বাড়ীর দ্বারস্থ হইয়াছিলাম, তাহার সঙ্গেই একবার না হয়, দেখা করিয়া সব কথাগুলা বলিয়া যাই।"

এ লোক আর কেউ নয়, ছোট তরফের কূটবুদ্ধি নায়েব সেই রুদ্ররাম মণ্ডল। সে সাক্ষাৎ শয়তানের প্রতিমূর্ত্তি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই রুদ্ররাম, রাসমোহনের গ্রামবাসী ও নিকট প্রতিবেশী। সেই হেমরাণীর বিবাহের ঘটক। তখন রমাপ্রসন্নের অধীনস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া এই রুদ্ররাম, তাঁহার বড়ই হিতচিকীর্ষু ছিল। আর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে হাতে রাখিবার জন্য সে এই বিবাহ সম্বন্ধ করিয়াছিল।

কিন্তু এ জগতে সকলেই স্বার্থের দাস। রুদ্ররাম যখন বড়-তরফের চাকরীটি খোয়াইল, আর তাহার মহাস্বার্থের ও ডাল রুটির হানি হইল, তখন সে সদর নায়েব, রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর শরণাগত হইল। তাহার মনের বিশ্বাস, চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনিবকে দুই চারি কথা বুঝাইয়া বলিলেই, ব্যাপারটা মিটিয়া যাইবে। কিন্তু অতি খাঁটি চরিত্রের লোক রমাপ্রসন্ন, রুদ্ররামের অপরাধের গভীরতা বুঝিয়া, সেরূপ কোন একটা চেষ্টা করিলেন না। আর তাহার ফলে

রুদ্ররামের চাকরিটী গেল। রুদ্ররাম তাহার মনিব হেমেন্দ্রকুমারের কোন কিছু করিতে না পারিয়া, তাঁহার সদর নায়েব রমাপ্রসন্নের সর্ব্বনাশ সাধনের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

বলাবাহুল্য, ছোট-তরফের জমীদার সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার দক্ষিণহস্তরূপে একজন শয়তানকেই খুঁজিতেছিলেন। রুদ্ররাম তাঁহাকে বড়-তরফের অনেক গোপনীয় সংবাদ প্রদান করায়, সুরেন্দ্রকুমার বুঝিলেন, তিনি যে ধরণের কূটবুদ্ধি ও মামলাবাজ লোক চাহিতেছিলেন, তাহাই তাঁহার মিলিয়াছে। কাজেই সে সামান্য চেষ্টায় ছোট-তরফের সদর নায়েবের পদ পাইল।

যে ফৌজদারী মোকদ্দামায়, রমাপ্রসন্নের নামে মূল আসামী বলিয়া ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, তাহার মূলে ছিল, এই রুদ্ররাম। রমাপ্রসন্ন দেশত্যাগী হইয়া গা ঢাকা দিলেন, তারপর তাঁর মৃত্যুসংবাদ পর্য্যন্ত রটিয়া গেল। তখন সে তাহার শত্রুকে জব্দ করিতে না পারিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু মৃত রমাপ্রসন্নের দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সে কি উপায়ে হয়রাণ করিবে, এই চেষ্টাই তখন তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল।

রাসমোহনের চরিত্রহীনতা সম্বন্ধে রুদ্ররাম সমস্ত কথাই জানিত। মধ্যে সে বাড়ী গিয়া শুনিল, রাসমোহনের বাস্তু পর্য্যন্ত বাঁধা। তাহার অনেক টাকা ঋণ। মহাজনেরা তাহার নামে ডিক্রী ও দস্তক পর্য্যন্ত বাহির করিয়া রাখিয়াছে। তখন সে মনে মনে একটা নূতন মতলব আঁটিল।

অনেক অনুসন্ধানের পর সে কলিকাতায় এক নগণ্য কুৎসিত স্থানে রাসমোহনের সাক্ষাৎ পাইয়া আর খুব একটা সহানুভূতি জানাইয়া তাহাকে বলিল—"দেখ—ঠাকুর! তোমরা হ'চ্ছ আমাদের দেবতা। তোমার বাপের কাছে আমি অনেক বিষয়ে ঋণী। তোমার এ বিপদে, আমি যে তোমাকে নগদ টাকা দিয়ে সাহায্য করি, সে ক্ষমতা আমার নাই। তবে

তামায় এক গুপ্ত সন্ধান বলিয়া দিতে পারি, যাহাতে তোমার কিছু টাকার জাগাড় হয়। আর তুমি হালফিল এই দস্তকী হাঙ্গাম হইতে রেহাই পাও।”

নির্ব্বোধ রাসমোহন তাহার এই আত্মীয়তায় গলিয়া দিয়া মনে মনে াবিল—“এই রুদ্ররাম দাদাই দেখিতেছি, আমার বিধাতাপ্রেরিত বন্ধু। াহা না হইলে আমার জন্য তাহার এতটা মাথা ব্যথা কেন!

সে সাগ্রহে বলিল—“বল বল—কি উপায়?”

রুদ্ররাম একটু ভাবিয়া বলিল—“উপায় না হয় বলে দিলুম। কিন্তু মি বুদ্ধির জোরে কাজ হাঁসিল কর্ত্তে পার্ব্বে কি?”

রাসমোহন মলিন হাস্যের সহিত বলিল, “এতদিন দুর্ব্বুদ্ধির জোরে ীবনের সব কাজই পণ্ড করিয়াছি। এখন না হয় চেষ্টা করিয়া দেখি, বুদ্ধির জোরে একটা ভাল কাজ করিতে পারি কি না?”

রুদ্ররাম গোপনে এ খপর টুকুও রাখিত, যে রমাপ্রসন্নের স্ত্রী কন্যার সর্ব্বস্ব াধা পড়িয়াছে। অর্থাভাবে তাহাদের দিন অচল। এই দুরবস্থার দিনে াহাদের আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার জন্য সে বলিল—“আমি খুব বিশ্বস্ত ত্রে শুনিয়াছি তোমার শ্বশুর মহাশয় কিছু নগদ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। ় টাকাটা তোমার শাশুড়ীর কাছেই আছে। তাঁর যখন একমাত্র কন্যা তামার ঐ স্ত্রী—তখন টাকাটা ধরিতে গেলে তার স্ত্রী-ধন। তুমি শ্বশুর বাড়ী ও—তাহাদের খুব পীড়াপীড়ি কর। দু’শো টাকা তাঁরা তোমায় অতি হজেই দিতে পারিবেন।”

রুদ্ররামের শয়তানী ছলনাময় এই আত্মীয়তায় ভুলিয়া, রাসমোহন পত্নী হমরাণীকে তাহার শুভাগমন সম্ভাবনা জানাইয়া, পূর্ব্বোক্ত পত্রখানি লখিয়াছিল।

কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া কি ভাবে তাহাকে নিরাশ হইতে হইয়াছিল, াহা পাঠক দেখিয়াছেন। এই নৈরাশ্যজনিত ক্রোধের কতকাংশ পরিশেষে

তাহার রুদ্ররাম দাদার ঘাড়ে গিয়া পড়িল। সে রুদ্ররামকে ছুটো কড়া কথা শুনাইয়া দিবার জন্যই, রামানন্দপুরের পথ ধরিয়াছিল।

রুদ্ররাম খুব প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিত। সে গাড়ুটি হাতে করিয়া বাগানের দিকে যাইতেছে, এমন সময়ে রাসমোহনের সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। রুদ্ররাম একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল—"এত ভোরে কোথা থেকে কি মনে করে ঠাকুর ?"

এই কথা বলিয়া রুদ্ররাম, গাড়ুটি নামাইয়া রাখিয়া, রাসমোহনের পদধূলি লইয়া বলিল—"দেবানন্দপুরে গিয়েছিলে নাকি ভায়া ?"

রাসমোহন বিরক্তিপূর্ণ মুখে নৈরাশ্যের স্বরে বলিল—"তোমার যেমন বুদ্ধি ! আচ্ছা শলাই দিয়েছিলে যাই হোক্।"

চতুর রুদ্ররাম বুঝিল, তাহার কূট চালটা ব্যর্থ হয় নাই। রাসমোহন টাকা পাউক আর না পাউক, তাহাতে তাহার ততটা আসে যায় না। সে চায়, তাহার শত্রু এই রমাপ্রসন্নের পরিবারবর্গকে তাহাদের দারুণ ছুঃখের দিনে আরও জ্বালাতন করিতে। আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে।

একটু বিস্ময়ের সুরে রুদ্ররাম বলিল—"ব্যাপার কি বল দেখি ? বোধ হয় কিছুই আদায় কর্ত্তে পার নি। আমি শুনেছি, তোমার শ্বাশুড়ীঠাকুরাণী ভারি কঞ্জুস।"

রাসমোহন তখন তাহার শ্বশুরবাড়ী প্রবেশের পর হইতে, সমস্ত কথাই রুদ্ররামকে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল।

জমীদারী-কাছারি সংলগ্ন একখানি ঘরে রুদ্ররাম থাকিত। তাহার পরিবারবর্গ দেশে ছিল। তাহার স্বজাতীয়, সেই কাছারির এক গোমস্তা রুদ্ররামের পাকশাক করিয়া দিত। সমস্ত কাছারী বাড়ীই তার অধিকারে। আর পূর্ব্বোক্ত কক্ষটি তার শয়ন কক্ষ।

রাসমোহন উগ্রভাবে বলিল—"তুমি যে মতলব দিলে তাতো ফাঁসিয়া গেল। এখন আমার রক্ষার উপায় কি?"

রুদ্ররাম মৃদু হাসিয়া বলিল—"তোমার এ রুদ্দুর দাদা বেঁচে থাকতে উপায়ের অভাব কি? আগে চল, তোমার তামাক খাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসি।"

এই কথা বলিয়া রুদ্ররাম, রাসমোহনকে সঙ্গে করিয়া কাছারী বাড়ীতে আসিয়া, তাহার ক্ষুদ্র কামরাটির দালানে এক অর্দ্ধছিন্ন মাদুর বিছাইয়া দিল। তারপর একজন কৃষাণকে ডাকিয়া বলিল—"বাবুকে ভাল করে তামাক সেজে দে। আমি স্নানটা সেরে আসি।"

রুদ্ররাম কাছারী বাড়ীর পিছনের এক পুখুরে স্নান করিতে গেল। স্নান করিতে করিতে, তাহার মাথায় একটি নূতন মতলব আসিল। সে একটু মুখ মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"ভগবান যা করেন, ভালর জন্য। এবার আর যায় কোথায়?"

স্নান সারিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া, রুদ্ররাম কাপড় চোপড় ছাড়িল। তারপর রাসমোহনের কাছে বসিয়া বলিল—"দাদাঠাকুর! একটা ঢিল ফস্‌কে গেছে বলে, নিরাশ হয়ে পড়তে নেই। ফলটাকে আয়ত্ব কর্ত্তে হলে, অনেকগুলা ঢিল ছুঁড়তে হয়। যেটা লেগে যায়—বুঝলে কি না? তা আজ এখানে সেবা গ্রহণ কর। তোমার স্বপাকের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। কাল রাত্রিটা তোমার বড় অশান্তিতেই গেছে দেখছি। সকাল সকাল স্নান করে চারটি আহার করে নিয়ে, একটু ঘুমিয়ে নাও। কাছারির কাজ কর্ম্ম সেরে এসে নিরিবিলিতে দুজনে পরামর্শ করবো, কিসে টাকার জোগাড় হতে পারে। তুমি ঐ বোক্‌নো থানায় চাট্টি চালে ডালে চড়িয়ে, স্বপাক করে দক্ষিণ হস্তের কাজটা আগে সেরে ফেল।"

রুদ্ররামের এই আশ্বাস বাণীতে রাসমোহনের নীরস ও নিরাশ প্রাণে

একটা আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল, ছোট-তরফের নায়েব এই রুদ্ররাম মনে করিলে না পারে কি ?

অবশ্য একথা বলিয়া রাখি, রাসমোহন জানিত না, এই রুদ্ররামই তাহার শ্বশুরের ঘোর শত্রু। তাঁহাকে ফৌজদারী মোকদ্দামায় জড়াইবার ও দেশত্যাগী করিবার প্রধান উপলক্ষ্য।

সে মনে মনে ভাবিল—"এই রুদ্ররামের বাস তাহাদেরই গ্রামে। তাহার পিতার আমলে, এই রুদ্ররাম কতবার তাহাদের জমী-জমা লইয়া চাষবাস করিয়াছে। তাহার এই অযাচিত উপকারের চেষ্টা যে কেবলমাত্র সেই অতীতকালের বাধ্য-বাধকতার কারণ প্রসূত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

আহারাদির পর একটু নিদ্রা দিয়া রাসমোহন খুবই সুস্থ বোধ করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে রুদ্ররাম জমীদারী কাছারির কাজ শেষ করিয়া তাহার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—রাসমোহন নিবিষ্টচিত্তে ধূম পান করিতেছে।

সে আত্মীয়তা জানাইয়া বলিল—"সকালে ত নিজের হাতে রেঁধে খেয়েছ। রাত্রেও সেই ব্যবস্থা হবে নাকি ?"

কাজের কথাটা শেষ করিয়া লইবার জন্য, রাসমোহন বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং সে বলিল—"পেটটা এখনও ভার আছে। রাত্রে কিছু জলটল খেলেই চলবে।"

রুদ্ররাম বলিল—"সেই ভাল।" তখনই সে একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া দুধ ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল।

রাসমোহন নির্ব্বাপিতপ্রায় কলিকাটিতে ফুক্‌ফুক্ করিয়া মৃদু টান মারিতে মারিতে বলিল—"এখন তোমার ত একটু ফুরসুৎ হয়েছে। কাজের কথাটা কি, এইবার বল তো দাদা ?"

রুদ্ররাম মাথা চুলকাইয়া, একটু কাশিয়া বলিল—"দেখ! সহজেই

…শোটাকার জোগাড় হতে পারে। আর এ টাকা আমার নয়, আমার মনিবের। কিন্তু তোমার তাহ'লে একটা কাজ কর্ত্তে হবে!"

রাসমোহন। কি কাজ?

রুদ্ররাম। টাকাটা এখন মনিবকে না জানিয়ে আমিই নিজের দায়িত্বে তোমাকেই দিচ্ছি! কিন্তু এর জন্য একটা লেখাপড়া করা ত দরকার।"

রাসমোহন মৃদু হাসিয়া বলিল—"আবার লেখাপড়া? আবার হ্যাণ্ড নোট? আমার আছে কি যে তা নেবে? সবই যে ডিক্রীর পেটে।"

রুদ্ররাম বলিল—"সে বুদ্ধি তোমার থাক্‌লে আর তুমি কাল রাত্রে শুধু হাতে শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে আস! বুদ্ধি আমি তোমাকে দিচ্ছি। একবার ফস্‌কে গেছে বলে কি বারবার তাই হবে?"

রাসমোহন বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে রুদ্ররামের মুখের দিকে চাহিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কথাটা কি বল দেখি?"

রুদ্ররাম গম্ভীর মুখে বলিল—"কথাটা হইতেছে এই, আমার মনিব আমাকে খুবই বিশ্বাস করেন তাতো জান। কিন্তু বিষয়ী লোক তিনি। শুধু হাতে যদি তোমায় টাকাটা দিই, তাতে তিনি খুবই রাগ করিবেন। কেননা—তোমাকে তিনি চেনেন না জানেন না। যদি একখানা বন্ধকী কাবালা লিখে দাও—

রাসমোহন নিরাশ হাস্যের সহিত বলিল—"জানোনা কি তুমি, আমার …স্ব পর্য্যন্ত বাধা। মহামহিম লিখ্‌বো কার জোরে!"

রুদ্ররাম বাধা দিয়া বলিল—"আরে! আগে কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শোন। তার পর মল্লিনাথের মত টীকা কেটো। কথাটা হচ্ছে কি জান—তোমার শাশুড়ীর হাতে যে হাজার খানেক টাকা আছে তা আমি ভালই জানি। তিনি এ টাকার সামান্য অংশ সহজে যে তোমায় দান করেন, তাতো বোধ হয় না। আর আইনের কথা হ'চ্ছে এই, তোমার শ্বশুরের ছেলে পুলে নেই।

ঐ একমাত্র কন্যা। ঐ কন্যাই তোমার শাশুড়ীর যা কিছু আছে, তাঁর মৃত্যুর পর সবই পাবে। তা দুদিন আগে—না হয় পরে। এখনও তোমার শ্বশুরের পৈত্রিক ভিটাটুকু আছে, একখানা বাগানও আছে। তুমি এই বিষয়ের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরূপে, আমার মনিবকে একখানা বন্ধকী-কোবালা লিখে দাও—ঐ বাস্তু ভিটাও বাগানের জন্য। এই বাজে বন্ধকী-কোবালা খানা তোমার শাশুড়ীকে কোনরূপে দেখাতে পারলেই তিনি টাকা শোধ করে দেবার পথ পাবেন না। তোমার বিষয় তোমারই থাক্‌বে। অথচ যে কাজটা তুমি কাল রাত্রে শেষ করতে পারনি, সেটা এইরূপ একটা চালাকিতে আমি হাসিল করে নোব। বুঝলে দাদা ভাই আমার!"

রাসমোহন কথাটা শুনিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল। সে মলিন মুখে বলিল—"না রুদ্দুর দা'—ও সব হাঙ্গামে কাজ নেই। শেষ কি একটা পুলিস হাঙ্গামে পড়বো? কার বিষয় কে বাঁধা দেয়! বড় শক্ত কথা।"

রুদ্রারাম একটু তিক্ত বিদ্রুপের টিপ্পনী করিয়া বলিল—"ভায়ার দেখ্‌ছি দেওয়ানি ফৌজদারির জ্ঞান আমার চেয়েও বেশী! বলি ও দলীলখানা ত রেজেষ্টারি করে দেবে না, তবে ভয় কিসের? যদি এরূপ একখানা দলিলের সহায়তায়, তোমার শাশুড়ীকে ভয় দেখিয়ে তোমারই জন্য ঐ টাকাটা মুক্‌তো আদায় কর্ত্তে পারি, আমার মনিবের টাকার কিনারা ত ঐখানেই হয়ে গেল। তোমার দলিল তুমি স্বচ্ছন্দে ফিরিয়ে নিও। আমার মনিব সুরেন্দ্রবাবু এত হীনচেতা জমীদার নন, যে তোমার শ্বশুরের ঐ বাস্তুটুকু ফাঁকি দিয়ে নিলে, অষ্টসিদ্ধি তাঁর হাতে আসবে?"

এইরূপ কড়ামিঠে তিরস্কারে, রাসমোহন একটু দমিয়া গেল। তাহার টাকার তখন বড় দরকার। দস্তকী মহাজনদের না থামাইতে পারিলে তাহাকে জেলে ঢুকিতে হইবে।

নানাদিক দিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বুঝিল—এই ব্রাহ্মণভক্ত রুদ্দুর

দাদা, কখনই আমার অনিষ্ট করিবে না। সে যথার্থই আমার হিতৈষী। তাহা না হইলে আমার জন্য ওর এত মাথাব্যথা কেন? আর কবে আমার শাশুড়ীর দেহান্ত হইবে, তার পর আমার স্ত্রীর হাতে এই বিষয় আসিবে— সে ঢের কাটখড়ের কথা। যে উপায়ে হোক্, এখন আমার কাজটা ত হয়ে যাক্।

এই সব ভাবিয়া সে বলিল—"কত টাকা তুমি দিতে পার রুদ্দুর দাদা?"

রুদ্ররাম মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—"তুমি কত চাও বল দেখি?"

রাসমোহন মাথা চুলকাইয়া বলিল—"তিনশো।"

রুদ্ররাম বলিল—"আমি তোমাকে চারশো টাকা দিতে পারি। ধর্ম্মপক্ষে আমাকে কথা কহিতে হইবে। মনিবের মুখের দিকে ঝোল আনাই টানিব আর তোমার মুখের দিকে চাহিব না, এমন ধর্ম্মজ্ঞান হীন লোক আমি নই।

রাসমোহন দেখিল—সে আশার অধিক ফল লাভ করিয়াছে। দুই-শত টাকা দেনার বাবতে দিলেও তার হাতে দুইশত টাকা মজুদ থাকিবে। এতে সে আরও কিছু দিন আমোদ চালাইতে পারে।

তবুও সে একটু মোচড় দিতে ছাড়িল না। বলিল—"আর গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধরে দাও। ফৌজদারী ফাসাদ মাথায় করে কাজ কর্ত্তে হচ্ছে ত!"

রুদ্ররাম বিরক্তির স্বরে বলিল—"ফৌজদারীটা কিসের! এ ফৌজদারী কর্ত্তে হলে করবেন ত তোমার শাশুড়ী। তা তাঁর টাকা বড়, না মেয়ে জামাই বড়? এই সামান্য টাকার জন্য তিনি কি তাঁর জামাইকে জেলে দিয়ে, মেয়েটার সর্ব্বনাশ করবেন?"

এ যুক্তির বিপক্ষে কোন কথাই সম্ভবপর নয়। সুতরাং হীনবুদ্ধি রাসমোহন এ সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না।

সেই রাত্রেই একখানা ষ্টাম্প-কাগজের উপর লেখা পড়া হইয়া গেল। তাহাতে সহী করিবার সময় রাসমোহনের চঞ্চল মনের সহিত, হাতটাও একটু কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু টাকার প্রয়োজন—বড়ই প্রয়োজন। লোকে যখন এই টাকার লোভে অপরের বুকে ছুরী বসাইতে পারে, তখন এই রাসমোহন যে কাগজের বুকে কলম বসাইতে পারিবে না, এটা ত বেশী আশ্চর্য্য কথা নয়।

পরদিন প্রভাতে রাসমোহন সাড়ে চারি শত টাকার নোট তাহার ব্যাগের ভিতর পুরিয়া হরিষে-বিষাদ অবস্থায়, রুদ্ররামের কাছারি বাড়ী ত্যাগ করিল।

(৫)

বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলার যদি কিছু অহঙ্কারের থাকে, তাহা হইলে তাহা বাঙ্গলার মাটী—আর বাঙ্গলার নারী।

পবিত্রতার সুবাসভরা, পতিপ্রেমপরায়ণা, পতিরতার এমন মহা আদর্শ আর কোথাও দেখিয়াছ কি? যাহাকে তুমি অনাদরে রাখিয়াছ, সে চিরদিনই তোমাকে আদর করিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিয়াছে। কিসে তুমি সুখে থাক, কিসে তোমার কষ্ট না হয়, কিসে মহাদুঃখের চির-বিষণ্ণতার মধ্যে তুমি প্রফুল্ল থাক, সেটা যেন তাহার জীবনের একমাত্র পবিত্র ব্রত। প্রভুত্ব করিয়া তোমার যে সুখ, বাঁদীত্ব করিয়া সে সেই সুখই ভোগ করিয়া থাকে। তুমি তার সর্ব্বস্ব, তুমি তার ইষ্ট, তুমি তার স্পৃহা কামনা, তুমি, তার দেবতা, তুমি তার বারব্রত, তীর্থধর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম। তোমার পূজাই তার দেবতার পূজা,—নারায়ণের পূজা। সে তোমার বিলাসের দাসী, ঘরণী, গৃহিণী, সন্তানের ধাত্রী, গৃহকর্ম্মে পরিচারিকা, যত্নে মাতা, স্নেহে ভগিনী ধর্ম্মের সঙ্গিনী, পুণ্যের ও পাপের অংশ ভাগিনী, যাগযজ্ঞের সহায়। কিন্তু তাহাকে তুমি জীবন ভোর দেখিয়াও চিনিতে পরিয়াছ কি? হায়! তুমি কি মুর্খ! কি অন্ধ! কি ঘোর স্বার্থপর!

কিন্তু এ সম্বন্ধে, এ জগতে তুমি একাই দৃষ্টিহীন নও। তোমার মত আরও অনেক আছে। আর তাহাদের একজন এই পুণ্যপথ ভ্রষ্ট নারকীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত রাসমোহন।

সামান্য অর্থের জন্য যেদিন স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সেই দিন হইতেই হেমরাণী সর্ব্বদাই বিমর্ষমুখী। সে সর্ব্বদাই মনে ভাবিত, হয়ত এই অর্থে তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহা না হইলে তিনি আমার কাছে চাহিতে আসিবেন কেন? হয়তঃ এই প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে, তাঁর কতই না কষ্ট হইতেছে! হায় ভগবান! কেন আমাদের অবস্থা এত হীন করিয়াছিলে? কেন আমার মত অভাগিনীকে সৃষ্টি করিয়াছিলে? ছার এ জীবন! ছার এ পত্নীত্ব!

সাধ্যমতে দুই চারিদিন স্বামীর সহসা যাওয়ার কথাটা গোপন করিয়া রাখিলেও, সে তাহার বুকের মধ্যে সেই স্মরণীয় রাত্রের ঘটনার কথাটা বেশী দিন চাপিয়া রাখিতে পারিল না। এ জগতে তার সখী নাই, সঙ্গিনী নাই, আপনার বলিতে কেহ নাই। দরিদ্রের দুঃখের দিনে কোথায়ই বা থাকে? কাজেই সে একদিন সুযোগ বুঝিয়া তার মাকে সমস্ত কথাগুলি ধীরে ধীরে গুছাইয়া বলিয়া, মনের তীব্র কষ্টের লাঘব করিল বটে কিন্তু তাহার চোখের জল শুখাইল না।

রাত্রে নির্জ্জনে, সে নিঃশব্দে কাঁদে। তাহার চিন্তাকাতর বিশীর্ণ গণ্ড বাহিয়া নীরবে অশ্রুধারা গড়াইয়া যায়। সে আপনিই সে অশ্রুধারা মুছিয়া ফেলে। জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে পারে না, পাছে তাহার মা জাগিয়া উঠেন।

সে মনে মনে নারায়ণকে ডাকিয়া বলে—"প্রভু! দয়াময়! একটী দিন এ অন্ধকার জীবনে পূর্ণিমা দেখা দিয়াছিল, বর্ষার প্রবল অশ্রুধারার মধ্যে বসন্তের অরুণরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আঁধার জীবনে সুখের দেউটী জ্বলিয়া

ছিল, আমার সে আলোভরা পূর্ণিমার দিন, অমাবস্যার দারুণ অন্ধকারে পূর্ণ হইল কেন? আমার সঙ্গীতভরা সুখের বসন্ত দেখা দিয়াই চলিয়া গেল কেন? দাও প্রভু! আবার আর একটী দিন, আমার কাছে তাঁহাকে আনিয়া দাও। আমি তাঁর চরণে ধরিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করি! দোষ তাঁর নয়, দোষ আমার, দোষ আমার বুদ্ধির, দোষ আমার দারিদ্রের!"

যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই আপশোষের এই তীব্রতা, পলীপড়া নদীর মত ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল বটে—কিন্তু স্মৃতির জ্বালা কিছুতেই যাইতে চাহে না। হায়! সেটা যে তার অস্থি মজ্জা শোণিতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

এই ভাবেই দুই তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল। মাতা ও কন্যার মধ্যে জামাতা সম্বন্ধে আর কোন আলোচনাই হয় না। মাতার মনের ধারণা, এ সম্বন্ধে কোন কথা তুলিলেই তাঁহার স্নেহময়ী কন্যার মনে একটা প্রচণ্ড আঘাত করা হইবে। আর কন্যা হেমরাণীও মনে মনে ভাবিল—"নিজের দুঃখ নিজেই মুখ বুজিয়া সহ্য করি। নারীকে বিধাতা সহিষ্ণুতার আদর্শ মূর্ত্তি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সহিষ্ণুতার শক্তিতে এখন সব কষ্টই মুখ বুঝিয়া সহিয়া যাই। সমুদ্রেরও কিনারা আছে, অসীম আকাশেরও হয়তো কোন অজানা দেশে, একটা সসীম অবস্থা লুকাইয়া আছে। বর্ষা চিরদিন থাকে না, মেঘ ঝড় চির দিন বিশ্বকে ওলট-পালট করে না। আমার অদৃষ্টের অন্ধকারময় গহ্বরে, এমন একটী শুভদিন হয়ত লুকাইয়া আছে, যে দিন আমি আবার তাঁর চরণে আশ্রয় পাইব। আমার ললাটের ঐশ্বর্য্যময় সতীর সিন্দুর আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

আশার মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র—এ সংসার যাত্রার অপূর্ব্ব মোহময় অবলম্বন। আশাকে ধরিয়া ভগবানের সৃষ্টিতে সকলেরই সুখের ও দুঃখের দিনগুলি যাইতেছে। যাহার আশা করিবার কিছুই নাই, সে অভিশপ্ত, অতি

দুর্ভাগ্য ! সুতরাং আশার মোহময় তীব্রালোকে, রাণী তাহার দুঃখের দিনগুলিকে একটু সুখময় করিয়া লইতে লাগিল।

(৬)

যখন কতকগুলি বিরুদ্ধ গ্রহ, দল বাঁধিয়া কোনও দূর্ভাগ্য মানবের অদৃষ্টক্ষেত্রে দেখা দেয়, তখন সে স্রোতনিমজ্জিত তৃণখণ্ডের মত দিশাহারা হইয়া, চারিদিকে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে। কোন দিকেই উদ্ধারের পথ দেখিতে পায় না। আর বিপদের উপর নূতন বিপদ আসিয়া, তাহাকে একবারে পথভ্রান্ত করিয়া দেয়।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর এক মাস উত্তীর্ণ হইতে না হইতে, রাণীর অদৃষ্টা-কাশে এই সব বিরুদ্ধ গ্রহের পীড়ন ফলে আবার কাল মেঘ দেখা দিল। আর সেই মেঘ যেন ক্রমশঃ জমাট হইয়া, একটা মসীময় অন্ধকার সৃষ্টি করিল।

ঘটনাটা আর কিছুই নয়। স্বামীর অকালমৃত্যুতে বিন্দুবাসিনী যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর তাঁর দেনাশোধ করিতে, আর নিজেদের দুটী পেট চালাইতে, যখন তাঁহার জমীজমাগুলি ক্রমশঃ বাঁধা পড়িতে লাগিল, তখন তিনি আরও বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার জ্ঞাতি-দেবর সারদা ঠাকুরের হাত দিয়া বিষয়গুলি বাঁধা দেওয়া হয়। সনাতনের পিতা, শেষে এই সব কথা জানিতে পারিয়া, কৃষ্ণরামপুরের একজন সদাশয় ধনী মহাজনকে ধরিয়া, অতি অল্প সুদে দুই একখানি বাগান বন্ধক রাখাইয়া দেন। রমাপ্রসন্ন কিছু না হয়, পাঁচ শতের উপর বাজার দেনা রাখিয়া গিয়াছিলেন। মৃত স্বামীর ঋণ মুক্তির জন্য, রাণীর মা নিরুপায় হইয়া, ভাল ভাল বিষয়গুলি আধা কড়িতে বেচিয়া ফেলিয়া, টাকা সংগ্রহ করেন।

উজ্জ্বল অতীতের সুখের কথাগুলি ভাবিয়া, এক এক সময় তিনি বড়ই

বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেন। দারুণ চিন্তায় তাঁহার হৃৎকোষের শোণিতধারা যেন জমাট বাঁধিয়া যাইত। কিন্তু পাছে রাণী কোনরূপ মর্ম্মবেদনা পায়, পাছে সে তাঁহার চোখের জল দেখিয়া দমিয়া যায়, এই ভাবিয়া তিনি অনেক কষ্টে মনের ব্যথা চাপিয়া, বাহিরে একটা স্থির শান্ত ও সংযত ভাব দেখাইতেন। এই ভাবেই এত দিন চলিয়া আসিতেছিল।

কিন্তু রক্ত-মাংসের শরীর তো! কত সহিবার শক্তি তার? বিশেষতঃ জামাতার এই দ্বিতীয় দুর্ব্ব্যবহারটা, তাঁহার বুকে বড়ই একটা সাংঘাতিক আঘাত করিয়াছিল। তাহাতে তাঁর দেহ ও মন উভয়ই জখম হইয়া পড়িল। কন্যার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকারময় দেখিয়া, তিনিও দিনে দিনে নিরাশার অন্ধকারে ডুবিতে লাগিলেন। আদরে পালিতা এই একমাত্র কন্যা হেমরাণী যে বড় আদরিণী, বড় অভিমানিনী। তাঁর মৃত্যুর পর কে তাহাকে দেখিবে? যাহার উপর তার রক্ষার ভার, সে ত মানুষ নয়! এই সকল চিন্তায় ক্ষয়রোগের সূত্রপাত দেখা দিল।

পল্লীগ্রাম, তাহার উপর অর্থের অস্বচ্ছলতা। গ্রাম্য গোপাল কবিরাজ, যিনি সেই গ্রামের 'গঙ্গাধর বাচস্পতি' বলিয়া পরিগণিত, তিনি বিন্দুবাসিনীর মৃদুজ্বরকে ম্যালেরিয়া ভাবিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

গ্রামে আর দ্বিতীয় কবিরাজ নাই। ডাক্তার দুই একজন ছিল বটে, কিন্তু তাহারা সহস্রমারী, আর সেই অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ কবিরাজের অপেক্ষাও অধম। তাহা ছাড়া রোগিনী ডাক্তারী ঔষধ খাইতেও নিতান্ত নারাজ। কাজেই কবিরাজী চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

নাড়ীতে অষ্ট প্রহরই জ্বর। মৃদু কাশও আছে। শরীরের দৌর্ব্বল্য ও অবসাদ দিনে দিনে বাড়িতেছে। সনাতন সকল কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া তাহার দিদিমার চিকিৎসার বন্দোবস্তের জন্য খুবই ব্যস্ত। ঔষধের জোগাড়, পথ্যের জোগাড়, কবিরাজ ডাকা, সমস্ত রাত্রি সজাগ থাকিয়া রোগীর

পরিচর্য্যা করা, সে না করিতেছে কি? রাণী যে সন্তানটীকে এই নিষ্ঠুর মমতাহীন, সহানুভূতিশূন্য, সংসারের বুকে কুড়াইয়া পাইয়াছে, তার গুণের যে তুলনা নাই।

একদিন এই জ্বরটা একেবারে ছাড়িয়া গেল। গোপাল কবিরাজ এটাকে যেন শুভ লক্ষণ বলিয়া বুঝিলেন। তিনি রাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভয় নাই, তোমার মা শীঘ্র সারিয়া উঠিবেন।"

কবিরাজ মহাশয় ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। সনাতন তাঁর সঙ্গে ঔষধ আনিতে গেল। রাণী তার মায়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার মৃত্যুঘর্ম্মশীতল শীর্ণ ললাটে, ধীরভাবে হাত বুলাইতে লাগিল। তার পর সে মায়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আদরের সুরে বলিল—"আজ কেমন আছ তুমি মা?"

বিন্দুবাসিনী তাঁহার দুর্ব্বল ও ক্ষীণ দক্ষিণ হস্ত খানি দিয়া রাণীর পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"আজ যেন একটু ভাল আছি! একটু জল দেনা মা?"

রাণী। জল খাবে কেন, একটু বেদানা খাও না মা! সনাতন সে দিন তোমার জন্যে হাট থেকে পানফল বেদানা মিছরী কিনে এনেছে। তাই দোব?

বিন্দু। না—না, একটু ঠাণ্ডা জল দাও।

রাণী। কবিরাজ মশাই যে তোমায় রাত্রে ঠাণ্ডা জল দিতে বারণ করে গেছেন। গরম জল ঠাণ্ডা করা আছে তাই দিই।

হেমরাণী সেই জল আনিয়া তাহার মাকে খাইতে দিল। বৃদ্ধা এক নিশ্বাসে সমস্ত জলটুকু শেষ করিয়া বলিলেন—"আঃ—"

রাণীর চোখে এই সময়ে অভাবের অশ্রুজল দেখা দিল। কারণ রোগীর পথ্য বলিয়া যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা তাহাদের বাড়ীতে কিছুই নাই। একে পল্লীগ্রামে এ সব জিনিস সহজে মেলে না, দূরের হাট হইতে

আনাইতে হয়। সনাতন ইতিমধ্যে দুই একটা বেদানা, দুই চারিটী পাণিফল একটু মিছরি তাহার পিতা পাঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া, একদিন দিয়া গিয়াছিল। তাহাও শেষ হইয়া আসিল। বার বার তাহাকে বলিতে যেন তাহার বড় লজ্জা বোধ হয়। আর দুঃখের দিনে এ লজ্জাটা স্বভাবতই বেশী হইয়া পড়ে।

রাণী যখন এই দুর্ভাবনায় কাতর, সেই সময়ে সনাতন আসিয়া বহির্দ্বার হইতে ডাকিল—"মা!"

সনাতনের কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়াই রাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোর খুলিয়া দিল। সনাতন কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"দিদিমা আজ কেমন আছেন?"

রাণী বলিল—"আজ আর জ্বরটা হয় নাই। কিন্তু বড় তৃষ্ণা। শরীরও বড় দুর্ব্বল! কি করা যায় সনাতন? মা আমায় ছেড়ে গেলে আমার দশা কি হবে বাবা?"

সনাতন দেখিল—রাণী আর্দ্রস্বরে কথা কহিতেছে। সে তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিল—"রোগ হলেই কি মানুষ মারা যায় মা? তবে চিকিৎসা করান দরকার। এমন জ্বর সবারই হয়।"

রাণী। আমাদের অবস্থা ত জান।

সনাতন। আজ আমি আমাদের জমীদার হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করে ছিলুম। তাঁর পরিচিত একজন ভাল কবিরাজ বর্দ্ধমানে আছেন। তিনি শীঘ্রই এখানে এসে পৌছিবেন। আর সেইদিন থেকেই আমার দিদিমার চিকিৎসা ভাল করেই হবে। তোমার বাপ, হেমেন্দ্রবাবুর ডান হাত ছিলেন। তিনি আজ বলছিলেন—চক্রবর্ত্তী মহাশয় চলে গেছেন বলে যে ওঁদের কষ্ট হবে, তার ত কোন কারণ নেই। কিন্তু ওঁরা যে আমার কাছ থেকে কোন কিছু নিতে বড়ই কুণ্ঠিত।"

এই পরোপকারী সনাতনকে, হেমেন্দ্রবাবু খুব ভাল রকমই জানিতেন। সনাতনের পিতা তাঁহার সদর কাছারির একজন খাজাঞ্চি। তাহা ছাড়া হেমেন্দ্রবাবু জানিতেন এই সনাতন, স্বর্গীয় রমাপ্রসন্নের সংসারের দুঃস্থ জীব দুটির উপর বড়ই স্নেহশীল। আর দয়াবান পরোপকারী জমীদার বলিয়া সনাতনও এই হেমেন্দ্রবাবুর গুণের বড়ই পক্ষপাতী ছিল। হেমেন্দ্রবাবু এই এই কর্ত্তব্যপরায়ণ সনাতনকে বড়ই আদর যত্ন করিতেন।

সনাতন তাহার কাপড়ের মধ্য হইতে একটী পুটলী বাহির করিয়া বলিল—"মা! হেমেন্দ্রবাবু দিদিমার জন্য এই গুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

রাণী তাড়াতাড়ি সেই ক্ষুদ্র পুটুলিটী খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে চারিটী বড় বড় বেদানা, একবাক্স আঙ্গুর, সেরটাক মিছরি ও সাগু আছে।

রাণী সনাতনের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"জানিনা সনাতন! আর জন্মে তুমি আমাদের কে ছিলে? কবিরাজ, পথ্য, সবই তুমি জোগাড় করিয়া আনিতেছ। তোমার মত সোণার চাঁদ ছেলে যার তার ভাবনা কি? তুমি আমাদের জাত নয়, জ্ঞাত নয়, আত্মীয় নয়, কিন্তু তবুও সকলের চেয়েও আপনার। কিন্তু বাবা অপর লোকের দান নিতে, বিশেষতঃ এই দুঃখের দিনে—"

রাণীর কথায় বাধা দিয়া সনাতন বলিল—"সে কি মা? দান কার? কে কাকে দেয়? এই হেমেনবাবুর সেরেস্তায় চাকরি করে, তোমার পিতা যে শরীরের রক্তটাকে জল করে গিয়েছেন। তাঁকে হারিয়ে হেমেনবাবু বড়ই বুক ভাঙ্গা হয়ে পড়েছেন। সর্ব্বদাই আমার বাবার নিকট তাঁর কথা বলে দুঃখ করেন। হেমেনবাবু—তোমাদের যা কিছু শ্রদ্ধা করে, আদর করে দিয়েছেন, সেটা দান মনে বলে ভাবা তোমার বড় অন্যায়।"

সনাতনের একথার উপর রাণী আর কোন কিছু বলিতে সাহস করিল না। সন্তুষ্ট চিত্তে সে সে গুলি তুলিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

তারপর আঁচলে চোখ মুছিয়া পথ্যগুলি নির্দ্দিষ্টস্থানে রাখিয়া দিল। তাহার মা তখন পাশ ফিরিয়া ঘুমাইতেছেন, তাহাকে সে আর ডাকিল না।

রাণী ঘরের মধ্য হইতে একটী ছোট ধামি করিয়া কিছু মুড়ি ও একটী বাটীতে খানিকটা গুড় আনিয়া, সনাতনকে বলিল—"তোমার মুখটো বড় শুখিয়ে গেছে। তুমি আমার হাতের ভাজা, মুড়ি খেতে বড় ভাল বাস। যাও, খিড়কীর ঘাট থেকে মুখ হাত ধুয়ে এসে, এই মুড়ি গুড় খেয়ে নাও।"

সনাতন হাসিয়া বলিল—"একেই বলে মায়ের স্নেহ! তবে তুমি বেটী এক এক সময়ে আমার বড়ই অবাধ্য হও, এজন্য তোমার উপর বড় রাগ হয়।"

তারপর সনাতন সানন্দচিত্তে, মাতৃপ্রদত্ত সেই স্নেহের উপহার নিঃশেষ করিয়া এক ঘটী জল খাইয়া বলিল—"আঃ বাঁচলেম!"

রাণী মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—"হাঁ খুব এক থাল ক্ষীরের ছাঁচ, চিনির পুলি, মেঠাই মণ্ডা তোমায় খাওয়ালুম কি না? যেমন হতভাগা মা তোমার, তোমাকে তেমনি খাবারই দিয়েছে।"

সনাতন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ছি! ছি! ও কথা বল্‌তে নেই। আমার মা যে রূপে রাজরাজেশ্বরী। গুণে—সাক্ষাৎ কমলা। এমন মা কে পায়?"

সনাতন রাণীর পদধূলি লইয়া চলিয়া যাইবার সময় বলিল—"দিদিমা যতদিন না সেরে উঠেন, ততদিন, ক্ষেমার মা তোমার বাড়ীতে রাত্রে এসে থাকবে। সে আমাদের সংসারের কাজ কর্ম্ম সেরে, খেয়ে দেয়েই এখানে আসবে। যদি রাত্রে হঠাৎ কোন প্রয়োজন হয়, তাহ'লে ক্ষেমার মাকে দিয়েই আমাকে তুমি খপর পাঠাতেও পারো। রোজ সকালে এখানকার পাট্ ঝাট সেরে, সে আমাদের বাড়ীতে চলে যাবে। তা হলে দিদিমা রাত্রে কেমন ছিলেন সে সংবাদটাও আমি পাব।"

এই ক্ষেমার মা, সনাতনদের বাড়ীর ঝি। সে বহুদিন হইতে সনাতনদের সংসারে আছে। রাণী রোগীকে লইয়া রাত্রে একলা থাকে, সনাতনের

এটা ইচ্ছা নয়। এই জন্যই সে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিল। বলা-বাহুল্য, রাণী তাহাতে কোন আপত্তি করিল না।

সনাতন চলিয়া গেলে রাণী মনে মনে বলিল—"নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রতধারী, আমাদের মত দুঃখীর দুঃখে কাতর, এই সনাতন জানিনা মানুষ কি দেবতা? এই স্বার্থভরা, আদান-প্রদানের বাধ্য বাধকতায় আবদ্ধ সংসারে, আজকালকার দিনে, এমন নিঃস্বার্থ পরোপকারী লোক পাওয়া যে অতি দুর্ল্লভ। যাহারা আমাদের আপনার ছিল, তাহারা এই দুর্দ্দিনে পর হইয়া গেল। আর এই সনাতন, যে আমার জাত নয়, যাহার সহিত কোন রক্ত সম্পর্ক নাই, যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ বন্ধন নাই, কখনো আমরা যাহার কোন উপকার করি নাই, সে কিনা তার নিজের কাজ ক্ষতি করিয়া এই ভাবে, আমাদের এই বিপদের দিনে সাহায্য করিতেছে! বোধ হয় সনাতন পূর্ব্বজন্মে আমার গর্ভের সন্তান ছিল। তাহা না হইলে আমার উপর তার এতটা দরদ, এতটা মমতা কেন? নারায়ণ! ভগবান! তুমিই ধন্য।"

(৭)

ঘটনাক্রমে তারপর দিন হেমরাণীর মা খুব ভালই রহিলেন। রাণী তার মায়ের এই সুস্থ অবস্থা দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ পাইল।

রাণীর প্রতিবাসিনী চাঁপার মা বলিয়া এক কায়স্থ বিধবা, মধ্যে মধ্যে রাণীদের খোঁজ খপর লইত। তবে তাহার নিজেরই অবস্থা ভাল নয়, কাজেই সে গতরে খাটিয়া রাণীদের ছোটখাট ফাই ফরমায়েস পালন করিয়া যতদূর পারিত, উপকার করিত।

সেই দিন প্রভাতে ঘাটে বসিয়া বাসন মাজিবার সময়, চাঁপার মা রাণীকে বলিল—"আজ শিবরামপুরের বুড়ো মহাদেবের বাৎসরিক পূজা। তুমি ত গত বৎসরে আমার সঙ্গে গিয়েছিলে। এবার যাবে কি রাণি?"

রাণী কথাটা শুনিয়া বড়ই একটা আনন্দ পাইল। সে বলিল—"বাবা মহাদেবের কৃপায়, আজ আমার মা খুব ভাল আছেন। সকালে উঠিয়াই দেখি, তিনি জপের মালা ধরিয়াছেন। আর আজ তাঁর জন্য আমার রান্না বান্নারও কোন হাঙ্গাম নেই। একে অমাবস্যা, তাতে তাঁর শরীর অসুস্থ। একটু সাগু তৈরি করে দিলেই চলবে। কায়েত দিদি! তোমার সঙ্গে আমিও যাবো। বুড়ো শিবের চন্নামেত্ত খেলে, আমার মার সব রোগ আরাম হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমিও বুড়ো শিবের কাছে, নিজের জন্য একটা মানত করে রেখেছি।"

এই শিবরামপুর রাণীদের বাড়ী হইতে তিন পোয়া পথ। যাতায়াতে দেড় ক্রোশ। এখানে এক জাগ্রত মহাদেব আছেন। তাঁর নাম বুড়ো শিব। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের অমাবস্যায়, এখানে একটা খুব উৎসব হয়। দোকানী পসারিরা নানা রকম জিনিস বিক্রয় করিতে আসে। অনেক ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে, কুলমহিলাদের আগমনে, নানা শ্রেণীর যাত্রীর সমাগমে, স্থানটা খুব গুলজার হইয়া উঠে। কেননা একটা জনবর ও প্রবাদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, যে এই বুড়াশিব অনাদি কালের। আর ইনি বড়ই জাগ্রত।

দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী রাণীর মনের ধারণা, যে তাহার মার এই ঘুস্‌ঘুসে জ্বর মহাদেবের প্রসাদী মন্ত্রপূতঃ একটী বিল্ব পত্রেই আরাম হইয়া যাইতে পারে। ঠাকুরের পূজক মোহান্তই, রোগীদের নিজের হাতে যে নির্ম্মাল্য দেন—তাহা কখনও ব্যর্থ হয় না।

এইরূপ একটা সরল ও দৃঢ় বিশ্বাস মনে লইয়া হউক বা কোন দুষ্ট গ্রহের আকর্ষণেই হউক, রাণী তাহার প্রতিবাসিনী পূর্ব্বোক্ত ঘোষ-পত্নীর সঙ্গে শিবরামপুরে চলিয়া গেল। জননীর অনুমতি পাইতে তাহাকে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না।

যথা সময়ে তাহারা বুড়াশিবতলায় পৌছিল। সেখানে ভয়ানক ভিড়। সুবিধা ও অবসর বুঝিয়া অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া, রাণী দেবায়তনে প্রবেশ করিয়া, মায়ের মঙ্গলের জন্য পূজা দিল। হায়! এ সংসারে তাহার মা বই যে আর কেহই নাই!

সে ঠাকুরকে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিতে করিতে মনে মনে বলিল—"দেবদেব! মহাদেব! আমরা বড়ই দুর্ভাগ্য নিপীড়িত। এ সংসারে আমার এই মা বই আমার কেহ নাই। আমাকে রক্ষা করিবার, পোষণ করিবার, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ ভার যাঁর, তিনি আমাকে চরণে ঠেলিয়াছেন। মাকে হারাইলে এ সংসারে আমার দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না। আমার মাকে আরাম করিয়া দাও ঠাকুর!"

রাণী, ভক্তিভরে আন্তরিক একাগ্রতার সহিত তার মনের দুঃখ দেবতাকে জানাইয়া, অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া সেই মন্দির হইতে বাহির হইল।

সে তাহার প্রতিবেশিনী ঘোষজায়াকে বলিল—"দিদি! চল আমরা বাহিরে গিয়া কোন গাছতলায় বসিয়া একটু বিশ্রাম করি।"

ঘোষ পত্নী বলিল—"উঃ! এবার কি ভিড়টাই হয়েছে। আর বছোরে কিন্তু এত হয়নি। একে বোশেখ মাসের কাটফাটা রোদ্দুর, তারপর এই ভিড়, আমার ভাই তেষ্টা পেয়ে গেছে।"

রাণী বলিল—"আমারও সেই অবস্থা। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। চল, আমরা কোন পুকুরঘাটে গিয়ে একটু জল খেয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি।"

মেলাস্থানের আশ পাশের মধ্যে, তাহারা ভাল পুকুর একটীও দেখিতে পাইল না। অধিক লোক সমাগমে, অধিকতর জনতার অত্যাচারে, মেলা-ক্ষেত্রের ছোট খাটো ডোবা ও পুষ্করিণীর জল একেবারে পানের অযোগ্য হইয়া পড়ে। তাহার উপর প্রচণ্ড রৌদ্রের তাতে, সেই সব পুকুরের জল খুব গরম হইয়া উঠে।

পুষ্করিণী সমূহের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া রাণী বলিল,—"জল খাওয়া ত হলো না। যাই হক, চল আমরা তৃষ্ণা নিয়েই ঘরে ফিরে যাই।"

এই ভাবে দুই এক রশি পথ অগ্রসর হইবার পর তাহারা দেখিল—পল্লী-বাসিনী স্ত্রীলোকেরা কলসী কাঁকে করিয়া, কোথা হইতে জল লইয়া আসিতেছে।

ঘোষজায়া তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ মা! কাছে কি কোন ভাল পুকুর আছে?"

সেই রমণী অঙ্গুলিনির্দ্দেশে অদূরবর্ত্তী এক বাগানের ফটক দেখাইয়া দিয়া বলিল—"ওটা জমীদার বাবুদের বাগান। বাবুরা বড় ভাল লোক। এ গ্রামে কোন বড় পুকুর নেই বলে, তাঁরা তাঁদের বাগানের পুকুর থেকে সবাইকে জল নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন। তবে ঐ পুকুরের জলে কারুর নাইবার হুকুম নেই।"

রাণী তাহার ঘোষ দিদিকে বলিল—"ঐ ত বাগান দেখা যাচ্ছে। চল আমরা ওখান থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করে, বাড়ী চলে যাই। আমাদের কাজ যা, তা ত হয়ে গেছে।"

ঘোষপত্নী হেমরাণীর মতেই মত দিয়া বলিল—"চল বোন্! তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। বাপ্! কি ভয়ানক কাট-ফাটা রোদ্দুর।"

তাহারা ক্ষুদ্রপল্লী পথের একটা বাঁক ফিরিয়া, সেই উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই দেখিল, আরও দুই চারিজন স্ত্রীলোক জল লইয়া চলিয়া যাইতেছে।

বাগানের চারিদিক ব্যাপিয়া লাল কাঁকরের পথ। পথের দুই ধারে নানা রঙ্গের বিচিত্র বাহারের ক্রোটন শ্রেণী। এক এক স্থানে কলমের আম গাছ। সে সব গাছের ডালে, থোলো থোলো আম ঝুলিয়া, ডালটীকে "ফলভারাবনত" অবস্থায় আনিয়া দিয়াছে। লিচু, জামরুল, গোলাপজাম প্রভৃতি নিদাঘসুলভ ফলের গাছও আশে পাশে অনেক।

বাগানের মধ্যে একটী দ্বিতল কুঠি। মধ্যাহ্নের রৌদ্রের প্রখরতা জন্য, উপরের কক্ষের জানালার সারসিগুলি বন্ধ করা হইয়াছে। এই কুঠির সম্মুখ দিয়াই একটী কঙ্করময় পথ উত্তর দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। আর এই পথের পার্শ্বেই বাঁধা ঘাটওয়ালা এক পুকুর। পুকুরটী শ্যামসায়র বা কৃষ্ণসায়রের মত বড় না হইলেও, তাহার বিশাল সলিলরাশি কাকচক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল।

সেই পুষ্করিণীর দুই দিকে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণে বাঁধা ঘাট। ঘাটের চারিদিকে কয়েকটী ছায়াময় বৃক্ষ থাকায় আর স্থানটি রৌদ্রপ্রবেশ বিহীন হওয়ায় অতি স্নিগ্ধ ও ছায়াময়।

রাণী ও তাহার সঙ্গিনী, সেই পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটের উপর বসিয়া অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিল। ঝিরঝিরে হাওয়ায়, আর সেই চাঁদনীর তিনদিক বেষ্টনকারী গাছগুলির স্নিগ্ধ ছায়ায়, রৌদ্রতাপজনিত ক্লান্তি কমিয়া আসিলে, তাহারা অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিয়া অনেকটা স্নিগ্ধ হইল।

সেই বাগানের কক্ষ মধ্য হইতে এক নবীন যুবক যে জানালার উন্মুক্ত খড়খড়ির আড়ালে আত্মগোপন করিয়া, অতৃপ্ত নয়নে হেমরাণীর রূপমাধুরী দেখিতেছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই।

সেই যুবকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক আধবয়সী স্ত্রীলোক। সে এই নবীন যুবকের এই প্রকার মোহময় অবস্থা দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

সেই যুবক, একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বলিল—"ওঃ—"

পার্শ্ববর্ত্তিনী সেই প্রৌঢ়া বলিল—"একদৃষ্টে কি দেখিতেছেন হুজুর?"

যুবক তাহার এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তুই এখন এখানে আসিয়াছিস্ কেন?"

সেই প্রৌঢ়া বলিল—"হুজুর হুকুম করিয়াছিলেন, আজ মধ্যাহ্নে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করিতে। তাই নায়েব-মহাশয় আমায় পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

সেই যুবক আবার একটী ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, মনে মনে কি ভাবিয়া বলিল—"তারামণি! ঐ সুন্দরীকে তুই চিনিস কি?"

তারা। না—ও আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। বোধ হয় ভিন্ন গাঁয়ের লোক। মেলা দেখতে এখানে এসেছে। আর প্রচণ্ড রোদ বলে এখানে বিশ্রাম করছে।"

সেই যুবক যখন দেখিল, যে হেমরাণী ও তাহার সঙ্গিনী ঘোষজায়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, আর তখনই তাহারা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, তখন সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—"তারামণি! তোকে যে কাজের জন্য ডাকিয়াছিলাম, সে কাজ এখন থাক। তুই এখনি প্রচ্ছন্নভাবে উহাদের অনুসরণ কর। উহারা কোথায় থাকে দেখিয়া আসিবি। তোর পরিশ্রমের পুরস্কার আগেই দিতেছি।"

এই কথা বলিয়া সেই যুবক, তখনই নিকটস্থ একটী ড্রয়ার খুলিয়া, তাহার মধ্য হইতে দুইটী টাকা লইয়া, তারামণির হাতে দিয়া বলিল—"এই নে। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি সঠিক খবর চাই। ওর সঙ্গে যদি দুচার ক্রোশ যাইতে হয়, তাহাও যাইবি।"

তারামণি টাকা দুইটী আঁচলে বাঁধিয়া, তখনই বাগানের অন্য এক ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাহিরে আসিল। হেমরাণী ও তাহার সঙ্গিনী সেই ঘোষজায়া, তখন বাগান হইতে বাহির হইয়া তাহাদের গ্রামের পথ ধরিয়াছে।

তারামণি অদূরে থাকিয়া, তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। মেলার দিন পথে অনেক লোকজন। কাজেই তারামণি তাহাদের কাহারও মনে সন্দেহের উদ্রেক না করিয়া যথাসময়ে রাণীর বাড়ীর নিকটে পৌছিল ও অদূরে এক বৃক্ষতলে বসিয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

কিন্তু ঘটনাক্রমে, রাণী নিজেদের সদর দরোজা দিয়া প্রবেশ না করিয়া ঘোষ-গৃহিণীর বাটীর মধ্য দিয়া, নিজের বাটীতে প্রবেশ করিল। তারামণি

কাজেই একটু গোলমালে পড়িয়া ভাবিল—"তাই ত! করিলাম কি? উহাদের সঙ্গে গেলেই ত বুদ্ধির কাজ হইত। ধরিয়াছি ত ভিখারির বেশ। ইহাতে সন্দেহ করিবার ত কোন কারণ জন্মিতে পারে না।"

চতুরা তারামণি হাল ছাড়িল না। সে ভাবিল—"আজ না হয় কাল। যে উপায়ে হোক, উহার সন্ধান লইতে হইবে। আজ যে টুকু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি, বোধ হয় ইহাই দুই টাকা বখশিশের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে।"

তারামণি চিরদিনই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। অসম্ভব-সম্ভব-কারিণী। বিশেষতঃ এসব কাজে সে খুব ওস্তাদ। কাজেই সে গ্রামের মধ্য হইতে আরও কিছু নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, শিবরামপুরে ফিরিয়া গেল।

যে যুবক তারামণিকে তাহার দূতীরূপে হেমরাণীর অনুসরণ করিতে নিযুক্ত করিয়াছিল—তিনিই আমাদের ছোট-তরফের জমীদার সুরেন্দ্রকুমার। আজকাল তাহার এইরূপই অধঃপতন হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রকুমারের প্রাণের মধ্যে, হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে—হেমরাণীর উজ্জ্বল রূপের ছায়া বসিয়া গিয়াছিল। দ্বিতলের সেই জানালা হইতে, সবই ভাল-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সুরেন্দ্র মনে ভাবিল—"এ পর্য্যন্ত অনেক দেখিলাম, কই এমনটী ত আমার চোখে পড়ে নাই। আমাদের এ অঞ্চলে, যে এমন সুন্দরী থাকিতে পারে, এ ধারণা ত আমার ছিল না। যাই হ'ক তারামণিকে তাহার পরিচয় আনিতে পাঠাইয়াছি, দেখি সে কি সংবাদ আনে?"

উৎকণ্ঠিত চিত্তে সুরেন্দ্র সময়টা কাটাইতে লাগিল। তাহার মনের ধৈর্য্য, শান্তি, স্থিরতা, সবই যেন হেমরাণীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। তাহার হৃদয় সেই অপূর্ব্ব মাধুরীময় রূপের জ্যোতিতে উজ্জ্বলিত।

সম্মুখে হেনরী উডের একখানি সুন্দর উপন্যাস পড়িয়াছিল। সুরেন্দ্র পাঠে মনোনিবেশ করিল—কিন্তু পারিল না। সে পুস্তকখানি ঠেলিয়া ফেলিয়া

দিয়া, বিরক্তির সহিত আবার বাতায়ন পথে আসিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যার সেই মৃদুস্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহও তাহার প্রাণের উষ্মা দূর করিতে পারিল না।

সুরেন্দ্র মনে মনে ভাবিল—"কে এ? কোথা হইতে আসিয়া আমার এ সর্ব্বনাশ করিল? হৃদয় মন অধিকার করিয়া, আমার এ অন্ধকারভরা হৃদয়ে রাজরাজেশ্বরীর মত, সিংহাসন পাতিয়া বসিল! চক্ষু মুদিলে তাহাকে অন্তরে দেখি, চক্ষু চাহিলে তাহাকে নেত্রসম্মুখে দেখি, এই গৃহ মধ্যস্থ উজ্জ্বল মুকুরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই, সে যেন আগুলফ লম্বিত কেশরাশি এলাইয়া, আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। সে হাসিতে কত বিদ্রূপ! কত উপেক্ষা! কত ঘৃণা—কত নির্ম্মমতা।"

সন্ধ্যার পর চাকরেরা আসিয়া বাতি জ্বালিয়া দিল। কক্ষ উজ্জ্বলিত। সুরেন্দ্রকুমার প্রাণের অশান্তি শান্ত করিবার জন্য, আলমারির চাবি খুলিয়া ব্রাণ্ডির বোতল বাহির করিয়া, একমাত্রা ঢালিয়া পান করিয়া, মুখটা বিকৃত করিল। তারপর একখানি ইজিচেয়ারের উপর অঙ্গ ঢালিয়া, নিবিষ্ট মনে একটি "হাভানা" ধরাইয়া, ধূম পান করিতে লাগিল।

এই সময়ে রুদ্ররাম কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া আভূমি প্রণত হইয়া বলিল—"হুজুর! অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিলাম, এজন্য মার্জ্জনা করিবেন।"

সুরেন্দ্র বিরক্তির সহিত বলিল—"আবার কি হাঙ্গাম লইয়া আসিয়াছ?

রুদ্ররাম বলিল—"এই দলিলখানি একবার দেখিবেন কি?"

সুরেন্দ্রকুমার গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তোমার অই বড় দোষ রুদ্ররাম! যে তুমি সময় অসময় না বুঝিয়া আমায় ত্যক্ত করিতে এস। বিনা ইনস্ট্রাকশানে তুমি কোন কাজই করিতে পার না। বড়ই ইডিয়াট তুমি! যাও, এখন তোমার অন্য কাজ দেখ গে। কাল সকালে ঐ দলিল লইয়া আসিও।"

রুদ্ররাম তাহার প্রভুকে চিনিত। কাজেই সে "যো হুকুম হুজুর" বলিয়া একটি প্রণাম করিয়া, সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। কর্ম্মচারীদের মুখে, সুরেন্দ্রবাবু এই প্রকার "হুজুর"—"খোদাবন্দ" "ধর্ম্মাবতার" ইত্যাদি বিশেষণগুলি শুনিতে বড়ই পছন্দ করিত, কাজেই তাঁহার ভৃত্যেরা ও অনুগত আশ্রিতবর্গ এই ভাবেই তাহাকে সম্বোধন করিত।

সুরেন্দ্র আবার ব্রাণ্ডি ও সোডা উদরস্থ করিলেন। চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া চুরুটটী পুনরায় ধরাইয়া, নিবিষ্ট মনে ধূম পান করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে তারামণি সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল "হুজুর!"

তারামণির পরিচিত কণ্ঠস্বর, তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র চমকিয়া উঠিয়া, জমীদার সুরেন্দ্রকুমার চেয়ার হইতে উঠিয়া উদ্বেগপূর্ণ স্বরে বলিল—"খপর কি তারামণি! যে জন্য তোমায় পাঠাইয়াছিলাম তাহা কি সিদ্ধ করিয়া আসিয়াছ?"

তারামণি কার্পেট মোড়া সেই মেঝের উপর সুরেন্দ্রের সম্মুখে বসিয়া, সহাস্য মুখে বলিল—"হাঁ—আশার অর্দ্ধেক ফল হইয়াছে!"

সুরেন্দ্র। কোন গ্রামে তাহারা থাকে?

তারামণি। দেবানন্দপুরে!

সুরেন্দ্র। দেবানন্দপুরে? কার বাড়ী?

তারামণি। দুইখানি বাড়ী পাশাপাশি আছে। যে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, সে বাড়ী তাদের নয়। সন্ধানে জানিলাম, সে দেবানন্দপুরের রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর মেয়ে।

সুরেন্দ্র। তোমার কোন ভুল হয় নাই ত?

তারামণি। জানেন ত হুজুর! আপনার আশীর্ব্বাদে এসব কাজে আমার কখনও ভুল হয় না।

এতক্ষণের পর সুরেন্দ্রের মুখে হাসি দেখা দিল। সুরেন্দ্র সহাস্য মুখে বলিল—"তারামণি! এইবার তোমার কৌশল ও বুদ্ধিটার দৌড় কত দূর তাহা বুঝিয়া লইব।"

রমাপ্রসন্নের নামোল্লেখে সুরেন্দ্রের হৃদয়টা যেন একটু অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। এই রমাপ্রসন্নই যে তাঁহার জ্ঞাতি হেমেন্দ্রকুমারের সদর নায়েব ছিলেন। সুরেন্দ্র ভাবিতেছিল, হেমেন্দ্রের জমীদারীর মধ্যে গিয়া, তাহার আশ্রিত লোকের উপর কোনরূপ অত্যাচার করা বড় সহজ কাজ নয়।

তারামণি সহসা সুরেন্দ্রকুমারকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বলিল—"ভাবছেন কি হুজুর?"

সুরেন্দ্র। ভাবছি—কাজটা বড়ই দুরূহ!

তারামণি। এই তারামণি বেঁচে থাকতে?

সুরেন্দ্র। বটে—কিন্তু ওরা হচ্ছে আমার পরম শত্রু হেমেন্দ্রকুমারের প্রতিবাসী। হেমেন্দ্রকে আমি হাজারই তুচ্ছ তাচ্ছল্য করি না কেন, মামলা-মোকদ্দমা করিয়া তাকে হয়রাণ করি না কেন—মনে মনে আমি তাকে খুবই ভয় করি।

তারামণি সহাস্যে বলিল—"ওসব ভয় ভাবনা রেখে দিন এখন। দুই এক দিনের মধ্যে, আমি নূতন ভোল বদলে ভিখিরী বৈষ্ণবী সেজে, আর একবার দেবানন্দপুরে যাবো। তারপর ওদের ভিতরের সংবাদ সংগ্রহ করে হুজুরকে যখন এনে দোব, তখন ভেবে দেখবেন, কাজটা সহজ কি শক্ত কি না? তারামণি না কর্ত্তে পারে, এমন কাজই নেই। আর না করলেই বা আমাদের পেট চলে কই?'

মনের মত সংবাদটী পাইয়া, আর তারামণির আশ্বাসবাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া, সুরেন্দ্রকুমার তাহার পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া তারামণিকে দিল। তৎপরে বলিল—"এখন আর তোমার অনর্থক

এ বাগানে আসিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু দুই দিন পরে আমি এ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ চাইই।

তারামণি বলিল—"আমি নিজের গরজেই দেখা দোব। হুজুরকে সেজন্য ভাব্‌তে হবে না।"

এই কথা বলিয়া তারামণি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে সুরেন্দ্রের কক্ষ হইতে চলিয়া গেল।

তাহার আবাস বাটীটি সর্ব্বদা কোলাহলসংকুল, আর সেখানে তাহার স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের অনেক অসুবিধা দেখিয়া, সুরেন্দ্রকুমার তাহার বাসস্থান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে, শিবরামপুরে এই বাগান বাটী নূতন ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কর্ত্তাদের আমলে বাগান বাগিচা এই রূপই ছিল। তবে পৈত্রিক আমলের একতলা বাগানের ঘর গুলিকে দ্বিতলে পরিবর্ত্তন করিয়া, অধিকাংশ সময়ই সুরেন্দ্রবাবু এই বাগানে থাকেন।

তাঁহার কলিকাতার বন্ধুবর্গের সমাগমে এক এক সময়ে এই বাগানবাড়ী বড়ই জমজমাট হইয়া উঠে। তখন আশে পাশের গরীব দুঃখী লোকেরা আমোদের হল্লা ও চীৎকারে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে।

বিপত্নীক হওয়ার পর সুরেন্দ্র কুমারের আত্মীয়েরা, বিশেষতঃ তাহার জননী ঠাকুরাণী, পুনরায় তাহাকে সংসারী করিবার জন্য খুবই চেষ্টা করেন। সুরেন্দ্র কুমারের জননী ঘটকী নিযুক্ত করিয়া চারিদিকে লোক পাঠাইয়া, দুই তিনটী সুন্দরী কন্যারও জোগাড় করিয়াছিলেন। এমন কি—দেবানন্দপুরের নায়েব রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর মেয়ে খুব সুন্দরী বলিয়া—সে অঞ্চলে বিদিত থাকায়, তাহার সহিত ও সম্বন্ধ চেষ্টা করা হয়। কিন্তু রমাপ্রসন্ন, মনিবের শত্রুপক্ষীয় জমীদারকে কন্যা দিতে অস্বীকৃত হয়েন। সে আট দশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা!

ঘাটের চাঁদনীতে পরিদৃষ্টা রমণী যে রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর কন্যা, তাহা শুনিয়া সুরেন্দ্রকুমার বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িল। কারণ সে শুনিয়াছিল, রুদ্ররামের

স্বগ্রামবাসী এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের একমাত্র পুত্রের সহিত এই রূপসী চক্রবর্ত্তী কন্যার বিবাহ হইয়াছে।

তারামণিকে বিদায় করিয়া, দিয়া সুরেন্দ্র আবার মদিরা পান করিল। তাহার চিত্তে একটা অপূর্ব্ব প্রফুল্লতা আসিল। সে মনে মনে ভাবিল, আমি যখন যে কাজে হাত দিয়াছি, তাহা নিজের ইচ্ছামত শেষ না করিয়া কখনও ফিরি নাই! তুচ্ছ এই রমাপ্রসন্নের কন্যা! ছোট-তরফের প্রবল প্রতাপশালী জমীদার সুরেন্দ্রকুমারের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেয়, এমন শক্তি ত কাহারও দেখি না।

সুরেন্দ্র অবশচিত্তে, অলস দেহে, সেই ইজি-চেয়ারে লম্বমান হইয়া সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে—তন্দ্রামগ্ন হইল। সে অবস্থাটা জাগরণ ও নিদ্রার সন্ধিস্থল।

সুরেন্দ্র শুনিল, কে যেন বীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাহিতেছে—

"জনম অবধি হাম্ রূপ নিরখিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

(৮)

রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর পর হইতেই, তাহার পত্নী বিন্দুবাসিনী দেবীর শরীরটা বড়ই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ভাঙ্গাঘরকে যেমন ঠেকো-ঠাকা দিয়া, জোড়তাড় দিয়া, কোন রকমে কাঠামো খানিকে খাড়া রাখা হয়, সেইরূপ নানারূপ দৈব ঔষধ, মুষ্টিযোগ টোট্‌কা ব্যবস্থায়, তাঁহার অবসন্ন দেহটাকে কোন রকমে খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছিল।

তারপর রাসমোহনের সে দিনকার দুর্ব্ব্যবহারটা, তাঁহার মনে বড়ই একটা প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছে। কোন মতেই সে আঘাত তিনি সামলাইতে পারিলেন না। বিনাদোষে স্বামী পরিত্যক্তা এই কন্যার অদৃষ্টে কি ঘটিবে,

ইহা ভাবিয়া তিনি বড়ই মুসড়িয়া পড়িলেন। রূপশালিনী এই যুবতী কন্যাকে, কাহার কাছে রাখিয়া যাইবেন, এই চিন্তাটাই তখন তাহার সাংঘাতিক চিন্তা হইয়া উঠিল। ধর্ম্মমতে, শাস্ত্রমতে, সমাজের বিধানে, মনুষ্যত্বের খাতিরে, যাহার ভার লইবার কথা, তাহার ব্যবহার ত এইরূপ। মনের সুখ লইয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকে। দুঃখের জ্বালা সহিয়া, মর্ম্ম বেদনার নিশ্বাস ফেলিয়া, দিনরাত দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া, দিনরাত কাটানো যেন—জীবন্তে মৃত্যু।

লোকে মরিয়াই বাঁচে। তাহার সকল দুঃখ কষ্টের জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হয়। কিন্তু মৃত্যু তাঁহার দুয়ারে আসন পাতিয়া বসিয়া আছে, তবুও মরণে বিন্দুবাসিনীর শান্তি নাই। সর্ব্বদাই ভাবনা, আমি মরিলে রাণীর কি হইবে! এই সব অনাগত বিপদ যাহা চারি দিক হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে, তাহার চিন্তায় বিন্দুবাসিনী দেবীর রোগ আরোগ্যের পথে অগ্রসর হওয়া দূরে থাক—বরঞ্চ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

গ্রাম্য কবিরাজ গোপাল চিন্তামণি, বহুদিন ধরিয়া ঐ গ্রামে চিকিৎসা করিতেছেন। তাঁহার হাতেই রোগিণীর চিকিৎসা ভার দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য ভিজিটের দাম ও ঔষধের মূল্য বাবত কিছুই তিনি রোগিনীর নিকট হইতে না লইলেও জমীদার হেমেন্দ্রবাবু তাঁহাকে গোপনে টাকা কড়ি দিতেন। সনাতনের নিকট হইতেই, হেমেন্দ্রবাবু বিন্দুবাসিনীর সংবাদ পাইতেন। এই কবিরাজ মহাশয় তাঁহারই একজন আশ্রিত প্রজা। সহজ রাগে তাঁহার নিজ বাড়ীতেও এই গ্রাম্য গোপাল কবিরাজ চিকিৎসাদি করিতেন।

শিবরামপুর হইতে ফিরিয়া আসার দিনটী তার মার আর জ্বর হয় নাই। তার পরদিন শেষরাত্রে জ্বর খুব বাড়িয়া উঠিল।

রোগিনী জ্বরে অঘোর অচৈতন্য। সমস্ত রাত্রি গায়ের জ্বালা ছটপটানি ল বকা। ক্ষেমার মা সেই রাত্রে সনাতনকে ডাকিয়া আনিল। সনাতন

আসিবার সময় একেবারে গোপাল কবিরাজকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। তখন রাত্রি বারটা। হেমেন্দ্রবাবু কবিরাজকে পূর্ব্ব হইতেই উপদেশ দিয়াছিলেন, যে যখনই প্রয়োজন হইবে তখনই যেন তিনি চক্রবর্ত্তী বাড়ী গিয়া, রোগিণীর চিকিৎসা করেন।

কবিরাজ মহাশয় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মুখ বাঁকাইলেন। বলিলেন— "জ্বরটা খুব বেশী হইয়াছে। সম্ভবতঃ শেষ রাত্রে ছাড়িতে পারে। তবে উপস্থিত ভয়ের কারণ নাই। এই দুইটি বড়ী রাত্রের মধ্যে খাওয়ান চাই।"

সনাতন সে দিন রাত্রে রাণীদের বাড়ীতেই রহিল। রাণী ও সনাতন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রোগীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সকাল বেলা জ্বরটা ছাড়িয়া যাওয়ায়, রোগিণী অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন। সনাতন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তত বেলা পর্য্যন্ত সে চণ্ডীমণ্ডপে পড়িয়া ঘুমাইতেছে।

সেই দিন প্রভাতে বর্দ্ধমান হইতে ভাল কবিরাজ আসিবার কথা। রাণী সনাতনকে তুলিয়া দিয়া বলিল—"মা এখন ভাল আছেন। তাঁর জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। এখন বেশ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। সহরের সেই বড় কবিরাজ আসিবেন বলিয়া, কাল রাত্রে তুমি বলিয়াছিলে—তোমাকে সকাল সকাল জাগাইয়া দিতে। আমার মত অভাগিনীর জন্য তোমার নিদ্রাতেও সুখ নাই যে সনাতন!"

সনাতন বলিল—"বার বার কেন আর ও কথা বলিয়া লজ্জা দাও মা! আমি যদি তোমার পেটের সন্তান হইতাম, তাহা হইলে কি এরূপ বলিতে?"

সনাতন আর কিছু না বলিয়া, ঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া হেমেন্দ্র বাবুর বাড়ীর দিকে ছুটিল।

রাণী তাহার মায়ের বিছানাটী পরিষ্কার করিয়া দিয়া, দুই তিনটী বালিস উঁচু করিয়া তাঁহার পিঠের দিকে ঠেস স্বরূপ রাখিয়া তাঁহাকে একটু

স্বচ্ছন্দভাবে শয্যার উপর বসাইয়া বলিল—"মা! এখন তুমি কেমন আছ?"

কন্যার এই কাতরতার মর্ম্ম বুঝিয়া, রাণীর মা মলিন হাস্যের সহিত বলিলেন—"এখন ভাল আছি মা।"

কথাটা শুনিয়া রাণী একটু ভরসা পাইল। সে বলিল,—"কাপড়খানা ছাড়াইয়া দিয়াছি। জপের মালাটা আনিয়া দিই। ভগবানকে একবার ডাকিয়া একটু মিছরী মুখে দিয়া জল খাও।"

সমস্ত রাত্রের কঠোর জ্বরে বৃদ্ধার সত্যসত্যই বড় তৃষ্ণা পাইয়াছিল। তিনি জপের মালা লইয়া ঠাকুরের নাম জপ করিতে লাগিলেন। রাণী বলিল—"মা! তুমি জপটা শেস করে ফেল। এসে তোমায় খাবার দোব।"

রাণী সশব্যস্তে উপরের ঘরে চলিয়া গেল। ঠাকুরঘরের পাট্‌ঝাট্‌ নিত্যই সে নিজের হাতে করে। সেই কাজগুলি শেষ করিয়া, সে ঠাকুরের সম্মুখে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল। অস্ফুট স্বরে বলিল—"ভগবান! মানুষ দম্ভ, অভিমান, ঐশ্বর্য্য, আত্মম্ভরিতায় তোমায় ভুলিয়া থাকে। তাদের নিজের শক্তিতে বিশ্বাস করে। মনে একবারও তারা ভাবিয়া দেখে না, যে তোমার শক্তির কাছে তারা কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ। ভগবান! নারায়ণ, তুমি যে অনাথার আশ্রয়, দরিদ্রের সখা—আর্ত্তের বিধাতা, বিপন্নের ত্রাতা। কৃপা করিয়া আমার মার রোগটী সারাইয়া দাও। তাঁকে আরও কিছুদিন এ ধরায় রাখ। এ সংসারে আমার যে আর কোন আশ্রয়ই নাই। স্বামী যিনি, দেবতা আমার যিনি, যাঁর আশ্রয়ে থাকিলে আজ আমি, ঘরণী, গৃহিণী, সংসারলক্ষ্মী, তিনি আমার ভাগ্যদোষে, বিনা অপরাধে, আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমার আশ্রয় স্থান নাই, ইহজগতের রক্ষাকর্ত্তা নাই। এইরূপ যৌবন আমার পরম শত্রু।

মধুস্থদন! আমার আর কোন প্রার্থনাই তোমার কাছে নাই—আমার মাকে রোগমুক্ত কর।”

প্রণাম করিয়া, রাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই গণ্ড দিয়া ভক্তির অশ্রু প্রবাহ বহিতেছে। তাহার জ্বালাময় প্রাণটা, যেন অশ্রুনির্গমে অনেকটা শান্তি লাভ করিয়াছে।

রাণী নীচে আসিয়া বেদানা ছাড়াইয়া, একটু মিছরী গুঁড়া করিয়া দুইটি পানিফল ছাড়াইয়া, মার কাছে ধরিল। তিনি তখন জপটা শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন।

রাণীর মা সাগ্রহে পথ্যগুলি খাইয়া একটী ছোট ঘটীর সমস্ত জলটুকু এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলিয়া বলিলেন—“আঃ—মাঃ! বাঁচলুম!”

আর সে তাহার মায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার শীর্ণ দক্ষিণ বাহুটী নিজের বাম হাতে তুলিয়া লইয়া, ডান হাতে মৃদুভাবে তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিল।

রাণীর মা, কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“রাণি! একটা কথা বলবো? শুনে ভয় পাবিনি?”

রাণী। কি কথা মা?

রাণীর মা। যদি আমি এবার মরে যাই, তাহলে তোর কি হবে রাণি? কোথায় যাবি মা তুই—আমার চির আদরিণী মেয়ে? কার কাছে থাকবি মা তুই?

রাণী মায়ের মুখটী তাহার দক্ষিণ হস্ত দিয়া অতি মৃদুভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—“না মা, ও সর্ব্বনেশে কথা বলো না। আমার বুকে খুব আঘাত লাগবে! ভয় কি? নিত্য যে নারায়ণের গৃহ মার্জ্জনা করি, তিনিই তোমায় আরাম করে দেবেন। এমন পাপ কিছু করিনি, যাতে এত শীঘ্র তোমায় হারাবো।”

এমন সময়ে সনাতন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া [illegible]—“মা! তুমি

কোথায় গা ? বৰ্দ্ধমানের সেই কবিরাজ মশাই এসেছেন। আর আমাদের জমীদার হেমেন্দ্রবাবু ও গোপাল কবিরাজও তাঁর সঙ্গে আছেন। তাঁদের আমি চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়ে রেখে এসেছি।”

হেমেন্দ্রবাবুর নাম শুনিয়া রাণী একটু সশব্যস্ত হইয়া পড়িল। দেশের জমীদার যিনি, তিনি দয়া করিয়া তাহাদের বাড়ীতে এই বিপদের দিনে আসিয়াছেন—কি মহত্ত্ব তাঁর !

রাণী বলিল—“সনাতন ! তাঁদের সঙ্গে করে বাড়ীর ভেতর নিয়ে এস। বিশেষতঃ হেমেন্দ্রবাবুকে বাহিরে বসিয়ে রাখা ভাল দেখায় না।”

সনাতন কবিরাজ মহাশয়দের ও হেমেন্দ্রবাবুকে বাটীর ভিতরে লইয়া আসিল। হেমেন্দ্রকুমার রাণীকে অৰ্দ্ধাবগুণ্ঠিতা দেখিয়া স্নেহভরে বলিলেন—“রাণি ! বোন্ ! আমার কাছে লজ্জা করছো কেন ? তোমার মা এখন কেমন আছেন ?”

বাল্যকালে রাণী তার পিতার সঙ্গে কতবার হেমেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে গিয়াছে। হেমেন্দ্রবাবু তাহাকে কোলে করিয়া কত আদর করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান কৰ্ম্মচারী রমাপ্রসন্নকে, তিনি কৰ্ম্মচারী বলিয়া না ভাবিয়া খুব আপনার জনের মতই দেখিতেন। বিবাহ হইবার পরও রাণী, দুই একবার হেমেন্দ্রবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যুর পর, সে বাড়ী ছাড়িয়া আর কোথাও যাইত না।

রাণী মুখের ঘোমটা কতকটা টানিয়া লইয়া, অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিল—“মার কাল রাত্রে আবার জ্বর হয়েছিল। কি হবে দাদা বাবু ?”

রাণীর চোখে জল দেখিয়া হেমেনবাবু বড়ই মৰ্ম্মপীড়িত হইলেন। তিনি উৎসাহসূচক স্বরে বলিলেন—“ভয় কি রাণী ? তোমার মা সেরে উঠ্‌বেন। বয়স হয়েছে, তার উপর এই শোক তাপ। রোগ সহজ হলেও দুর্ব্বল শরীরে যেন বেশী হয়ে পড়ে। আমি তোমার ধৰ্ম্মছেলে এই সনাতনের কাছে

তোমাদের নিত্য সংবাদ পাই। শুনলুম তোমার মার এই অবস্থাটা দেখে তুমি বড়ই দমে পড়েছো। তাই আমি বর্দ্ধমান থেকে এই কবিরাজ মহাশয়কে আনিয়েছি।"

হেমেন্দ্রের নিকট রাণীর যে লজ্জা সংকোচ ছিল, তাহা এই দুঃখের দিনের সহানুভূতিতে শিথিল হইয়া পড়িল। সে বলিল—"আপনার কাছে আমরা চিরদিনই ঋণী। আপনি এই গরীবদের জন্যে যা ক'চ্ছেন, সে ঋণ শোধ করবার সামর্থ্য আমাদের নেই।"

হেমেন্দ্রবাবু কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন—"আর তোমার স্বর্গীয় পিতা, আমাকে যে ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তার কণা মাত্র কি আমি শোধ করতে পেরেছি হেমরাণী! তোমার মা এখন ঘুমাইতেছেন। উহাঁকে এখন আর জাগাইয়া কাজ নাই, কবিরাজ মহাশয় এই অবসরে নাড়িটা দেখে নিন্।

বর্দ্ধমান হইতে আনীত এই কবিরাজটী প্রবীণ, শাস্ত্রাভিজ্ঞ। নাম ডাকও তাঁহার খুব। বর্দ্ধমানের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারেও তিনি চিকিৎসা করিয়া থাকেন। আর প্রয়োজন হইলে, হেমেন্দ্র বাবুও নিজ পরিবারিক চিকিৎসার জন্য, তাঁহাকে দেবানন্দপুরে আনাইয়া থাকেন।

কবিরাজ মহাশয় বিশেষ মনঃসংযোগের সহিত নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"এখনও নাড়ীতে জ্বর রহিয়াছে। আমি ঔষধ পত্র ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যাইতেছি। আমার বিশ্বাস এই ঔষধেই ঘুস্‌ঘুসে জ্বরটা বন্ধ হইবে, রোগিনীও একটু চাঙ্গা হইয়া উঠিবেন।"

কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধের ক্ষুদ্র বাক্সটী সনাতনই বহিয়া আনিয়াছিল। বাক্সটী সে বহির্ব্বাটী হইতে আনিয়া দিলে, প্রাজ্ঞ কবিরাজ মহাশয় তাহা হইতে দুই প্রকারের ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। তৎপরে রাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মা! তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। তবে

ঔষধ গুলি যেন নিয়মিত রূপে খাওয়ান হয়। আর কি করিতে হইবে, তাহা তোমাদের গ্রামের কবিরাজ মহাশয়কে আমি বলিয়া যাইতেছি।”

ঔষধাদির যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া, বৰ্দ্ধমানের কবিরাজ মহাশয় হেমেন্দ্র-বাবুর সহিত বাহির বাটীতে আসিলেন। হেমেন্দ্রবাবুকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—“মেয়েটী ভয় পাইবে বলিয়া আমি তাঁর সুমুখে কিছু বলি নাই। দারুণ মনস্তাপে ওঁর যক্ষ্মা রোগ জন্মিয়াছে। রোগ যা অনিষ্ট করিবার তা করিয়াছে। বাঁচিবার আশা খুব কম। তবে ঔষধে রোগীকে যতদিন জগতের এ পারে টানিয়া রাখিতে পারে।”

সেই গ্রামের গোপাল কবিরাজ মহাশয়ও এই মতের পোষকতা করিতে বাধ্য হইলেন। বৰ্দ্ধমানের কবিরাজ মহাশয় তাহাকে এ সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ দিয়া হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তাঁহার বাটীর দিকে চলিলেন।

আর তিনি সনাতনকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন—“দেখো বাবু! ওঁর ঐ মেয়েটী যেন ভিতরের কথা জানতে না পারে। তাহলে বড়ই বুকভাঙ্গা হয়ে পড়বে।”

পথিমধ্যে সনাতন, হেমেন্দ্রবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“তা হ’লে কি হবে রাঙ্গাবাবু? আমার অভাগিনী মায়ের যে কেউ আপনার বলতে নেই। স্বামী থাকতেও যে মা আমার তাঁর চরণাশ্রয় হতে বঞ্চিতা।”

হেমেন্দ্রকুমার এই সনাতনের মুখে, রাসমোহনের আগমন ও প্রত্যাগমন সম্বন্ধে সকল কথাই শুনিয়া ছিলেন। আর সনাতন, রাণীর মার মুখ হইতেই এ ব্যাপারটা জানিতে পারে।

হেমেন্দ্রবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন—“আর্ত্তের, অনাথের, দুঃখীর, সহায়-হীনের ভরসা ঐ—করুণাময় ভগবান। তাঁহার উপর বিশ্বাস কর। মাতৃহীন শিশুও যখন এই ভগবানের কৃপায় রক্ষা পায়, তখন হেমরাণীর নিশ্চয়ই কোন না কোন উপায় তিনি করিবেন।”

(৯)

মানুষ যখন দেবত্বের পবিত্র গণ্ডীর মধ্যে থাকে, তখন শয়তান বা পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ভয় করিয়া চলে। কিন্তু একবার কোনরূপে এই শয়তানের শক্তির অধীন হইলে, সে তাহার ক্রীতদাস হইয়া পড়ে।

ইংরাজীতে একটী বহুদিনের পুরাতন প্রবাদবাক্য আছে,—তোমার সঙ্গীদের নাম ও পরিচয় আমায় দাও, আমি অতি সহজেই বলিয়া দিব, তুমি কোন শ্রেণীর লোক! সুতরাং সুরেন্দ্র কি চরিত্রের লোক, তাহার সঙ্গীরাই তাহার প্রমাণ।

সুরেন্দ্রকুমার নবীন ও বিত্তবান। এক সময়ে সে কোনরূপ পাপ করিতে বড় সংকোচ বোধ করিত। কিন্তু তাহার পত্নী বিয়োগের পর হইতে, তাহার সমূহ অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে।

সুরেন্দ্রকুমারের সহিত এক সময়ে এই হেমরাণীর বিবাহ প্রস্তাব হইয়াছিল—কথাটা সত্য। কিন্তু হেমরাণীর পিতা যাঁহার অধীনে কাজ করিতেন, সুরেন্দ্রকুমার তাঁহার ঘোরশত্রু। তাহা ছাড়া তিনি শুনিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রকুমার—চরিত্রহীন, মদ্যপায়ী। যৌবন ধনসম্পত্তি প্রভুত্ব আর অবিবেকিতা, এই কয়েটীর একটীমাত্র হইতেই যখন অনর্থ উপস্থিত হয়, তখন এই পাঁচটী একত্রে মিশিলে ত কথাই নাই! সুরেন্দ্রকুমারের ভাগ্য দোষে পাঁচটীই একত্রে সন্ধিবন্ধন করিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। কাজেই তাঁহার অধঃপতন সুচনার পথ অতি সরল হইয়া পড়ে।

সুরেন্দ্রকুমারের পিতা, কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পল্লীতে, এক খানি মাঝারি ধরণের বাড়ী কিনিয়া গিয়াছিলেন। তিনি যখন মামলা-মোকদ্দামা,

বিষয়-কার্য্য, কিম্বা কলিকাতায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিতেন, তখন এই বাড়ীতেই থাকিতেন।

এখনও সে বাড়ী বর্ত্তমান। এখনও তাহা সুরেন্দ্রের দখলে। কিন্তু সুরেন্দ্রকুমার কলিকাতায় বড় একটা থাকেন না। একবার কোন কুৎসিৎ-স্থানে গিয়া, মাতাল অবস্থায় তিনি তাঁহার এক ইয়ারের মাথা ফাটাইয়া দেন। এজন্য তাঁহার নামে পুলিস-কোর্টে মোকদ্দামা পর্য্যন্ত দায়ের হয়। কোন উপায়ে প্রচুর অর্থব্যয়ে ব্যাপারটা আপোসে মিটাইয়া ফেলিয়া, সুরেন্দ্র সে যাত্রা পরিত্রাণ পান। সেই ব্যাপার হইতেই, কলিকাতার অবস্থান সম্বন্ধে তাঁহার প্রবৃত্তি কমিয়া আসে।

তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে সঙ্গীও যাহারা জুটিয়াছিল, তাহারা ভগবানের শান্তিময় পুণ্যের সংসার হইতে নির্ব্বাসিত ও বিতাড়িত। ইহাদের মধ্যে তাঁহার কলিকাতার বাল্যবন্ধু বিনয়ভূষণ, তাহার সদয় নায়েব রুদ্ররাম, আর এই তারামণিই প্রধান।

এই ত্র্যহস্পর্শের সংযোগেই তাহার অধঃপতন হইতেছিল। শয়তানী তারামণি, তাহার এক দূর সম্পর্কীয়া দরিদ্র আত্মীয়ের বিধবা কন্যাকে অর্থের প্রলোভন, আর ভবিষ্যতের সুখের আশা দেখাইয়া, এই পত্নীহীন সুরেন্দ্রকুমারের শয্যাসঙ্গিনী করিয়া দেয়। তার নাম—হরিমতি। সেই হরিমতি আগে সুরেনবাবুর বাগান বাটীর দ্বিতলের প্রকোষ্ঠেই থাকিত। তাহার সহিত আমোদে প্রমোদে, বিপত্নীক সুরেন্দ্রবাবুর দিন রাত কাটিয়া যাইত। কিন্তু কি জানি কি অব্যক্ত কারণে, সুরেন্দ্রের এক সময়ের আদরিণী এই হরিমতি, আজ কাল তাঁহার বিরাগ নেত্রে পড়িয়াছে। সে বাগান বাড়ীতে আর বড় আসে না।

এই হরিমতি, তখন তারামণির বাটীতেই থাকিত। সে তারামণিকে খুব ভালরূপই জানিত। সে তাহাকে ক্রুর সর্পীর মত বিবেচনা করিয়া

সাধ্যমতে তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু সমাজে তাহার আর অন্য আশ্রয় স্থান নাই, সুরেন্দ্রবাবুও আজকাল তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ। কাজেই সে নিরুপায় হইয়া, অন্তরে একটা বিষম আত্মগ্লানি ও অনুতাপের তুষানল পূরিয়া, মুখ বুজিয়া এই তারামণির বাটীতেই থাকিত।

সুরেন্দ্রবাবু কখনও কখনও তাহাকে আমোদ প্রমোদের জন্য ডাকিয়া পাঠাইতেন। কখনও বা সে উপযাচিকা হইয়া তোষামোদ করিয়া সুরেন্দ্র বাবুর নিকট হাজির হইত। কারণ তাহার মনে একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল।

শয়তানী তারামণি, যাহা বলে তাহাই করে। টাকা পাইলে সে না করিতে পারে, এমন কাজই এই দুনিয়ায় নাই।

সুরেন্দ্রকুমারের আদেশে সে আর একদিন সুযোগমতে বৈষ্ণবী ভিখারিণীর বেশে দেবানন্দপুরে আসিয়া, হেমরাণী সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করিয়া করিয়া লইয়া গিয়াছে। ভিখারিণী সাজিয়া সে হেমরাণীর হাত হইতে মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে।

রাত্রি তখন নয়টা। পল্লীপথ লোকচলাচল বিহীন। তাহার নির্জ্জন বাগানবাটীর একটী দীপোজ্জ্বলিত কক্ষে বসিয়া, সুরেন্দ্রবাবু একটী সুবাসিত মূল্যবান হাভানার ধূম পান করিতেছেন, আর এক এক বার দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। তাঁহার রুচি-প্রকৃতি, মেজাজ, কার্য্যপ্রণালী, অনেকটা লেফাফা-দোরস্ত ও সাহেবী ধরণের।

এমন সময়ে তারামণি সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল— "হুজুর কি ঘুমাইতেছেন?"

সুরেন্দ্রকুমার চক্ষু বুজিয়া হেমরাণীর রূপরাশি নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতেছিলেন, আর চিন্তার প্রত্যেক তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে, কুণ্ডলীকৃত সুগন্ধ ধূম ছাড়িয়া, সেই কক্ষটীকে আকুলিত করিতেছেন।

তারামণির কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্রই তিনি চক্ষু চাহিয়া বলিলেন—"তোমার এত রাত হইল যে?"

তারামণি হাস্যমুখে বলিল—"সে কথা পরে বলিব। কিন্তু আমাকে কি পুরস্কার দিবেন আগে বলুন।"

সুরেন্দ্রকুমার সহাস্যমুখে বলিলেন—"তার জন্য ভাবনা কেন? কবেই বা কোন কাজ তুমি দয়া ভেবে করেছ? তোমার নূতন খপর কি তা বল?"

তারামণি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"দেবানন্দপুরে আমার এক মাসীর বাড়ী আছে। সে মাসী জাতগোয়ালা আর আমার বড় ভাল বাসে। সকল বাড়ীতে দুধ যোগান তার ব্যবসা। সুতরাং এই রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর সংসারের সকল খপরই তিনি রাখেন।"

সুরেন্দ্রকুমার চুরুটে একটী জোর টান দিয়া, তাহার ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন—"শুনি তোমার এবারের নূতন খপরটা কি?"

তারামণি বলিল—"খপর যা পাইয়াছি, তা আপনার পক্ষেই শুভ। ওদের অবস্থা আজ কাল বড়ই খারাপ। অতি কষ্টে দিন চল্‌ছে। তার উপর ঐ হেমরাণীর সোয়ামী ওকে ত্যাগ করে চ'লে গেছে। ওর মা'ও কঠিন ব্যারামে ভুগছে। শুনলুম ও গাঁয়ের জমীদার হেমেনবাবু বর্দ্ধমান থেকে কবিরাজ আনিয়ে, ওর মার চিকিৎসা পত্র কচ্ছেন।"

সাপুড়ের তুবড়ির আওয়াজ শুনিলে, ঝাঁপির মধ্যস্থ সাপ যেমন মাথা তুলিয়া ফণা ধরে, হেমেন্দ্রের নামোচ্চারণে সুরেন্দ্রের ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইল। সুরেন্দ্র বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"ওঃ! ভায়া আমার দেখ্‌ছি, খুব চৌকোষ লোক। আগে থাকতেই আমল করে নিয়েছেন। তা না হইলে তাঁর এত খরচ পত্র করা কেন আর ওদের জন্য এত মাথা ব্যথাই বা কেন?

তারামণি একথায় সুযোগ পাইয়া বলিল—"তা নিশ্চয়ই এর ভিতরে একটা কথা আছে বই কি?"

সুরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—"এখন কি করবে বল দেখি ?"

তারামণি গম্ভীর মুখে বলিল—"ছুঁড়ীটা কারও দিকে মুখ তুলে কথা কয় না। দেখলুম্ ভারী লজ্জাশীলা। আপনাকে দেখছি কিছুদিন অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। তারপর এই তারামণি বৈষ্ণবী কি কর্ত্তে পারে, তা আপনাকে দেখিয়ে দোব। ওর মা'টাকে আগে মরতে দিন। যতদূর খপর পেলুম, বুড়ী বোধ হয় এ যাত্রা টিকছে না।

সুরেন্দ্র মনে মনে কি ভাবিয়া বলিল—"কিন্তু আমার চিরশত্রু হেমেন্দ্র যদি আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় ?"

তারামণি একটু দর্পের সহিত বলিল—"হুজুর কি জমীদার নন? হুজুরের কি লাঠিয়াল নেই ? এই হরিমতি ছুঁড়ীটাকে আনবার সময় কি কাণ্ডটাই না করেছেন ! আপনি এসব ব্যাপারে ভয় খেলে, আমাদের কাজ করবার সাহস যে লোপ পেয়ে যায়।

এমন সময়ে বাহিরে যেন দুই তিন লোকের হাস্য-কলবর শ্রুত হইল। সঙ্গে সঙ্গেই সুরেন্দ্রের একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "কলিকাতা থেকে আপনার সেই বন্ধু বাবু দুটি এসেছেন।"

সেই রাত্রে সহসা মিত্রাগমন সংবাদে, সুরেন্দ্রবাবু যেন একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তারামণিকে বলিলেন—"তুমি তেতালার ঘরে গিয়া অপেক্ষা কর। আমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ না হইলে চলিয়া যাইও না।"

তারামণি তখনই সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। সে দেখিল, কক্ষদ্বারের নিকটে কে যেন একজন ওৎ পাতিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়াই সে অন্যদিকে চলিয়া গেল। আর সেখানে কোন আলো ছিল না বলিয়া স্থানটা একটু অন্ধকারময়। তাহার সম্মুখেই উপরে উঠিবার সিঁড়ি। সেখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিবারও কোন সুযোগ নাই, কেননা বাবুরা এখনই উপরে আসিবেন। সুতরাং সে এ বিষয়ের কোন অনুসন্ধানের অবসর

পাইয়া, উপরের ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে বড়ই একটা ট্কা রহিয়া গেল।

সিঁড়িতে তাঁহার আগন্তুক বন্ধুদের পদশব্দ পাইয়া, সুরেন্দ্রকুমার কক্ষের াহিরে আসিয়া তাহাদের দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—
Quite unexpected! Hallo!"

তাহাদের একজন অগ্রসর হইয়া সাহেবী-ধরণে সেক্হ্যাণ্ডের সহিত, ন্তপাতি বিকশিত করিয়া আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিল—"How do ou do—Mr. Roy. Certainly we are quite unexpected.

এই ভাবে আত্মীয়তার আদান-প্রদানের পর সুরেন্দ্রকুমার তাঁহার বন্ধু-কে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটী টেবিলের চারিধার ঘিরিয়া সিয়া বলিলেন—"বিনয়, আর দেবেন, তোমাদের আজ unexpectedly য়ে ভারি আনন্দ হল। একটা খপর দিয়ে ত আসতে হয়।"

"বিনয় একটী চুরুট ধরাইয়া হাস্যমুখে বলিল—"তার চেয়ে এতে বেশী মোদ নয় কি সুরেন?"

সুরেন্দ্র। পাড়া-গাঁ জায়গা জান ত ভাই। তোমাদের reception এর ন্য যে ভাল রকম কোন জোগাড় হবে তা'ত বোধ হয় না।

দেবেন বলিল—"তাতে আর কি আসে যায়। আমরা তোমার পর ই। প্রাণের টান না থাক্‌লে কি আর আমরা ক্যালকাটা ছেড়ে এই ড়াগাঁয়ে দৌড় দিই।"

সুরেন্দ্র এই আপ্যায়নে সুখী হইয়া বলিল—Thank you very much.

সুরেন্দ্রকুমার সাহেবী মেজাজের লোক। নবীন বলিয়া তাঁহার এক াক্কা খানসামা ছিল। বোতল-ডিপার্টমেণ্ট, এই নবীনেরই হেপাজতে। াজ কর্ম্মে বাবুর মন বুঝিয়া ফায়ফরমায়েস খাটিতে, এই নবীন খানসামা দ্বিতীয়। এজন্য সুরেন্দ্র তাহাকে খুবই বিশ্বাস করিতেন।

নবীন—বাবুর বন্ধুদের সমাগম দেখিয়াই চা তৈয়ারি করিতে গিয়াছিল। সে তিন কাপ্ চা আনিয়া সেই টেবিলের উপর রাখিল। তিনখানা প্লেটে—কিছু ক্র্যাকার বিসকিট্ ধরিয়া দিল।

সুরেন্দ্র তাঁহার বিশ্বাসী খানসামা নবীনকে ডাকিয়া, কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন। নবীন নক্ষত্রবেগে প্রভুর আদেশ পালনের জন্য, সেই কক্ষ হইতে তখনই স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

বিনয় চা সিপ্ করিতে করিতে বলিল—"যাই বল ব্রাদার! তুমি কল্‌কেতা ছেড়ে আসা অবধি, আমরা যেন কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে আছি। তবে—বলতে পারি না, তুমি আমার সঙ্গে ঠিক এক মত হবে কি. না, আমি rural life টাকেই বিশেষ পছন্দ করি।"

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"যে যে অবস্থার থাকে, সে তাতে কখনও সুখী বোধ করে না। কিন্তু আমি ক্যাল্‌কাটাকেই বেশী পছন্দ করি। তবে সেই ফৌজদারির কেলেঙ্কারির কথাটা, যত দিন না ভুল্‌তে পারবো, ততদিন আর ক্যাল্‌কাটা মুখো হচ্ছি না। আর একটা কথা, বাপ-পিতেমো কিছু রেখে গেছেন। বিষয় আশয় বজায় রাখতে হলে, নিজের চোখে বৈষয়িক কাজ কর্ম্মগুলো দেখা ভাল নয় কি?"

বিনয় সুরেনের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—exactly so! আমার বাপও ত কম রেখে যান নি। তা "পল-নিরোর" চরণেই তার অর্দ্ধেক সমর্পণ করেছি। এটা একটা speculation নয় কি?

কথাটায় একটা হাসির গর্‌রা উঠিল। সুরেন্দ্র বলিল—"তুমিও যেমন! যে ক'টা দিন বাঁচা যায়, মনের সুখে কাটিয়ে দেওয়াই ভাল। তোমার "পলনিরোর" মত সুন্দরী কটা আছে হে? আর বল্‌লে খোসামুদে কথা হয়, তুমি আমার আর দেবেনের চেয়ে এ সম্বন্ধে exceptionally fortunate.

ইহার পর সুরেন্দ্রের বন্ধুরা পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করিয়া আবার বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন হইল। মাঝে মাঝে হাসিয়া গর্‌রা উঠায়, সেই নির্জ্জন কক্ষটী খুবই গুলজার হইয়া পড়িল।

রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া, সুরেন্দ্র বন্ধুদের বলিলেন—"নিশ্চয়ই খাবার তৈয়ারি হয়ে গেছে। আন্‌তে বলা যাক্ কি বল ?

সুরেন্দ্র নিজে মদ্যপায়ী। তাহার বাগানের ভাণ্ডারে মুখরোচক ও রসনার তৃপ্তি সাধক, অনেক জিনিসই সংগ্রহ থাকিত। বাগানে একজন রসুয়ে ব্রাহ্মণ ছিল। নবীন খানসামা তাহাকে দিয়া বাবুর প্রয়োজন বুঝিয়া, আধুনিক প্রথায় খানার ব্যবস্থা করিল।

তারপর সে ডিকাণ্টার ইত্যাদি বাহির করিয়া, এক বিস্তৃত টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল। পেগের পর—পেগ্ চলিতে লাগিল। যেমন সুরেন্দ্র তেমনিই তার বন্ধুবর্গ। 'কে—হারে, কে—জিনে' এই ভাবেই আনন্দ স্রোত চলিয়া বোতলটা শেষ হইয়া গেল। বাবুরা যাহা কিছু পারিলেন, আহারাদি করিয়া সে রাত্রের মত শয্যা আশ্রয় করিলেন।

আর তারামণি! সে অনেকক্ষণ ধরিয়াই ত্রিতলের ঘরে অপেক্ষা করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নীচে নামিয়া আসিল। দেখিল, বাবু তখন নেশায় উন্মত্ত। আর নবীন খানসামা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে।

নবীন তারামণিকে দেখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—"আর কেন বৃন্দে! বৃথা অপেক্ষা কচ্ছ। তোমার শ্যামচাঁদ আজ আমোদে মেতেছেন। আজ আর কোন সলাপরার্শ ই চল্‌ছে না।"

তারামণি বাবুর অবস্থা বুঝিয়া দেখিল, নবীন যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক। সে মনে ভাবিয়াছিল, সে দিন কিছু না কিছু আদায় না করিয়া যাইবে না। তাই সে তেতালার সিঁড়ির ঘরে মশক দংশনের যন্ত্রণা সহ্য করিয়া এই আগন্তুক বাবু দুটির মুণ্ডপাত করিতেছিল। প্রতি দিন আধ সের নির্জ্জলা

দুধ না হইলে তার চলে না। সে যখন বুঝিল, দুষ্ট মশকগুলা তাহার দেহের প্রচুর রক্ত শোষণ করিয়াছে, তখন নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় সে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল

তারামণির বাড়ী এই বাগান বাড়ী হইতে বেশী দূর নয়। কাজেই সে নিরাশার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিল।

তাহার এ নিরাশাজনিত মৃদু নিশ্বাসশব্দ নবীনের কাণে পৌছিল। নবীন বলিল—"তারা! অমন করে জোরে নিশ্বেস ফেলিস্ নি। বাবুদের অকল্যাণ হবে। কাল বেলা নটার সময় আসিস্—বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দোব।"

"তোর আর অত আত্মীয়তায় কাজ নেই" বলিয়া তারামণি সেই রাত্রে বাগান বাড়ী ত্যাগ করিয়া, প্রেতিনীর মত অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিল।

(১০)

সকল দিনের সূর্য্যের উদয় সকলের পক্ষে শুভজনক হয় না। এইজন্য অনাদিকাল হইতে সুপ্রভাত কুপ্রভাত, সুদিন কুদিন বলিয়া কয়েকটী কথার প্রচলন হইয়াছে। আর আজও সেইভাবে চলিয়া আসিতেছে।

এই সকল কুদিনের প্রভাব বড়ই শক্তিময়। এরূপ একটী কুপ্রভাতের ফলে, এক একটী সংসারের অবস্থা একেবারে ওলোট-পালোট হইয়া যায়। কাহারও এমন খারাপ দিন আসে, যাহার শোচনীয় স্মৃতি—চিরদিনের জন্য তাহার বুকে শোণিতাক্ষরে আঁকা হইয়া থাকে! সে দিন যে অশ্রু-প্রবাহ বহিতে সূচনা হয়, তাহা চিরকালই বহিতে থাকে। ভগবানও সে অশ্রুধারা মুছাইতে সক্ষম হন না।

আজ হেমরাণীর অতি শোচনীয় কু-দিন। সেই দিনের প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বুকের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল। তাহার মাতা,

গত রজনীর অধিকাংশ অংশটাই ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইয়াছেন। রোগ খুবই বাড়িয়াছে।

বলা বাহুল্য সন্ধ্যার সূচনা হইতে রোগের প্রাবল্য লক্ষ্য করিয়া, গরীব বেচারা সনাতনও বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সারারাত্রি জাগিয়া সে রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছে। কিন্তু রোগের অবস্থা ও গতি দেখিয়া সে মুস্‌ড়াইয়া পড়িল। ভয়ানক প্রলাপ আর সেই সঙ্গে রোগীর অঘোর অচৈতন্য অবস্থা।

সনাতন প্রভাতে উঠিয়াই হেমেন্দ্রবাবুর কাছারীতে সংবাদ দিবার জন্য চলিয়া গিয়াছে। কেননা এই হেমেন্দ্রবাবুই, তাহাদের এ ভয়ানক বিপদের সময়, একমাত্র নিঃস্বার্থ উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক।

রাণী সেদিন সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া জননীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে। আর থাকিয়া থাকিয়া মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। আবার কথনও বা সেই মলিন বিশীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে, পলকহীন চাহিয়া থাকিয়া, তাহার ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছে।

তাহার বেদনাকাতর হৃদয়ের মধ্য হইতে, কে যেন তাহাকে স্পষ্ট বলিতেছে—"এ জগতে তোমার যাহা আপনার ছিল, যাহার মুখ চাহিয়া তুমি এই সংসারবক্ষে বিচরণ করিতেছিলে, আজ তুমি সেই বহুমূল্য জিনিসটী জন্মের মত হারাইবে।"

এই সব দারুণ চিন্তায় সে শিহরিয়া উঠিল। মনে বড় ভয় পাইল। তাহার চোখে জল আসিল—প্রাণের মধ্যে তুমুল ঝড় উঠিল। মহা বিপদে পড়িলেই সংসারের ভ্রান্ত মোহময় জীব, একটু বেশী ঐকান্তিতার সহিত একটু বেশী ভক্তির সহিত, সেই ব্যথাহারী ভগবানকে ডাকিয়া থাকে।

সুতরাং রাণী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ভগবানকে মনে মনে ডাকিয়া বলিল—"হে ব্যথাহারী ভগবান! আমার প্রাণের ব্যথা দূর করিয়া দাও।

হে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা নারায়ণ! আমার দুঃখিনী মাকে আমারই হিতের জন্য, এ যাত্রা বাঁচাইয়া দাও। আমার এই দুঃখ, অপমান লাঞ্ছনা নিরাশাকাতর হৃদয়ে, শান্তি আনিয়া দাও। আর যে সহিতে পারিতেছি না প্রভু! হৃদয়ে বল দাও—দয়াময়! প্রাণের ব্যথা শান্ত করিয়া দাও ব্যথাহারী!"

রাণী যখন মর্ম্মজ্বালার প্রচণ্ডতরঙ্গে পড়িয়া এইভাবে হাবুডুবু খাইতেছিল, সেই সময়ে সনাতন আসিয়া দেখা দিল। সে দেখিল—রাণী মায়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া চোখের জল মুছিতেছে।

সনাতনের বুক দমিয়া গেল। তবুও সে রাণীকে বলিল—"ছিঃ! মা! এ সময়ে কি এত ব্যাকুল হইলে চলিবে? তুমি না বুদ্ধিমতী? আমি হেমেন বাবুকে খপর দিয়া এসেছি। তিনি কবিরাজ মহাশয়কে সঙ্গে করে এলেন বলে।"

হেমেন বাবুর নিজ বাড়ীতে তাঁহার জননীর পীড়ার জন্য তিনি বর্দ্ধমানের সেই বিখ্যাত কবিরাজকে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সনাতনের মুখে সংবাদ পাইবামাত্রই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি রাণীর বাড়ীতে পৌঁছিয়া ডাকিলেন—"সনাতন!"

সনাতন তখনই ছুটিয়া বাহিরে আসিল। হেমেন্দ্রবাবু ব্যগ্র ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"খপর কি?"

সনাতন বিমর্ষমুখে বলিল—"সেই একই ভাব।"

বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়, রোগিনীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার নাড়ী টিপিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া, মুখ বক্র করিলেন। হেমেন বাবুর দিকে একটী অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় তিনি বুঝিলেন, অবস্থা বড় সুবিধার নয়।

যাহা হউক, রাণী যাহাতে ঘাবড়াইয়া না যায়, ভয় না পায়, এইজন্য

তিনি মকরধ্বজ ব্যবস্থা করিয়াও তাহার এক পান তখনই স্বহস্তে খাওয়াইয়া বাহিরে আসিলেন।

রাণীর মন কিন্তু প্রবোধ মানিতেছিল না। সে কাতরভাবে উঠিয়া দাড়াইয়া হেমেনবাবুর দক্ষিণ হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"কি হবে দাদাবাবু! মা কি আমাকে সত্য সত্যই ছেড়ে যাবেন? আমার যে আর কেউ নাই!"

রাণী কাঁদিতে লাগিল। হেমেন বাবু প্রবুদ্ধস্বরে বলিলেন—"বোন্‌টী আমার—কাঁদিও না। রোগটা অবশ্য খুবই শক্ত বটে, কিন্তু তা বলে তোমার নিরাশ হবার কারণ নেই। আমি যতদিন আছি, ততদিন তোমার কোন ভাবনাই নেই।"

কবিরাজ মহাশয় ও সনাতনকে সঙ্গে করিয়া, হেমেন্দ্রবাবু বাহিরে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের আড়ালে দাঁড়াইয়া কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি বুঝিতেছেন কবিরাজ মহাশয়?"

কবিরাজ মহাশয় মলিনমুখে বলিলেন—"সে দিন রোগীর অবস্থা দেখিয়া যে আশাটুকু হইয়াছিল, আজ তাহা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঘোর সান্নিপাতিক, তার উপর ক্ষয়, শিবের অসাধ্য রোগ। সন্ধ্যার সময় না হয় রাত্রি প্রথম প্রহরে সব শেষ হইয়া যাইবে।"

এই কবিরাজ মহাশয়ের নাড়ীজ্ঞান অতি অদ্ভুত। সুতরাং হেমেনবাবুর মুখখানা চিন্তাপূর্ণ অবস্থা ধারণ করিল।

হেমেনবাবু কবিরাজ ও সনাতনকে লইয়া তাঁহার বাগান-বাটীতে চলিয়া আসিলেন। রমাপ্রসন্ন চক্রবর্তীর ভিটার অতি নিকটেই এই বাগান।

হলের বারান্দায় একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া হেমেনবাবু ভৃত্যকে তামাকু আনিতে আদেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন—"তাহলে আর রক্ষা নাই—কি বলেন কবিরাজ মহাশয়!"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যতদূর, তাহাতে তাই বুঝিতেছি। তবে দৈবের অসাধ্য কাজ নাই। তাহা হইলে আপনারা সর্ব্ববিষয়ে প্রস্তুত হইয়া থাকুন।”

কথাটা শুনিয়া সনাতনের চক্ষে জল আসিল। সে মনে মনে বলিল—“এই ত মানুষ! আজ আছে কাল নাই! এই দিদিমা যে, আমাকে ক যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। আমার কঠিন রোগের সময় তিনি যে এ সময়ে আমার বিছানার পাশে বসিয়া সারারাত জাগিয়াছিলেন। যাঁহার স্নেহে হৃদয়ের মহত্ত্বে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের কোন পার্থক্যই ছিল না—আজ এই নশ্ব জগতের সহিত তাঁহার সমস্ত সম্পর্ক যে শেষ হইবে।”

সনাতন কাতরভাবে, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, হেমেন বাবুর মুখের দিকে চাহি বলিল—“তাহ’লে আমার রাণী-মার দশা কি হবে রাঙ্গাবাবু?”

হেমেনবাবু সনাতনকে প্রবোধিত করিবার জন্য বলিলেন—“সনাতন ভগবান তোমাকে অনেক গুণ দিয়াছেন। তুমি এত চঞ্চল হইলে চলিবে কেন? যদি অনিশ্চিত ঘটনা পূর্ণ এই মোহময় সংসারে কিছু বেশী নিশ্চিত, খুব জাগ্রত সত্য বলে কোন কিছু থাকে; তা হলে সেটা মৃত্যু।”

সনাতন বলিল—“তা সত্য বটে রাঙ্গাবাবু। আপনারা জ্ঞানী বিদ্বান অনেক বই পড়েছেন আর দেখেছেন শুনেছেন। আমরা অশিক্ষিত চাষা কৈবর্ত্ত। কিন্তু এটা বুঝি, যে এই মৃত্যুর অত্যাচারে অনেক আলোভরা উজ্জ্বল সংসার যে জন্মের মত আঁধার হয়ে যায় দাদাবাবু! স্নেহ মায়া, দয়া, মহত্ব, সবই যে জন্মের মত চলে যায় দাদাবাবু!

হেমেন বাবু একটু দৃঢ়স্বরে বলিলেন—“তা সত্য বটে। কিন্তু ভগবানের সনাতন নিয়ম তো লঙ্ঘন হবার কোন উপায় নেই।”

সনাতন। তাহ’লে এখন করা যায় কি? ওঁদের অবস্থা ত জানেন!

হেমেন্দ্র বাবু বলিলেন—“তার জন্য কোন কিছুই আটকাবে না সনাতন

রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর পত্নীর শেষ কার্য্য, হেমেন্দ্র বাবুর মায়ের মতনই করা হইবে। লোকজন সব ঠিক করিয়া রাখিব। তুমি সময় মত নীলুখুড়োকে খপর দিলেই, তিনি সব কাজ চালিয়ে নেবেন। তাঁকে এ সম্বন্ধে আমি বলে ক'য়ে রেখেছি। আর এই পঞ্চাশটি টাকা তুমি কাছে রেখে দাও। বর্দ্ধমানের কবিরাজ মহাশয়কেও আমি আজ আর যেতে দোব না। দুপুর বেলা আমি তাঁকে তোমাদের বাড়ীতে আবার পাঠিয়ে দোব।”

সনাতন হেমেন্দ্র বাবুর পদধূলি লইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে মনে মনে বলিল—“আমি ব্যাটা হলুম, অধম চাষী-কৈবর্ত্ত্য! আমার মত অধমের প্রার্থনা ভগবান শুন্‌বেন কি? যদি শোনেন, তা'হলে তাঁর চরণে আমার এই প্রার্থনা, যেন তিনি এই মানুষের মধ্যে দেবতা, এই হেমেনবাবুকে দীর্ঘজীবি করেন। ধনে পুত্রে যেন তাঁর বাড় বাড়ন্ত হয়। মহা দুঃখের দিনে, অনাথা দুঃখীর মুখের দিকে যে মুখ তুলে চায়, সেই ত দেবতা। তার পুণ্যের পরিমাণ নেই, কীর্ত্তিরও নাশ নেই।”

হেমেন বাবু প্রদত্ত টাকা কয়টি সাবধানে কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া, এই ভাবে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, সনাতন হেমরাণীর বাটীতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

(১১)

সুখ দুঃখ লইয়াই এই সংসার। মানুষের জীবনের কথা বলিতে হইলে এই সুখ দুঃখের কথা ভিন্ন আর অন্য কিছুই বলা চলে না। কেননা এ জগতে এ দুটী ছাড়া জীবনের আর কোন বৈচিত্র্যতা নাই। আমরা হেম-রাণীর দুঃখময় জীবনের কথা বলিতে বসিয়াছি, সুতরাং যখন যার পর যেটী যেমন ঘটিয়াছিল তাহাই বলিয়া যাইব।

কবিরাজ মহাশয় ও হেমেন্দ্রবাবু, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় করিয়া

রাণীর মাকে আবার দেখিতে আসিলেন। কবিরাজ মহাশয় রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, তাঁহার মৃত্যু শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে। শমন তাঁহার মাথার শিয়রে আসন বিছাইয়া বসিয়াছে।

তিনি কাহাকে কোন কথা না বলিয়া, মিছামিছি একটা ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া রাণীকে ভুলাইয়া রাখিয়া, হেমেন্দ্র বাবুর সহিত বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

সমস্ত দিন অক্লান্ত দেহে, সাহসে বুক বাঁধিয়া, রাণী তার মার শুশ্রূষা করিল। সেই যে অচৈতন্য ভাব তাহার কোন বিরাম বা পরিবর্ত্তন নাই। এইভাবে দিনটা কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর বৃদ্ধার চেতনা হইল। তিনি অতি ক্ষীণ স্বরে ডাকিলেন "রাণি! কোথায় মা তুই?"

রাণী মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"এই যে মা আমি!"

বিন্দুবাসিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমার সময় হইয়া আসিয়াছে। আমি তোমার পিতার কাছে চলিলাম। ঐ দেখ, তিনি আমায় ডাকিতেছেন।"

রাণী বলিল—"অমন সর্ব্বনেশে কথা বলিও না মা! আমি কার কাছে থাক্‌বো মা!"

বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"যে ভগবান এতদিন আমাকে দেখিয়াছেন, তিনিই তোমাকে দেখিবেন। ভগবানে—চিরদিন বিশ্বাস রাখিও। কিসের ভয় তোমার মা?" বৃদ্ধা আর বলিতে পারিলেন না। মুখব্যাদন করিয়া জল চাহিলেন।

রাণী একটী পিতলের ঝিনুকে করিয়া একটু খানি জল তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিল। বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আঃ—কি তৃপ্তি!"

তারপর তিনি কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ভগবানের উ

বিশ্বাস রাখিও। স্বামীর পদে একান্ত মতি রাখিও। স্বামীই স্ত্রীলোকের নারায়ণ। প্রত্যক্ষ ইষ্টদেবতা। তিনি যতই নিষ্ঠুর হোন না কেন, যতই পাপিষ্ঠ হন না কেন, তবুও তিনি স্বামী। নারীর উপাস্য! আমার রাসমোহন চিরজীবি হোক। আজ সে ভ্রমের বশে যা করিতেছে, তার মতি পরিবর্ত্তন হইলে কাল সে তোমাকে আবার খুঁজিয়া লইয়া যাইবে।

বৃদ্ধা চুপ করিলেন। তখন মৃদু মৃদু ঘাম হইতেছে। তিনি খুবই দুর্ব্বল।

বিন্দুবাসিনী আবার ডাকিলেন—"রাণি!"

রাণী। কেন মা?

বিন্দু। সনাতন কোথায়?

সনাতন দালানের দোরের কাছে বসিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া রোগীর কাছে বসিয়া তাঁর পদধূলি লইয়া বলিল—"এই যে দিদিমা আমি এখানে।"

বৃদ্ধা শোকোচ্ছ্বাস পূর্ণস্বরে বলিলেন—"দাদা আমি চলিলাম। তোমার মাকে দেখিও।"

এই সময়ে বৃদ্ধার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি তখন সম্মুখস্থ জানালার দিকে নিবদ্ধ।

জানালাটী ঘরের পিছনের দিকে। বিন্দুবাসিনী কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া সেই জানালার দিকে সচকিত নয়নে চাহিয়া, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঐ—ঐ—তিনি আমায় নিতে এসেছেন।"

রাণী ও সনাতন সভয়ে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিল। রাণী বলিল—"কৈ—কেউ তো ওখানে নাই মা।"

বিন্দুবাসিনী একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"না-না, তুই দেখতে পাস্‌নি। আমি স্পষ্ট দেখেছি—তোর পিতা এসে ঐ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছিলেন।"

সেই ঘরের দালানে হেমেনবাবুর নিকট আত্মীয় পূর্ব্বোক্ত গ্রাম্য মুরুব্বি নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় ওরফে নীলুখুড়ো উহাদের সমস্ত কথা বার্ত্তা শুনিতে ছিলেন। তিনি সবই বুঝিলেন। নিভিবার আগে প্রদীপটা একবার দপ করিয়া খুব জ্বলিয়া উঠে। তাই শেষ প্রলাপের মুখে, বৃদ্ধার ঐ উত্তেজনা-টুকু দেখা দিয়াছে।

বিন্দুবাসিনী আবার সেই জানালার দিকে চাহিয়া অস্ফুট চীৎকারের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"এসেছো! আমায় নিতে এসেছো। চল—আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।" এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার চোখও মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দেহ নিস্পন্দ—তুষার শীতল। নাড়ী—নিশ্চল।

নীলুখুড়ো হেমরাণীর চীৎকার শুনিয়া ঘরের ভিতর গিয়া নাড়ীর নিশ্চল অবস্থা ও মুখের বিকৃত ভাব দেখিয়া বলিলেন—"আর কেন সব শেষ হইয়াছে। উহাঁকে ঘরের বাহিরে লইয়া যাওয়া যাক।"

রাণী চীৎকার করিয়া "মাগো" বলিয়া মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। হায়! তাহার যে আজ মহা সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গেল। তিন চারিজন ব্রাহ্মণ সন্তান, ইহারা সকলেই হেমেন্দ্র বাবুর প্রেরিত, নীলুখুড়োর আহ্বানে বাড়ীর ভিতরে গেলেন। মৃতের সৎকারের জন্য যথা বিহিত ব্যবস্থা ও যোগাড় যন্ত্র হইতে লাগিল।

(১২)

যে সময়ে রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জীর্ণ গৃহে এইভাবে শোকের ক্রন্দন জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে শিবরামপুরে সুরেন্দ্রকুমারের বাগান বাটীতে আর এক ভয়ানক পৈশাচিক ব্যাপারের মন্ত্রণা চলিতেছিল।

তারামণি তাহার মাসীর বাড়ী হইতেই ক্রন্দনের রোল শুনিতে পাইয়া

ঝিল, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। সে তখনিই এই সংবাদ লইয়া শিবরাম-পুরের বাগানের দিকে ছুটিল।

সদর রাস্তা ধরিয়া গেলে একটু ঘুর হয়, কিন্তু মাঠের মধ্য দিয়া গেলে, পথটা অনেক কম হইয়া পড়ে। এজন্য সেই অন্ধকারময় রাত্রে মাঠের পথ ধরিয়াই সে অতি দ্রুত চলিতে লাগিল।

বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি ব্যস্তভাবে সে একেবারে সুরেন্দ্রকুমারের কক্ষে উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রকুমারের কাছে তখন ছিল কেবল রুদ্ররাম। তাহাদের মধ্যে কোন মামলার ব্যাপার লইয়া সলা পরামর্শ চলিতেছে।

তারামণি হাঁফাইতে হাঁফাইতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—হুজুর! সব শেষ হইয়াছে।"

সুরেন্দ্রকুমার চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বলিস্ কি?"

তারামণি। হুজুরের কাছে আমি কখনই মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করি না। আমার কথাগুলি মন দিয়া শুনিবেন কি?

সুরেন্দ্র। কি বলিতে চাস্ তুই?

তারামণি। যদি কাজ হাঁসিল করিতে চান্ ত আজ রাত্রে এই সুযোগে! আজ যে সুবিধা আছে, কাল সকালে তা আর থাকবে না।

সুরেন্দ্র সৎপথভ্রষ্ট হইলেও পিশাচ নহে। সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"না অত হীন কাজ আমি করিতে পারিব না। যে মানুষ বলিয়া পরিচয় দেয় সে এতটা নিষ্ঠুর হইতে পারে না।

তারামণি একটু কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল—"তাহা হইলে আর বৃথা ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি চলিলাম।"

সুরেন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"তারামণি! সত্যই তুই পিশাচি।"

তারামণি হঠিল না। সে বলিল—"সত্যই আমি তাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি অগ্রগামী নই, হুজুরই আমাকে এ কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।"

সুরেন্দ্রকুমার ব্রাণ্ডির ফ্লাস্ক খুলিয়া, খানিকটা "র" ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বল আসিল, মগজে শান্তি আসিল, বিবেকের শক্তি কমিল।

তারামণি বলিল—"সময় বহিয়া যাইতেছে। দেবানন্দপুর হইতে শ্মশান অতি দূরে। তাদের সেখানে পৌছিতে এখনও দুই চারি ঘণ্টা বিলম্ব। যদি বিনা গোলযোগে অতি সহজে কাজ হাঁসিল করিতে চান, তাহা হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম—পাপ পুণ্য ভুলিয়া যান। ইহকালের সুখ যদি চান, তাহা হইলে পরকালকে চাপা দিয়া রাখুন। আজই যাহাতে কাজ হাঁসিল হয় তার বন্দোবস্ত করুন। তার যখন আপনার বলিতে কেউ নাই আর স্বামীও তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, তখন নিরাশ্রয় দেখিয়া হেমেনবাবু কাল সকালেই তাহাকে লইয়া যাইবে।"

সুরেন্দ্রকুমার আবার ব্রাণ্ডি পান করিল। কিয়ৎক্ষণ স্থিরচিত্তে কি ভাবিয়া সে বলিল—"না—তা হইতে দিব না। আমি বর্ত্তমান থাকিতে হেমেন্দ্র তাহাকে পাইবে না। হেমেন্দ্র যে আমার চেয়ে ক্ষমতায় শক্তিতে ও বুদ্ধিতে বড়, সে বিষয়ে দর্প করিবার অবসর তাহাকে আমি দিব না।"

তারামণি। তাহা হইলে এখনি কাজের বন্দোবস্ত করুন।

সুরেন্দ্র। কি করিতে বলিস্ তুই!

তারামণি। দশজন লাঠিয়াল আর এই রুদ্ররাম বাবু হইলেই কাজ চলিবে। আমরা শ্মশান ঘাট হইতেই তাহাকে লুঠ করিব। তারপর আজই রাত্রে তাহাকে আপনার অন্য কোন বাগান বাড়ীতে পৌছাইয়া দিব।

সুরেন্দ্রকুমার চিন্তিতভাবে বলিলেন—"না-না—বড় হৃদয়হীনের কাজ! বড় নিষ্ঠুরের কাজ! হেমেন্দ্রের লোকজন সেখানে! হয় ত কোন ফ্যাসাদ বাধিতে পারে।"

তারামণি বলিল—"হেমেন্দ্রবাবু জমীদার, আর আপনি কি নন? আপনারও কি লাঠিয়াল নাই? না পয়সার কম্‌তি আছে।"

সুরেন্দ্রকুমার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রোষভরে বলিল—“তারামণি! পিশাচি! তুই এখান হইতে দূর হইয়া যা। আমি একটা মহা ভ্রমে পড়িয়া পাপের সংকল্প করিয়াছি। কিন্তু তুই আমায় নরকের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছিস্। সত্য বটে আমি মদ্যপায়ী, স্বৈরিণীপ্রিয়—কিন্তু কখনও কুলকামিনীর সর্ব্বনাশ করি নাই।”

তারামণি বিদ্রূপের সহিত বলিল—“ভারি ত কুল-কামিনী গো! তা হলে তার স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে! তা হুজুরের মরজি যা, তাই হবে। আমি তাহ’লে চল্লুম।”

তারামণি কক্ষ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। সুরেন্দ্রকুমার আবার মদ্যপান করিলেন। আবার পাপভীতি-জনিত অবসাদ ঘুচিয়া একটা উত্তেজনা আসিল।

সুরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—“দাঁড়াও—তারামণি! যাইও না।”

তারামণি আবার সুরেন্দ্রকুমারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। যে মাছ ধরে, সে যেমন মাছকে বঁড়শীতে গাঁথিয়া সেই মাছ লইয়া খেলা করিয়া একটা আনন্দ উপভোগ করে, তারামণি সুরেন্দ্রকুমারকে লইয়া সেইরূপ যেন একটা আনন্দই উপভোগ করিতেছিল।

সুরেন্দ্রকুমার কক্ষ ত্যাগ করিয়া বারান্দার দিকে চলিয়া গেল। তাহার হৃদয়-কন্দরে আবার হেমরাণীর পূর্ব্ব পরিদৃষ্ট সেই অপ্সরকান্তি শক্তি বিকাশ করিল। সে আবার রূপ মোহের নিকট আত্মবিক্রয় করিল।

চঞ্চল ভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সুরেন্দ্রকুমার কঠোর স্বরে ডাকিল—“রুদ্ররাম?”

রুদ্ররামও সেখানে দাঁড়াইয়া মনে মনে অনেক কথাই ভাবিতেছিল। সে একবার মনে ভাবিল—“আমার এই স্বর্ণগর্দ্দভ মনিব, আমার আড়ালে আমাকে “পাক্কা শয়তান” বলিয়া গালাগালি দেন। অথচ আমার বুদ্ধির

জোরেই ওঁর এই এত মামলা মোকদ্দমা ও জমীদারী চলিতেছে। অথচ উনি আমায় গালি দেন—"মূর্খ নির্ব্বোধ।" এ পর্য্যন্ত অনেক শয়তান মনিবের চাকরী করিলাম, কিন্তু এমনটী আর দেখি নাই। যার চেয়ে মানুষের আর বিপদ হইতে পারে না, সেই মহাবিপদে এক নিরীহা কুল ললনার সর্ব্বনাশের চেষ্টা? ছি! ছি! এমন লালসার—এমন প্রবৃত্তির মুখে আগুণ! এরাই আবার শিক্ষাভিমানী বড় লোক?"

আবার পরক্ষণেই সে ভাবিল টাকার জন্য, পেটের দায়ে, এই শয়তানাধম মনিবের চাকরি করিতে আসিয়াছি। মোকদ্দমা মামলার বাজার, আজকাল বড়ই ঢিলা পড়িয়াছে। দুই একটা বড় গোছের ফৌজদারি না বাধিলে, আমাদের মত দশটাকার নায়েবের পেট্ চলা ভার। হেমেন্দ্রবাবু যখন উহাদের সহায়, তখন এই ব্যাপার লইয়া নিশ্চয়ই একটা মহা হুলস্থূল বাধিয়া যাইবে। তখন দুই হাতে পয়সা লুঠিব। সাবাস বুদ্ধি তারামণির যে সে মতলব খাটাইয়া এতবড় একটা সাংঘাতিক ফন্দি বাহির করিয়াছে। এ সব কাজে পাপ—চাকরের না মনিবের? যে পাপ কাজ করিতে মতলব দেয়, হুকুম দেয়, তার—না আজ্ঞা যে পালন করে!

তারপর সে ভাবিল, এই ব্যাপারে এই কাজে এক ঢিলে দুই পাখী মরিবে। রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী সামান্য ত্রৈটির জন্য একদিন আমায় জুতা ছুড়িয়া মারিয়াছিল, সে কথা আমার মনে আছে। তার কুপরামর্শে আমার বড়-তরফের গোমস্তাগিরি চাকরিটী যায় তাহাও আমি ভুলি নাই। যখন প্রতিশোধের সুযোগ পাইতেছি, তখন ছাড়ি কেন? আর একজন যখন রমাপ্রসন্নের পরিবারবর্গকে বেড়া আগুণে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন সে আগুণে আমি ফুৎকার দিতে বিরত হই কেন?

রুদ্ররাম যখন এই সব অদ্ভুত চিন্তায় আত্মহারা, সেই সময়ে সুরেন্দ্রকুমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া পরুষ কণ্ঠে ডাকিলেন—"রুদ্ররাম?"

রুদ্ররাম, নিদ্রোত্থিতের মত চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"হুকুম করুন হুজুর !"

সুরেন্দ্র। তারামণির কথা শুনিলে ?

রুদ্ররাম। শুনিয়াছি।

সুরেন্দ্র। কয়জন লাঠিয়াল তোমার কাছারিতে আছে ?

রুদ্ররাম। আটজন।

সুরেন্দ্র। তাহাদের লইয়া কাজ শেষ করিতে পারিবে ?

রুদ্ররাম। হুজুরের আশীর্ব্বাদ থাকিলে এই রুদ্ররাম না পারে কি ?

সুরেন্দ্র। খুব হুঁসিয়ারিতে কাজ যদি হাঁসিল করিতে পার, তাহা হইলে তোমায় প্রচুর পুরস্কার দিব। আর বুদ্ধির দোষে যদি কাজ নষ্ট করিয়া ফেল, জানিও—আমি সাফ্ সরিয়া দাঁড়াইব। হেমেন্দ্র কিরূপ ভয়ানক লোক তা জান তো ? এ সব গুম্ করা ফৌজদারির সমস্ত ঝুঁকিই তোমার।

রুদ্ররাম। আপনার হুকুমে সে ঝুঁকি নিতে রুদ্ররাম সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

সুরেন্দ্রকুমার তাঁহার ড্রয়ারের মধ্যস্থিত একটী নোটকেস্ হইতে কুড়ি খানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া, রুদ্ররামের হাতে দিয়া বলিল—"আমি আজ রাত্রেই এই স্থান ত্যাগ করিব। এই দুশো টাকা তোমার কাছে রাখ। কাজ উদ্ধার হইলে, তারামণিকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিও। তারপর, অতি সাবধানে নৌকা করিয়া এই স্ত্রীলোককে আমার আমেদপুরের কাছারির বাগানে পৌঁছিয়া দিবে। নৌকায় থাকিবে এই তারামণি আর তুমি। আমি সেখানে না পৌছান পর্য্যন্ত, তুমি অপেক্ষা করিবে। এই ঔষধটা ও রুমালখানা তোমার কাছে রাখিয়া দাও। এক ফোঁটা ঔষধ রুমালে ঢালিয়া একবার শুখাইলে, বাগানে পৌছিবার পূর্ব্বে ওর চৈতন্য হইবে না। খুব সাবধান ! খুব হুঁসিয়ার !"

রুদ্ররাম নোটগুলি ও ঔষধের শিশিটী আর রুমালখানি পকেটের মধ্যে রাখিয়া তারামণিকে বলিল—"চল এখন আমরা কাজের বন্দোবস্ত করিগে।"

শয়তানী তারামণি, এই শয়তান শ্রেষ্ঠ রুদ্ররামের সঙ্গে কাছারী বাড়ীতে চলিয়া গেল। আর সেই রাত্রে সুচতুর সুরেন্দ্রনাথ একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া, বাগান বাটী ত্যাগ করিলেন। নবীন খানসামাকে বলিয়া গেলেন—"একটু সাবধানে থাকিস নবীন! সবই ত তুই শুনিয়াছিস! আমি যে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছি, এই কথাটাই যেন প্রচার হয়। আসল কথা—এখন আমি আমেদপুরের কাছারিতেই যাইতেছি।"

শিবরামপুর হইতে আমেদপুরের কাছারি গাড়ীতে আড়াই ক্রোশ পথ। সুরেন্দ্রকুমার, এই শয়তানী কাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া, সেই রাত্রে আমেদ-পুরের কাছারির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

ভগবানের বৈচিত্র্যময় সংসারে এই মানুষই—দেবতা। আবার এই মানুষই—শয়তান। কার্য্যগুণেই মানুষমাত্রেই দেবতা ও শয়তান হয়। প্রমাণ—এক পক্ষে আদর্শ জমীদার হেমেন্দ্রকুমার। অন্য পক্ষে এই নরাধম জমীদারকুল কলঙ্ক সুরেন্দ্র।

(১৩)

এ জগতে এক সনাতন ছাড়া যাহাদের এ বিপদের দিনে কেহই ছিল না, সে দিন মহাপ্রাণ জমীদার হেমেন্দ্রবাবুর বন্দোবস্তের ফলে, অনেক লোকই শ্মশানঘাটে, রমাপ্রসন্নের পত্নীর মৃত দেহ লইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর হইতে আকাশটা একটু মেঘাচ্ছন্ন। জোর হাওয়া মাঝে মাঝে উঠিতেছে ও থামিয়া যাইতেছে। দেবানন্দপুর ও রামানন্দপুরের মধ্য স্থানেই এই শ্মশান। শ্মশানের পাশ দিয়া এক ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইতেছে।

সাত আট জন লোক এই দলে। দেবানন্দপুর হইতে শ্মশানঘাট প্রায় ক্রোশখানেক। এই আট জন ছাড়া, সনাতন ও হেমেন্দ্রবাবুর একজন ভৃত্য সেই দলে ছিল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের কাছাকাছি। বাতাসের জোর পাইয়া হু হু শব্দে চিতা জ্বলিয়া উঠিল। প্রকৃতির বুকে—সেই শ্মশানক্ষেত্রের আশে পাশে যে অন্ধকারটা খুব জমাট ভাব ধারণ করিয়াছিল—সেটা শ্মশানবক্ষে চিতার উজ্জ্বল আলোকে যেন একটু বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

হেমরাণীর মন তখন নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মত স্থির। সে এক দৃষ্টে সেই জ্বলন্ত চিতার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার চক্ষু অশ্রু শূন্য—দৃষ্টি উদাস।

এ জগতে যাহা তাহার খুব আপনার ছিল—তাহা যে তখন সেই জ্বলন্ত চিতার মধ্যে। মেদ মাংস অস্থিময় দেহ, তিলে তিলে পলে পলে ভস্মীভূত হইয়া জ্বালাময় ধূমরাশির সহিত শূন্যে মিশাইতেছে। যে দেহ-মধ্যস্থ প্রাণকোষে, তাহার জন্য দয়া মায়া স্নেহ করুণা থরে থরে সাজানো ছিল, সে দেহ, সে বিচিত্র মায়া গঠিত আধার, ক্রমশঃ ভস্মে পরিণত হইতেছে।

সকলের এ সকল স্থানে যাহা হয়, রাণীর তাহাই হইয়াছিল। ভীষণ শ্মশান-বৈরাগ্য, তাহার হৃদয়কে খুবই পাষাণবৎ করিয়া দিল। তারপর সে যখন দেখিল, বৈশ্বানর তাহার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া ভস্মসাৎ করিয়াছে, তখন তাহার সেই মোহময় শ্মশান-বৈরাগ্য ক্ষণকালের জন্য অপসৃত হইল। সে মর্ম্মভেদী যাতনায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "মা—গো!" সে কাতর যাতনার শব্দে, আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত যেন আকুল হইয়া উঠিল। কোথা হইতে এক অজানা ধ্বনি তাহার কাণে প্রতিধ্বনি তুলিল—"কাঁদ—কাঁদ হেমরাণি! যত পার কাঁদ। চিরদিন যে কান্না কাঁদিয়া তোমার সারা জীবনটা কাটিবে, এই মহাশ্মশানে তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর।"

বয়োবৃদ্ধ নীলুখুড়ো যখন দেখিলেন—সব শেষ হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি হেমরাণীকে বলিলেন,—"মা হেমরাণি! সবারই এই পরিণাম। যতক্ষণ প্রাণটা দেহে থাকে ততক্ষণ মানুষ—মানুষ। প্রাণটা চলিয়া গেলে এই মানুষ—ছাই-মাটি বই আর কিছু নয়। এ দারুণ শোকের সময়ে তোমার কত গুলি কর্ত্তব্য আছে। আকাশ বড়ই ঘনঘটা করিয়া আসিতেছে। বিদ্যুৎ নল্‌পাইতেছে, এখনি বৃষ্টি আসিবে। রাত্রি প্রভাত না হইলে ত আমরা বাড়ী ফিরিতে পারিব না। আমরা ঐ চালা ঘরে আছি। তুমি নদীতে স্নান করিয়া জল লইয়া আইস।"

হেমরাণী বৃদ্ধের কথার কোন উত্তর করিল না দেখিয়া, সনাতন বলিল—"আর বৃথা ভাবিয়া কি করিবে মা?"

রাণী এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"সনাতন! আমার যে সব গেল! এ জগতে আমার স্থান কোথায়?"

সনাতন প্রবুদ্ধস্বরে বলিল,—"ভগবানের রাজ্যে এত কীট পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গমের আশ্রয় স্থান আছে আর তোমার নাই? হইতেই পারে না? তোমার এ হতভাগা সন্তান এখনও বাঁচিয়া আছে। তোমার বাপের ভিটা বজায় আছে। আমি গতরে খাটিয়া মজুরী করিয়া টাকা আনিয়া তোমার দিন গুজরাণ করাইব।"

এ দিকে আকাশ আরও ঘনঘটা করিয়া উঠিল। আবার বিদ্যুৎ চমকাইল। জোর হাওয়া বহিল—একটু একটু করিয়া দুই চারি ফোঁটা বারিবিন্দু আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া, হেমরাণীর সন্তাপিত দেহ স্পর্শ করিল।

এখনি বৃষ্টি নামিয়া আসিবে দেখিয়া, নীলুখুড়ো চীৎকার করিয়া বলিলেন "সনাতন! ওঁকে ঐ মাটীর কলসীটা নিয়ে জল আন্‌তে বল! দেখ্‌ছো না বৃষ্টি এলো বলে!"

সনাতন হেমরাণীকে বলিল—"আর দেরি করোনা মা। চ'ল মা, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। অনেকবার জল আন্‌তে হবে। নদীর ঘাটটা ভাল নয়—বড় ভাঙ্গা চোরা।"

তখন উভয়ে সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া অগ্রসর হইল। শ্মশান-ক্ষেত্র হইতে দুই তিন রশি দূরে, এক ভাঙ্গা ঘাট। এই ঘাটের উপরে এক প্রকাণ্ড বটগাছ।

সনাতন বলিল—"এই আলোটা এখানে রহিল, আমিও বসিয়া আছি। তুমি জল লইয়া আইস। খুব সাবধানে—যেন পড়িয়া যাইও না।"

সনাতন সেই গাছতলায় বসিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। রাণী যখন ঘাটে পৌছিয়া অতি সাবধানে সিঁড়িগুলি নামিতে লাগিল, তখন আর তাহাকে দেখা গেল না।

সহসা কে একজন আসিয়া, সনাতনের পিছন হইতে, তাহার মাথায় লাঠির প্রচণ্ড আঘাত করিল। সে লক্ষ্য—খুব পাকা হাতের। অতি অব্যর্থ। সনাতন অস্ফুট চীৎকার করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। বাতাসের সন্‌সনানি আর ঘাটের একটু দূরে ছিল বলিয়া, রাণী সনাতনের এ অস্ফুট চীৎকার শুনিতে পাইল না।

আর এই সময়ে রাণী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে আর এক ব্যাপার ঘটিল। সহসা দুইজন লোক রাণীর পশ্চাৎ হইতে আসিয়া একখানি রুমাল দিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। এই রুমালখানি ঔষধ-সিক্ত, সে চীৎকারের অবসরও পাইল না!

নদীর অদূরে একটা বটগাছের অসংখ্য ডাল, জলের উপর নুইয়া পড়িয়া সে স্থানটাকে বড়ই অন্ধকারময় করিয়া রাখিয়াছিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে একখানা নৌকা লুকানো ছিল।

একজন লোক রাণীর সেই মূর্চ্ছিত দেহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, একটা শীশ

দিল। তখনই নৌকাবাহীরা গাছের আড়াল হইতে নৌকাখানা বাহির করিয়া ঘাটের কাছে আনিয়া লাগাইল।

যে নৌকা আনিতে সংকেত করিয়াছিল—সে প্রভুত্বসূচক স্বরে বলিল—"খুব জোরে নৌকা বাহিয়া আমেদপুরের ঘাটে চলিয়া যাও। সাবধান! খুব ভোরে সেখানে পৌছান চাই।"

এই হুকুম দাতা আর কেউ নয়, শয়তান রুদ্ররাম। এত সহজে যে কাজ উদ্ধার হইবে, রুদ্ররাম কল্পনায় তাহা ভাবে নাই। অতি হীন মানুষে যাহা পারে না, শয়তানেও যাহা পারে না, রুদ্ররাম অর্থের লোভে, আর মনিবের প্রিয় পাত্র হইবার জন্য তাহাই করিল।

এদিকে আকাশও ক্রমশঃ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নীলুখুড়ো তাঁহার একজন সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ওহে বটকৃষ্ণ! একবার দেখ তো ব্যাপার কি? হেমরাণী ত অনেকক্ষণ জল আন্‌তে গেছে। এখনও ফিরছে না কেন? আর সে সনাতনই বা কি কচ্ছে?"

বটকৃষ্ণ—নীলুখুড়োর আদেশে সেই কুটীরের বাহিরে আসিয়া দেখিল, কে যেন একজন সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে।

বটকৃষ্ণ ভয় পাইল। সে মূর্ত্তি দীর্ঘাকার—নিশ্চল। সহসা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। বটকৃষ্ণ সেই বিদ্যুতের অলোকে দেখিল—দীর্ঘকেশ, দীর্ঘ বাহু, শ্মশ্রুগুম্ফপূর্ণ মুখ মণ্ডল, কে একজন সেই স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

বটকৃষ্ণ ভয় পাইয়া, "বাপ-রে" বলিয়া ছুট্ মারিয়া একাবারে সেই কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"পালাও পালাও! ভূত—ব্রহ্মদৈত্য।"

নীলুখুড়ো দেখিলেন, বটকৃষ্ণ ভয়ে থরহরি কাঁপিতেছে। তিনিও সেই সময়ে বিদ্যুতালোকে দেখিলেন, সত্যসত্যই এক দীর্ঘাকার মূর্ত্তি সেই

শ্মশান ক্ষেত্রের ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টে সেই নির্ব্বাপিত চিতার দিকে চাহিয়া আছে।

নীলুখুড়োর মনেও একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তাঁহার জীবনে বহুবার তিনি শবদাহ করিয়াছেন, কিন্তু এমন ভয়ানক ব্যাপার আর কখনও তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই।

সুতরাং তিনি তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন—"বৃষ্টি নামিয়াছে, বিদ্যুৎ চমকিতেছে। তারপর শ্মশান মধ্যে—ঐ ভীষণ মূর্ত্তি। আত্মরক্ষাই ধর্ম্ম। চল আমরা প্রাণ লইয়া পালাই।"

তখন সকলেই সেই কুটীর ত্যাগ করিয়া সভয় চিত্তে, কাঁপিতে কাঁপিতে, সেই শ্মশান ক্ষেত্রের বাহিরে চলিয়া আসিল। নির্জ্জন শশ্মান আরও নির্জ্জন হইয়া পড়িল। রহিল, কেবল নির্ব্বাপিত চিতার জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি, আর সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব দীর্ঘাকার পুরুষ।

(১৪)

সেই দীর্ঘাকার ব্যক্তি চিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও অগ্নি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয় নাই। সেই অগ্নিগর্ভ চিতাবক্ষ হইতে তখনও ধূমরাশি উঠিতেছে।

এই আগন্তুকের সন্ন্যাসীর বেশ। মুখমণ্ডল শ্মশ্রু-গুম্ফে পরিপূর্ণ। মস্তকে দীর্ঘ জটাভার।

সেই চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সেই সন্ন্যাসী বলিলেন,—"যাও যাও সাধ্বী! সেই শোক তাপ দুঃখ, অত্যাচার রহিত বৈকুণ্ঠে। বৈকুণ্ঠেশ্বর হরি, তোমার মত সতীকে নিশ্চয়ই চরণে আশ্রয় দিবেন। হায়! এ মরজীবনের কোন সাধই যে তোমার মেটে নাই। তবে সেখানে গিয়াছ, সেখানে তোমার শ্রেষ্ঠ বাসনাই পূর্ণ হইবে।"

সেই সন্ন্যাসীর আরক্ত নেত্র-নিঃসৃত অশ্রুধারার কয়েক বিন্দু উষ্ণগর্ভ সেই চিতার উপর পড়িল। কিন্তু তাহাতে সেই চিতা নিভিল কি? তাঁহার প্রাণে তখন যে আর একটা প্রবল চিতার আগুন জ্বলিতেছে, তাহাও নিভিল কি?

তিনবার সেই নির্ব্বাপিতপ্রায় চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া, একটা মর্ম্মভেদী নিশ্বাস ফেলিয়া, তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"কে বলে তোমার সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়াছে! লোকচক্ষে তুমি বিধবা। কিন্তু সতীর সীমন্তের সিন্দুর কখনও মলিন হয় না। ভগবানের দয়ায়, সিঁথার সিন্দুর লইয়াই তুমি মরিয়াছ! যাও—যাও সাধ্বী—সেই পুণ্যালোক-বিভাসিত, চিরসমুজ্জ্বল বৈকুণ্ঠে।"

সন্ন্যাসী একবার ঊর্দ্ধনেত্রে সেই মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময় আকাশের দিকে চাহিলেন। যোড় হস্তে ঊর্দ্ধমুখে বলিলেন—মধুসূদন! নারায়ণ! আমায় এ অভিশপ্ত জীবনের কোন সাধই যে মিটিল না প্রভু! এ দীর্ঘকাল পরে যাহাকে একবার গোপনে দেখা দিতে আসিয়াছিলাম সে যে এত শীঘ্র আমায় ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে, এটা ত স্বপ্নেও ভাবি নাই। পাষাণও কালধর্ম্মে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমার মত অভাগার ত বিনাশ নাই। সংসারের আশা আনন্দ উৎসাহ উল্লাস সবই গিয়াছে। তস্কর দস্যু নরহন্তার মত, এক অতি ঘৃণিত অবস্থায় লোকলোচনের অন্তরাল হইতে আত্ম-গোপন করিয়া বেড়াইতেছি। অন্তরে নরকের যাতনা ভোগ করিতেছি। তবুও ত মায়ার বন্ধন কাটিতে পারিতেছি না। হে সচ্চিদানন্দ! হে চির আনন্দময়! আমায় আনন্দ দাও, আমার অহং নাশ কর। আমায় আত্মবোধ দাও। ব্যথিত জ্বালা পীড়িত আত্মাকে, এরই মত তোমার চরণে আশ্রয় দাও।

অস্ফুটস্বরে কি একটা মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে, সন্ন্যাসী তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। তারপর বলিলেন—"ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

এই সন্ন্যাসীর মনে সহসা একটা বাসনা জাগিয়া উঠিল, যে সেই চিতা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাণ করা হয় নাই—নদী হইতে জল আনিয়া তাহা নির্ব্বাণ করিতে হইবে।

মৃৎকলসের অন্বেষণে এদিক ওদিক ঘুরিয়া, তিনি একটী অৰ্দ্ধভগ্ন মৃৎপাত্র দেখিতে পাইলেন। তখন আর বাচ-বিচার না করিয়া সেই কাণা ভাঙ্গা কলসিটী লইয়া, তিনি নদীর তীরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দেখিলেন—অদূরে একটী গাছের তলায় আলো জ্বলিতেছে। তিনি মনে ভাবিলেন, হয়ত কোন নাগা সন্ন্যাসী ধূনী জ্বালাইয়া, সেই সোপানের উপর বসিয়া আছে। তিনি অতি সন্তর্পণে সেই ভাঙ্গা ঘাটের দুই চারিটী সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া বৃক্ষতলে আসিয়া যে ভীষণ দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

যে আলোকটাকে দূর হইতে তিনি সন্ন্যাসীর ধূনী বলিয়া মনে করিয়া ছিলেন, সেটা একটা বড় হাত-লণ্ঠন।

সন্ন্যাসী অগ্রসর হইবামাত্রই সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই লণ্ঠনের অতি নিকটবর্ত্তী স্থানাধিকার করিয়া একজন সেখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

তিনি তাহার গাত্রস্পর্শ করিয়া দুই তিনবার মৃদুভাবে নাড়া দিলেন। কিন্তু সে কোন কথা কহিল না।

সেই লণ্ঠনের মধ্যে যে বাতিটুকু ছিল, তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। লোকটার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া এই সন্ন্যাসী বুঝিলেন, কোন কারণে গুরুতর আঘাত পাওয়াতেই তাহার মূর্চ্ছা ঘটিয়াছে। ঘটনাচক্রের ফেরে, তখন আর একটা নূতন কর্ত্তব্য তাঁহার সম্মুখে দেখা দিল।

তিনি সেই লণ্ঠনটী হাতে লইয়া অতি সন্তর্পণে নদীতে নামিয়া গিয়া; নিজের উত্তরীয় বস্ত্রটী উত্তমরূপে ভিজাইয়া লইয়া, বারি সংগ্রহ করিলেন। সহসা

একটা দমকা হাওয়ায় বাতিটী নিবিয়া গেল। তখন সন্ন্যাসী অন্ধকারে আন্দাজ করিয়া সেই মূর্চ্ছিত দেহের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সেই আর্দ্র উত্তরীয় নিংড়াইয়া বার কয়েক জলের ছিটা দিবার পর, লোক-টার চৈতন্য হইল। সে উঠিয়া বসিল। বলা বাহুল্য এ—আমাদের সনাতন।

সন্ন্যাসী কোমলস্বরে বলিলেন—"আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। কোন ভয় তোমার নাই। তোমাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া শুশ্রূষার দ্বারা চেতনা করিয়াছি! তোমার কি কোথাও বেশী চোট্ লাগিয়াছে?"

সনাতনের মাথায় সত্যই একটু চোট লাগিয়াছিল। তাহার জন্য সামান্য যন্ত্রণাও হইতেছিল। এই সময়ে সহসা তাহার মনে পূর্ব্ব কথা জাগিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"প্রভু! আপনি যেই হোন, আমার একটু উপকার করুন। এক কুল কন্যাকে, এই শ্মশান ঘাট হইতে দুষ্ট লোকেরা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারাই আমার মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া-ছিল। সেই কুল কামিনী সতীলক্ষ্মীর আজ মহাবিপদ উপস্থিত। তাঁহাকে রক্ষা করুন। তিনি আমার মা।

সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়া বড়ই বিচলিত হইলেন। সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় থাকেন তিনি?"

সনাতন। দেবানন্দপুরে!

সন্ন্যাসী। দেবানন্দপুরে? কোন বাড়ীর মেয়ে তিনি?

সনাতন। তিনি রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর মেয়ে!

সন্ন্যাসী। হেমরাণী?

সনাতন। হাঁ হেমরাণী! তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা, আমি কৈবর্ত্ত-সন্তান। তাঁহার গুণে স্নেহে বাধ্য হইয়া, আমি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতাম।

সন্ন্যাসী। তোমার বাড়ী কোথায়?

সনাতন। কৃষ্ণরামপুরে?

সন্ন্যাসী। তাহা হইলে তুমি নবকুমার মণ্ডলের পুত্র—সনাতন।

সনাতন—সন্ন্যাসীর পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"হাঁ—কিন্তু কে আপনি মহাপ্রভু! আমার পরিচয় জানিলেন কিরূপে?"

সন্ন্যাসী। পরে বলিব। তুমি এখন সুস্থ হইয়াছ ত?

সনাতন। আজ্ঞে হাঁ।

সন্ন্যাসী। আমার সহিত একটু খাটিতে পারিবে?

সনাতন। পারিব।

সন্ন্যাসী। ভাল। আকারে দেখিতেছি, তুমি খুব জোয়ান। লাঠি ধরিতে পারিবে কি?

সনাতন। খুব পারিব। কৈবর্ত্তের ছেলে চাষ বাস করিয়া খাই। হাতের কব্‌জিতেও খুব শক্তি আছে।

সন্ন্যাসী। নারায়ণ তোমার বাসনা পূর্ণ করুন। আমার সঙ্গে এস।

উভয়ে দৃঢ়পদে, অতি সন্তর্পণে, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন আকাশ হইতে মেঘগুলা সরিয়া গিয়াছে। উজ্জ্বল নক্ষত্রালোকে পথ ঘাটও চেনা যাইতেছে।

শ্মশানক্ষেত্র হইতে বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসী দেখিলেন, পথের পার্শ্বে এক বিস্তৃত বাঁশঝাড়। প্রয়োজনানুরূপ একটা সরু বাঁশকে ধরিয়া নোয়াইয়া, সন্ন্যাসী মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তারপর জানুর শক্তিতে সেই বংশ-দণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দুই গাছি লাঠি করিলেন। তাহার একগাছি সনাতনের হাতে দিয়া বলিলেন—"যদি তাহাদের ধরিতে পারি, তাহা হইলে ইহাতেই কার্য্যোদ্ধার হইবে। যাক্ এখন ঘটনাটা কি সংক্ষেপে আমাকে বুঝাইয়া বল দেখি!"

সনাতন তখন সেই শ্মশান-ক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনা গুলি, সন্ন্যাসীকে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল।

সন্ন্যাসী মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তার পর বলিলেন—"বলিতে পার, ডাকাতেরা সংখ্যায় কয় জন ?"

সনাতন। না— তাহা দেখিবার অবসর পাইলাম কই ?

সন্ন্যাসী। খুব সম্ভবতঃ তাহারা নদীপথেই গিয়াছে। ঘাটের চারি দিকটা একবার ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত। হায়! এই সময়ে যদি তোমার লণ্ঠনেরর বাতিটা না নিভিয়া যাইত।

সনাতন বলিল—"অন্য উপায়ে আলোর যোগাড় করিতেছি। চলুন ঘাটেই ফিরিয়া যাই।"

শ্মশানের পার্শ্বের একটা নারিকেল গাছ হইতে, তাহার একটা বালতো পড়িয়া গিয়াছিল। আসিবার সময় সনাতন সেটাকে পা দিয়া পার্শ্বে সরাইয়া দিয়াছিল। সে সন্ন্যাসীকে বলিল—"আমার সঙ্গে আসুন। আলোর বন্দোবস্ত করিতেছি।"

সনাতন সেই বৃক্ষচ্যুত নারিকেল বালতোর পাতাগুলি ছিঁড়িয়া লইয়া শ্মশানের দিকে চলিল। তখনও সেই নির্ব্বাপিতপ্রায় চিতার আগুণ ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছে। সনাতন এই পাতাগুলি সমষ্টিভূত করিয়া একটী মশালের সৃষ্টি করিল। চিতার জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে সেটিকে প্রবেশ করাইয়া, বার কয়েক ফুৎকার দিবামাত্র আগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি সে এতক্ষণ ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই। এখন দেখিল, সেই সন্ন্যাসী দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ-দেহ, বিশাল-বাহু। তাঁহার মুখমণ্ডল শ্মশ্রু ও গুম্ফে পরিপূর্ণ। এ সন্ন্যাসীমূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে তাহার অপরিচিত।

সনাতন সেই আলোক সহায়তায়, ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী—তাহার পশ্চাদ্গামী।

নদীকুলে যে বাঁধা ঘাটটী ছিল, কালধর্ম্মে আর নদীতরঙ্গের ক্রমাগত

আঘাতে, তাহার নানা স্থান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। পোক্তা-বাঁধা ঘাটের ইষ্টক স্তূপ চারি দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন—"তোমার মা এ ঘাটের কতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া ছিলেন জান কি ?

সনাতন তাহার হাতের মশালটা অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল "এই পর্য্যন্ত।

কিয়ৎক্ষণ অনুসন্ধানের পর সন্ন্যাসী দেখিলেন, যেথান হইতে নদীর জল আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি গভীর পদচিহ্ন। নদীতীরের বালির উপর খুব বড় বড় পায়ের দাগ পড়িয়াছে। আর অতি নিকটবর্ত্তী স্থানেই এই পদ-চিহ্নের বিরাম।

সন্ন্যাসী ঘাটের অন্য দিকগুলিও দেখিলেন, কিন্তু আর কোথায় কোনরূপ চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। নদীতীরের নিকটেই একটী বাগান। সন্ন্যাসীআলোক সহায়তায় দেখিলেন—বাগানের ভাঙ্গা প্রাচীরের পাশের ঘাস গুলি যেন পদ-বিমর্দ্দিত। আর নদী তীরেও মনুষ্য-পদচিহ্ন। ইহা দেখিয়াও, ডাকাতেরা কোন পথে হেমরাণীকে লইয়া গিয়াছে, তাহা স্থির নিশ্চয় হইল না। স্থলপথে গেলে নিশ্চয়ই গ্রামের লোকের চোখ পড়িবে। জল পথে যাওয়াই তাহাদের খুব সম্ভব। কিন্তু নদীতীরে ত একখানিও নৌকা নাই। হায়! পলায়িতদের অনুসন্ধানের যে কোন উপায়ই নাই।

সনাতন এতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে, এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর অদ্ভুত কার্য্য প্রণালী লক্ষ্য করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার মুখে একটা নিরাশার চিহ্ন দেখা দিয়াছে দেখিয়া সে বুঝিল, এতটা অনুসন্ধানের পরও তিনি কিছুই স্থির নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। সন্দেহের গোলমালে পড়িয়াছেন।

সনাতন সন্ন্যাসীর সেই সময়ে স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া, একটু ভয় পাইল। সে দেখিল—সেই অবধূতের নেত্র দিয়া যেন অনলকণা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, সেই নদী সৈকতে সমাবদ্ধ। তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন।

সে সাহসাবলম্বনে প্রশ্ন করিল—"কি বুঝিলেন প্রভু ?"

সন্ন্যাসী স্থির গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"দেখিতেছি, আমারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

সনাতন। কে আপনি ? আপনার সহিত আমার মা হেমরাণীর কি সম্পর্ক !

সন্ন্যাসীর নেত্রদ্বয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"আমিই সেই রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। অভাগিনী হেমরাণীর অতি দুর্ভাগ্য অপদার্থ পিতা !"

সনাতন একথায় বড়ই বিস্মিত ও চমকিত হইল। রমাপ্রসন্ন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাই সকলের বিশ্বাস ! তারও মনে যে সে বিশ্বাস জন্মায় নাই—তা নয়। অন্য কেহ হইলে হয়ত সে ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। কিন্তু সনাতন মহা সাহসী। তবুও সে তাহার সন্দেহভঞ্জনের জন্য বলিল—"রমাপ্রসন্ন ত ইহলোকে নাই !"

সন্ন্যাসী গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"না সেই হতভাগ্য রমাপ্রসন্ন মরে নাই। সে প্রেত মূর্ত্তিতে তোমার সম্মুখে আসে নাই। সেই রমাপ্রসন্ন, যে সংসারের জ্বালায় জর্জ্জরিত আর পুলিসের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া আছে। যে তাহার পত্নী ও কন্যার সহিত অতি নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীনের মত ব্যবহার করিয়াছে সেই হতভাগ্য রমাপ্রসন্নই আজ সন্ন্যাসীবেশে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সেই আজ তাহার মৃত পত্নী বিন্দুবাসিনীর চিতা-ধূমের সহিত, তাহার মর্ম্মভেদী নিশ্বাস মিশাইতে আসিয়াছিল। তাহার চির আদরিণী

পত্নীর জ্বালাময় মরজীবনের শেষ দিনে, তাহাকে শেষ দেখা দিতে আসিয়াছিল।”

সনাতনের মনে সহসা একটা কথা জাগিয়া উঠিল। বিন্দুবাসিনী মৃত্যুর ক্ষণেক পূর্ব্বে, বার বার সতৃষ্ণ নয়নে, বাগানের প্রাচীরের দিকের জানালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রাণীকে বলিয়াছিলেন—“ঐ তিনি আসিয়াছেন আমাকে লইতে। আমি চলিলাম।”

তখন সনাতন রোগীর এই কথা গুলিকে, অসম্ভব প্রলাপোক্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহার মনের বিশ্বাস এই দাঁড়াইল, যে পত্নীর মরণের প্রাক্কালে, বাটীর ভিতরে আসিয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি সাহস করেন নাই। কেননা, সেখানে গ্রামের আরও দু'চার জন উপস্থিত ছিল। তাই তিনি গবাক্ষপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

সনাতন কৌতুহলবশে প্রশ্ন করিল—“তাহা হইলে দেবানন্দপুরে আপনার মৃত্যু সংবাদ রটিল কেন?”

সন্ন্যাসী। এ মৃত্যু সংবাদ ইচ্ছা করিয়াই আমি কাশীতে রটাইয়া ছিলাম। যাহারা বলিয়াছিল আমি কলেরায় মরিয়াছি, তাহারা আমারই অর্থে ক্রীত ও বশীভূত লোক। কাশীর সেই সংবাদটাই এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে। আমার মনিব হেমেন্দ্রকুমার যে আমার সন্ধানে কাশীতে গিয়াছিলেন, এ সংবাদও আমি রাখি!

সনাতন। মা, আর দিদিমা, এই কয়েক বৎসর খুবই কষ্ট পাইয়াছেন। আপনার জমীজমা সবই বিক্রী হইয়া গিয়াছে। এ দুঃখেরও দিনে আপনি ত তাঁদের একবার দেখা দিয়াও যাইতে পারিতেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—“সনাতন! তাহা না করিয়া সত্যই আমি মহাপাপ করিয়াছি। কিন্তু আত্মরক্ষার আশঙ্কা খুব প্রবল হওয়ায়, অপমান ও

কারাবাসের ভয়টা খুব বেশী হওয়ায়, আমি সন্ন্যাসীবেশে নানা দেশ ভ্রমণ করিতাম। জানিয়াছিলাম, খুনী আসামী বলিয়া পুলিস তখনও আমার অনুসন্ধান করিতেছে। অথচ দোহাই ভগবানের! আমি এ খুনের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। এ সব সেই শয়তান রুদ্রোমের চক্রান্তের ফল। তাহা হইলেও মধ্যে মধ্যে গুপ্তচর পাঠাইয়া, আমি আমার স্ত্রী ও কন্যার সন্ধান লইতে বিরত থাকিতাম না।

সনাতন। বোধ হয় আপনি এটুকু জানেন না, যে দিদিমা আপনাকে পরলোকবাসী মনে করিয়া, বিধবার মত আচরণ করিতেন।

সন্ন্যাসী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তাও জানি। ভাগ্য আমার উপর বড়ই বিরূপ। কলিতে অধর্ম্মেরই জয়-জয়-কার। আর কর্ম্মফল কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। একমাত্র কর্ম্মফলের দোষেই, আমি গুণবতী সাধ্বী পত্নী হারাইলাম, স্নেহময়ী কন্যা হারাইলাম। এ সংসারে যাহা কিছু আমার আপনার বলিয়া ছিল—তাহার সবই আমার গেল।

সন্ন্যাসীর চক্ষু হইতে দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল। তখন উভয়ে নদী-সৈকত ত্যাগ করিয়া, গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সন্ন্যাসী পুনরায় সনাতনকে প্রশ্ন করিলেন—"এ ডাকাতি কাহাদের দ্বারা হইয়াছে বলিয়া তুমি অনুমান কর সনাতন?"

সনাতন। কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।

সন্ন্যাসী। তাহা হইলে অনুসন্ধান করিই বা কোথায়?

সনাতন। সতীর সতীত্ব রক্ষার সহায় সেই—নারায়ণ। মা আমার সতীলক্ষ্মী। সেই ভগবানই হয় ত দয়া করিয়া আমাদের অনুসন্ধান পথ দেখাইয়া দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"সত্যই তাই। আমি অতি মূঢ়। ঘোর অন্ধ! তাই

এতক্ষণ এ সামান্য কথাটা আমার মনে আসে নাই। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি সনাতন, হেমরাণীর গায়ে কোন অলঙ্কার ছিল কি ?"

সনাতন। ছিল—কিন্তু সে দুগাছি পিতলের বালা।

সন্ন্যাসী। শ্মশানে আসিবার সময়, কোন। অপরিচিত ব্যক্তি কি ছদ্মবেশে তোমাদের অনুসরণ করিয়াছিল ?

সনাতন। তাহাও লক্ষ্য করিবার অবসর পাই নাই।

সন্ন্যাসী। হেমরাণী শ্বশুরালয়ে থাকিত না কেন ?

সনাতন। আপনি বোধ হয় জানেন না, আপনার জামাতা রাসমোহন সম্প্রতি আপনাদের বাড়ীতে আসিয়া, আপনার কন্যার সহিত অতি নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আর তাঁহার নিজের বাস্তুভিটা পর্যান্ত বাঁধা। তিনি ত ভবঘুরে। মা আমার থাকিবেন গিয়া কোথায় ?

সন্ন্যাসী। আমার জামাতা রাসমোহন সত্যই অতি হতভাগা ! আমার দেশত্যাগের আর একটা পরোক্ষ কারণ—এই রাসমোহনের দুর্ব্ব্যবহার। যাক্ আর একটী কথা আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিতে চাই। সে প্রশ্নটী অতি রূঢ়। রাণীর পিতা হইয়াও আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে।

সনাতন বিরক্তির সহিত বলিল—"আপনার প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। মা আমার—সতী-সাবিত্রী। তিনি কখনও কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেন না। যখন আপনার জামাতা আসিয়া বিনাদোষে তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিয়া যান, তাহার পর হইতে মা আমার ভাবনায় শুখাইয়া যাইতেছিলেন। আমি তাঁর সন্তান। এর বেশী আর কিছু আমি বলিতে পারি না।"

সন্ন্যাসীর চোখে আবার অশ্রুপ্রবাহ বহিল। আবার স্নেহের প্রবল বাণ, মহাশব্দে অন্তর মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিল। উত্তরীয়প্রান্তে নেত্রমার্জ্জনা

করিয়া, সন্ন্যাসী একদৃষ্টে সেই নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তবে তার শত্রু কে ? কে আমার এই সর্ব্বনাশ করিল !"

(১৫)

সহসা সেই গভীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, কে যেন সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে বলিল—"যারা এই কাজ করিয়াছে, তাহাদের নাম আমি আপনাকে বলিতে পারি ।"

এখন হইতে সন্ন্যাসীকে আমরা রমাপ্রসন্ন বলিয়াই অভিহিত করিব। সহসা সেই বিজন নিশীথে, নিস্তব্ধ শব্দহীন স্থানে, রমণী কণ্ঠস্বর শুনিয়া রমাপ্রসন্ন বিস্মিত চিত্তে বলিলেন—"কে তুমি ? তোমার কোন ভয় নাই। আমি সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী ! তুমি আমার সম্মুখে আইস ।"

সনাতন ভাবিল—এটা কোন প্রেত-যোনির ছলনা। রমাপ্রসন্ন ভাবিলেন—নিশ্চয়ই এই রমণী ভগবৎ-প্রেরিতা ।"

এক পূর্ণ যুবতী সেই অন্ধকার মধ্য হইতে বাহির হইয়া, সন্ন্যাসী রমাপ্রসন্নের চরণ বন্দনা করিয়া, তাঁহার সম্মুখে স্থিরভাবে দাঁড়াইল।

রমাপ্রসন্ন বলিলেন—"কে তুমি ? কোথায় থাক ?

সেই রমণী বলিল—"আমার বাড়ী রামানন্দপুরে ।"

"রামানন্দপুরের অনেককে আমি চিনি ! কার কন্যা তুমি ?"

"সে পরিচয়ে কাজ নাই ! আমি কলঙ্কিনী। কুলত্যাগিনী কলঙ্কিতার কুলপরিচয় নাই ।"

"এ রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন ?"

"আপনাদের সংবাদ দিব বলিয়া আসি নাই। আসিয়াছিলাম, এক

বপদগ্রস্তা কুললক্ষ্মীকে—সাবধান করিয়া দিতে। এক পিশাচ, আর তার সঙ্গী এক পিশাচীর হাত হইতে, তাহাকে উদ্ধার করিতে।”

“তা করিলে না কেন?”

“বড়ই বিলম্বে আসিয়াছিলাম। আমার আসিবার দশমিনিট আগে এই ভয়ানক কাজ হইয়া গিয়াছে।”

“বলিতে পার—কে আমার এ সর্ব্বনাশ করিয়াছে?”

“রামানন্দপুরের জমীদার সুরেন্দ্রকুমার বাবু আর—

“আর—কে?”

“তাঁর পাপ কার্য্যের চিরসঙ্গিনী তারামণি?”

“তারামণি বৈষ্ণবী!”

“আপনার অনুমান ঠিক!”

“তারামণি কি রামানন্দপুরের অধিবাসিনী! দেবানন্দপুরে আমি এক তারামণিকে জানিতাম। সে মাধব গোয়ালার বিধবা কন্যা হরিমতি বলিয়া এক যুবতীকে পথভ্রষ্ট করে। মাধব গোয়ালা, আমার কাছে নালিশ করিলে আমি এই তারামণির বাসোচ্ছেদ করিয়া, স্বহস্তে তাহাকে জুতা মারিয়া, গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম। একি সেই তারামণি?”

“আজ্ঞে—হাঁ। সে এই কাণ্ডের পর বাস উঠাইয়া রামানন্দপুরে চলিয়া যায়। আর আমিই সেই মাধব গোয়ালার অভাগিনী কন্যা—হরিমতী। তাহার ছলনায় ভুলিয়া, না বুঝিতে পারিয়া, আমিই সুরেনবাবুর বিলাসের দাসী হইয়া আমার সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি!”

“এখন সব কথা বুঝিলাম। তুমি কি এখন সুরেন্দ্রকুমারের পরিত্যক্তা?”

“আমার দুরদৃষ্টে তাই ঘটিয়াছে।”

“তুমি থাক কোথায়?”

“এই তারামণিরই বাটীতে।”

"তবে কেন তাহার অনিষ্ট করিতে আসিয়াছ ?"

"সে এর আগে আমায় যে অনিষ্ট করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। আমি প্রতিশোধের চেষ্টায় আসিয়াছিলাম। এক সতী রমণীকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। পারিলাম না।"

"এই তারামণি এখন কোথায় গিয়াছে বলিতে পার ?"

"খুব সম্ভব সুরেন্দ্রবাবুর শিবরামপুরের বাগানে।"

"আর সুরেন্দ্রবাবু? রামানন্দপুরের সেই আদর্শ জমীদার, রায়কুলকলঙ্ক ? তাঁর সন্ধান বলিতে পার কি ?

"ঠিক জানিনা। তবে তিনিও হয়তো বাগানেই আছেন।"

"বাগানে কত লোকজন থাকে তার সংবাদ রাখ কি ?"

"কতক রাখি বটে। এক দরোয়ান, একজন খানসামা, আর দুইজন চাকর।"

রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"এই সংবাদটা দিয়া তুমি আমার ভারি উপকার করিলে। তোমার পিতা আমার মনিব, জমীদার হেমেন্দ্রকুমারের প্রজা ছিল। মাধব বাঁচিয়া আছে কি ?

হরিমতি অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিল—"একমাত্র বিধবা কন্যার এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, তিনি বুকভাঙ্গা হইয়া পড়েন। শেষ পাগল অবস্থায় মারা যান।"

রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, সনাতনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এখন সব কথা স্পষ্ট বুঝিতেছি। আমার কন্যাকে নিঃসহায় অবস্থায় দেখিয়া এই কলুষিত চরিত্র, নরপিশাচ সুরেন্দ্র, তাহাকে এই কলঙ্কিতা তারামণি বৈষ্ণবীর সহায়তায় অপহরণ করিয়াছে। এই স্ত্রীলোক আমাদের যে সংবাদ দিল, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অন্য চেষ্টার আগে, একবার সেই শিবরামপুরের বাগানেই যাওয়া কর্ত্তব্য।"

সনাতন বলিল—"কিন্তু নদীতীরের পায়ের দাগগুলা ত তীরের দিকে যায় নাই। ভাঙ্গা পাঁচিলের কাছেই শেষ হইয়াছে।"

রমাপ্রসন্ন। দস্যুরা ইচ্ছা করিয়াই আমাদের অনুসন্ধানের পথে বাধা দিবার জন্যই এইরূপ কৌশল করিয়াছে। এর মধ্যে যে একজন পাকা লোক ছিল—তার আর কোন সন্দেহ নাই।"

হরিমতি এই সময়ে বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয়ই তাই! আপনার অনুমান যথার্থ। এই চক্রান্তের মধ্যে—সুরেনবাবুর নায়েব, রুদ্রাম মণ্ডলও আছে!"

"কেমন করিয়া জানিলে?"

"একদিন রাত্রে আড়ালে থাকিয়া আমি সুরেনবাবু ও তারামণির সকল কথাই শুনি। তার পর কাল রাত্রেও, সুরেন বাবুর বাগানে গুপ্তভাবে আবার প্রবেশ করিয়াছিলাম। রুদ্রাম ও তারামণির মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার কতক কতক আমি শুনিয়াছি। আর আজ মধ্যাহ্নের পর হইতে তাহাদের দুই জনকেই বাগানে দেখিতে পাই নাই।"

এই সাংঘাতিক ব্যাপারের মধ্যে যে একটা মহা সন্দেহ ছিল, তাহা এই অভাগিনী হরিমতির কথায়, যেন মাঘের কুয়াসার মত সহসা উড়িয়া গেল।

রমাপ্রসন্ন সনাতনকে নির্ব্বাক অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "কি ভাবিতেছ তুমি সনাতন?"

সনাতন একটু থতমত খাইয়া বলিল—"এই সব কথাই ভাবিতেছি। আর ভাবিতেছি—এই শয়তান জমীদার সুরেন্দ্রকুমার কি এতই অসতর্ক হইবে, যে সেই শিবরামপুরের বাগানের মধ্যে আমার মাকে লুকাইয়া রাখিবে?

রমাপ্রসন্ন একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তুমি যা বলিতেছ তা খুবই সত্য। কিন্তু মন যে নারায়ণ! মনে যে কথাটা জাগিয়া উঠে, তাহা সত্য কিনা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। আমি জানি

এই সুরেন্দ্রকুমার, অতি নির্ব্বোধ, অতি দর্পিত, নিজের ক্ষমতার উপর বড়ই বিশ্বাসী। বাগানটা একবার দেখিয়া যাওয়ায় দোষ কি ?"

সনাতন এ কথার উপর আর কথা বলিতে পারিল না। সে বলিল—"আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। যা বলিবেন তাই করিব।"

তখন তিনজনে সেই নিশীথান্ধকার ভেদ করিয়া, অতি দ্রুত পথ চলিয়া শিবরামপুরের বাগানের কাছে পৌছিলেন। তখন সম্পূর্ণরূপে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া, আকাশ খুব পরিষ্কার। পথ ঘাট দেখিয়া চলিতে পারা যায়।

রমাপ্রসন্ন দৃঢ় স্বরে ডাকিলেন—"সনাতন ?"

সনাতন বলিল—"অনুমতি করুন।"

রমাপ্রসন্ন। তোমরা দু'জনে এই গাছতলায় অন্ধকারে লুকাইয়া থাক। আমি একবার বাগানের ভিতরটা দেখিয়া আসি। প্রয়োজন হয়, ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের লইয়া যাইব।

সনাতন। কিন্তু আপনার মহাশত্রু যে, তার পুরীর মধ্যে একলা যাওয়া আপনার পক্ষে কি ঠিক ? যদি সে চিনিতে পারে !

রমাপ্রসন্ন। চেনার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আর এখনও এ দেহে যথেষ্ট শক্তি আছে। সাধ্য কি সুরেন রায়ের—যে সে আমাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে ? মহাপাপী যে—প্রকৃতির নিয়মে সে ঘোর কাপুরুষ !

আর কিছু না বলিয়া, কিম্বা বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া রমাপ্রসন্ন বাগানের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

বাগানের ফটকের দ্বার লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তিনি অনেক কষ্টে উদ্যানের ক্ষুদ্র প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরের সীমানার মধ্যে পড়িলেন।

রজনীর শেষ যাম। দ্বাররক্ষী চোবে ঠাকুর, খাটিয়ার উপর গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। রমাপ্রসন্ন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, সেই বাগান বাটীর গাড়ী-বারান্দায় পৌছিলেন।

নিদাঘের রাত্রি—আর তার উপর বাবুর অবর্ত্তমানের সুযোগ। একটু সুরা পান করিয়া নবীন খানসামা, গাড়ীবারান্দার কাছে একটী ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে শুইয়াছিল। আর নেশার খেয়ালে, তন্দ্রার ঘোরে, হরিমতির স্বপ্ন দেখিতেছিল। কেননা তখন বাবু যে তাহাকে পনর আনা মতন বিরাগনেত্রে দেখেন, তাহা তার অপরিজ্ঞাত ছিল না। আর হরিমতির মাজা ঘসা নিটোল গড়নটী, টানাটানা চোখ্ দুটি, হাসিমাখা মুখখানি, তখন তাহার ধ্যান ধারণার অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছিল। তবে সে এই অভাগিনী হরিমতির সম্বন্ধে তাহার মনিবের একটা শেষ সিদ্ধান্ত না দেখিয়া, তাহার ভালবাসার কথা হরিমতির নিকট মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত করিতে সাহস করে নাই।

রমাপ্রসন্ন এই নিদ্রিত নবীনের কাছে দাঁড়াইবামাত্রই সুরার গন্ধ পাইলেন। আর সেই কাকনিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে মৃদুভাবে স্পর্শ করিবামাত্রই, সে ঘুমের ঘোরে বলিয়া উঠিল—"কেও! হরিমতি?"

রমাপ্রসন্ন গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি যাহাকে খুঁজিতেছ সে আসে নাই। আসিয়াছি—আমি। একবার চোখ্ চাহিয়া দেখ দেখি!"

নবীন খানসামা চোখ্টা রগড়াইয়া, নিদ্রার আলস্য কাটাইয়া, সম্মুখে দৃষ্টি করিবামাত্র দেখিল—তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, রুদ্রাক্ষমালাভূষিত, চন্দন-চর্চ্চিত-ললাট, শ্মশ্রুগুম্ফ পরিপূর্ণ, গম্ভীর মুখ, এক সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন।

সেই বারান্দার অদূরে একটা স্তিমিত আলোক মিট মিট করিতেছিল। সেই অপ্রদীপ্ত আলোকে সে দেখিল, সন্ন্যাসীর নেত্রদ্বয় হইতে যেন অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে।

নবীন ভয় পাইয়া, শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসীর চরণে প্রণত হইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"কে প্রভু! আপনি? এ রাত্রে এখানে কেন?"

সন্ন্যাসী রমাপ্রসন্ন, গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"আমি জমীদার সুরেন্দ্রকুমার রায়ের সন্ধানে আসিয়াছি!"

"এত রাত্রে?"

"ইচ্ছা করিয়াই অসময়ে আসিয়াছি। তিনি একটা ভয়ানক ব্যাপারে লিপ্ত। আমি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী। ঠিক্ সময়ে তাঁহাকে সাবধান করিয়া না দিলে তিনি মহা বিপদে পড়িবেন।"

নবীন ভিতরের সব কথাই জানিত। এজন্য সন্ন্যাসীর এই কথায় সে একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—"তিনি ত এখানে নাই?"

সন্ন্যাসী। কোথায় গিয়াছেন?

নবীন। তা ঠিক বলিতে পারি না।

নবীন বড়ই সুচতুর। সে মনে মনে ভাবিল—"হোক্ না সন্ন্যাসী। ভুত প্রেত নয়—মানুষ ত! প্রকৃত খপর কিছুই দিব না। যতটা বলিয়াছি তাই যথেষ্ট।"

তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া রমাপ্রসন্ন বলিলেন—"আমার নিকট সত্য গোপন করিও না। কে—তুমি!"

"আমি বাবুর খাসনামা নবীন!"

"তোমার বাবু কোথায়—সত্য কথা বল?"

"এ বাগানে নাই—তা'ত আগে বলিয়াছি।"

"হইতে পারে। কিন্তু তুমি যখন এই বাগানেই থাক, আর খুব সম্ভবতঃ তার বিশ্বাসী ভৃত্য—তখন তুমি নিশ্চয়ই এ খপরটা জান, যে তোমার মনিব কোথায় গিয়াছে।"

নবীন বুঝিল—এই সন্ন্যাসী যেই হোক না কেন, নিশ্চয়ই সে কোন একটা গভীর মতলব লইয়া আসিয়াছে। হয়তঃ এ শত্রু পক্ষের কোন লোক! কয়েক ঘণ্টা আগেই একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, আর তার সঙ্গে

সঙ্গে, রজনীর শেষ প্রহরে এই সন্ন্যাসীর এভাবে আবির্ভাব, ব্যাপারটা বড় সোজা বলিয়া মনে হইতেছে না।

নবীন খানসামাকে এইভাবে চিন্তা করিতে দেখিয়া রমাপ্রসন্ন বুঝিলেন— "এই ধূর্ত্ত বদমায়েসের নিকট হইতে, সোজা উপায়ে ভাল মানুষিতে সকল সংবাদ জানা অতি অসম্ভব ব্যাপার! দুষ্ট প্রকৃতির লোককে পরুষ ভাবের দ্বারা শাসন করিতে হয়, শক্তিতে সংযত করিয়া আয়ত্তাধীনে আনিতে হয়।

এজন্য তিনি অপেক্ষাকৃত রুষ্টস্বরে বলিলেন—"দেখ বাপু! তুমি যদি সত্য কথা না বল, তাহা হইলে তোমার বিপদ ঘটিবে।"

নবীন বলিল—"সকল কথা সকলকে বলিতে আমার প্রভুর নিষেধ। আপনি কে তা জানি না। আমি যদি আপনাকে সব কথা না বলি!"

"তাহা হইলে তোমার এই অবাধ্যতার ফল সঙ্গে সঙ্গে ভোগ করিবে" এই কথা বলিয়া, রমাপ্রসন্ন সবলে নবীনের গ্রীবা টিপিয়া ধরিলেন। তাহাতে নবীনের শ্বাস রোধ হইবার মত হইল।

রমাপ্রসন্ন তখন দৃঢ় স্বরে বলিলেন—"মার্জ্জনার পাত্রাপাত্র আছে। তুমি অতি দুষ্ট। এখন বুঝিতেছ, আমার দেহে শক্তি কত বেশী!"

রমাপ্রসন্ন চিরদিনই বলীয়ান পুরুষ। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের পীড়ন শক্তি সহ্য করিয়া, এই হতভাগ্য নবীনের গ্রীবাদেশ বড়ই ব্যথাময় হইয়া উঠিল। সে মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল—"গলা ছাড়িয়া দিন। আমার দম বন্ধ হইবার মত হইয়াছে। আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার যথার্থ উত্তর দিব।"

রমাপ্রসন্ন। সত্য বল্, তোর মনিব সুরেন্দ্র এখন কোথায়?

নবীন। তিনি রাত্রি বারটার ট্রেণে কলিকাতায় যাইবেন, এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় সেখানে যান নাই।

রমাপ্রসন্ন। কোথায় গিয়াছেন তবে!

নবীন। খুব সম্ভব তাঁর আমেদপুরের কাছারীতে।

রমাপ্রসন্ন। সেখানে আর কে কে গিয়াছে?

নবীন। তারা বোষ্টুমী—আর মোড়ল মশাই।

রমাপ্রসন্ন। মোড়ল মশাই—অর্থাৎ তোর মনিবের সকল প্রকার শয়তানীর সহচর—সেই রুদ্ররাম নায়েব।

নবীন। আপনি তাকেও চেনেন দেখছি! কে আপনি ঠাকুর!

রমাপ্রসন্ন। আমি যেই হই—আর একদিন তোর সঙ্গে এইভাবে সাক্ষাৎ করিব। তুই টাকা ভাল বাসিস্?

নবীন শুনিয়াছিল, সন্ন্যাসীরা অলৌকিক ক্রিয়ার সহায়তায়, আর মন্ত্রবলে টাকার গাছ পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে পারে। সে এতক্ষণের পর কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল—"এ জগতে টাকা কে না ভালবাসে দেবতা?"

রমাপ্রসন্ন। তোর মনিবের কাছে ক'টাকা বেতন পাস।

নবীন। খোরাক পোষাক বাদ দশ টাকা।

রমাপ্রসন্ন তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র মধ্য হইতে দুইখানি নোট বাহির করিয়া নবীনের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"তোর দুই মাসের বেতন আমার এই হাতে। তোকে এই কুড়িটি টাকা এখনি দিব। আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর দে।"

নবীন করজোড়ে বলিল—"অনুমতি করুন।"

রমাপ্রসন্ন। সেই আমেদপুরের কাছারী বাড়ীতে রুদ্ররাম কোন স্ত্রীলোককে লুইয়া গিয়াছে কি?

নবীন বিস্মিতভাবে একবার সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিল। পরক্ষণেই সতৃষ্ণ নয়নে সেই নোটগুলির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল—"আমার মনিব অবশ্য কোন স্ত্রীলোককে নিয়ে যাননি, তবে এই রুদ্দুর নায়েব আর তারামণি, এক অনাথা ব্রাহ্মণের মেয়েকে, লেঠেলের সাহায্যে লুঠ করে সেই বাগানে নিয়ে যাবে, এমন একটা কথা শুনেছি বটে।"

রমাপ্রসন্ন। সেই স্ত্রীলোকের পরিচয় জানিস্ ?

নবীন। পরিচয়টা কতক জানি। আড়াল থেকে ওৎপেতে গুপ্ত পরামর্শ শোনা আমার তিন পুরুষের স্বভাব। কারণ, তাল বুঝে সংবাদ কেনাবেচা কোল্লে, আমাদের দু'পয়সা উপরি আয় হয়। কাল গোপনে থেকে শুনেছিলুম, দেবানন্দপুরের রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর মেয়েকে লুঠ করবার কথা হচ্ছে।"

রমাপ্রসন্ন গম্ভীর স্বরে কেবলমাত্র বলিলেন—"বটে!" তারপর তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুত নোট দু'খানি নবীনের হাতে দিয়া, বলিলেন—"আমার সঙ্গে আজ রাত্রে এইভাবে যে তোর দেখা হয়েছিল, একথাটা তুই যদি কিছুদিনের জন্য গোপন রাখতে পারিস, তা হ'লে আর একমাস বাদে তোকে আরও কিছু টাকা দোব। আর এ কথা প্রকাশ কল্লে, জানিস্ আমার হাতেই তোর প্রাণ যাবে।"

নবীন বলিল—"আমরা হলুম গরীব দুঃখী। চাকর বাকর লোক। টাকাই আমাদের প্রধান প্রয়োজন। যার টাকা খাবো, তার কাজে নেমক হারামী যদি করি, তা হ'লে ধর্ম্মে সইবে না। আমার তিন পুরুষ এই খানসামাগিরি করে আস্ছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—এ সম্বন্ধে।"

যে কেরোসিনের ডিবিয়াটা দালানের এক পাশে জ্বলিতেছিল, তাহার শেষ তৈল বিন্দু আকর্ষিত হওয়ায়, সেটা সহসা দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল।

নবীন খানসামা অন্ধকারে বড় ভয় পাইল। রমাপ্রসন্ন এই অবসরে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যে উপায়ে তিনি উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদবলম্বনেই উদ্যানের বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

এইরূপ দৈব প্রেরিত উপায়ে, অসম্ভবভাবে, নোট দু'খানি পাইয়া নবীন খানসামার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। সে অন্ধকারে হাতড়াইয়া, হল-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অনেক কষ্টে দেশালাই সংগ্রহ করিয়া বাতি জ্বালিল।

বাতির আলোকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, বহুবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া শুনিয়া, সে বুঝিল—নোটগুলি জাল নয়, আসল। সন্ন্যাসীটা তাহাকে ঠকাইয়া যায় নাই।

সে মনে মনে বলিল—"এই সন্ন্যাসী ঠাকুর যদি রোজ এমন করিয়া আসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরে, আর দুইখানি করিয়া নোট দিয়া যায়, তাহা হইলে হরিমতিকে আয়ত্তাধীন করা আমার পক্ষে একটুও কষ্টকর হইবে না।

আমাদের এতকথা বলিতে যে সময়টা লাগিল, তার চেয়েও অল্প সময়ের মধ্যে রমাপ্রসন্ন এই কাজগুলা শেষ করিয়া, উদ্যানের বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

এতক্ষণের পর তাহার সকল সন্দেহ দূর হইল। এই আমেদপুরের কাছারী তাঁহার অপরিচিত স্থান নয়। কিন্তু সে রাত্রে সেখানে পৌঁছিবার কোন উপায়ই নাই। প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে, খেয়া নৌকা না পাওয়া গেলেও জেলেদের মাছ ধরিবার নৌকা দুই একখানা মিলিতে পারে।

রমাপ্রসন্ন সেই বৃক্ষতলে আসিয়া দেখিলেন, সনাতনও হরিমতি তখনও স্থিরভাবে সেই অন্ধকার সমাচ্ছন্ন বৃক্ষতলে বসিয়া আছে।

রমাপ্রসন্ন তাহাদের সন্নিকটস্থ হইয়া ডাকিলেন—"সনাতন!"

সনাতন তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল—"কোন সংবাদ পাইলেন কি?"

রমাপ্রসন্ন। তার সম্বন্ধে সংবাদ অনেক পাইয়াছি। তোমার মা এ বাগান বাটীতে অবরুদ্ধ নাই। পাপিষ্ঠেরা তাহাকে অন্য এক দূরতর নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়াছে।

এই কথা বলিয়া রমাপ্রসন্ন, নবীনের সহিত তাঁহার যে যে কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, সবই সনাতনকে খুলিয়া বলিলেন। এই সব ভয়ানক অত্যাচারের কথাগুলি শুনিয়া, সনাতনের চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।

সে বলিল—"চলুন, এই রাত্রেই আমরা আমেদপুরে যাই।"

রমাপ্রসন্ন। কি করিয়া যাইবে ভাই! এ অঞ্চলে নিয়মিত খেয়ার প্রচলন নাই। নৌকা ত পাওয়া যাইবে না। তারপর যদিও বা নৌকা পাও, তাহা হইলে সে নৌকা আমেদপুর পর্য্যন্ত যাইতে স্বীকৃত হইবে কিনা, এইটীই হইতেছে সন্দেহ।

সনাতন বলিল—"তা হ'লে প্রভাত পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। প্রভাতেরও আর বেশী বিলম্ব নাই।"

রমাপ্রসন্ন কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তোমার আর সেখানে গিয়া কাজ নাই। আমিই সেখানে যাইতেছি। এই আমেদপুরে ছোট-তরফের মত, বড় তরফেরও এক কাছারি আছে। আমেদপুরের বাগদীরা সব লাঠিয়াল শ্রেণীর লোক। তারা এক সময়ে আমার কথায় উঠিত বসিত। দেখি তাহাদের সাহায্যে আর উপস্থিত বুদ্ধির জোরে, কতটা করিতে পারি।"

সনাতন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"একলা যাওয়াটা কি আপনার পক্ষে নিরাপদ হইবে? এ দাসানুদাসকে ছাড়িয়া যাইবেন কেন? আমি কৈবর্ত্তের ছেলে, লাঠিও ধরিতে পারি।"

রমাপ্রসন্ন বলিলেন—"দেখি না আমি একা কতদূর কি করিতে পারি! তুমি সাত দিন পরে শিবরামপুরের বুড়া-শিবের মন্দিরে আসিও। সেইখানে মধ্যরাত্রে আমার সন্ধান পাইবে। সকল সংবাদ অর্থাৎ আমি কতদূর কি করিলাম, তাহা জানিতে পারিবে। এই স্ত্রীলোক, আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছে। ইহাকে তুমি আজকের রাত্রের মত তোমাদের বাড়ীতে লইয়া যাও। প্রভাত হইবার আর বিলম্ব নাই। নানা কারণে এখন আমি আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহি না।"

অভাগিনী হরিমতি বলিল—"আমিও এ সম্বন্ধে গোপনে অনুসন্ধান করিতে ছাড়িব না। কেন না, এতে আমার একটা মহাস্বার্থ জড়িত আছে

আমি যদি কিছু নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি; তাহাও আপনাকে জানাইব।"

রমাপ্রসন্ন বলিলেন—"তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক। তাহা হইলে এখন তুমি এই সনাতনের সঙ্গে যাও।"

হরিমতি কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—"না ওঁর সঙ্গে যাওয়াটা আমার পক্ষে ঠিক নয়। গভীর রাত্রে আমাদের দরোজায় চাবি দিয়া আমি বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছি। রাত্রি প্রভাতে বাড়ী না ফিরিলে, তারামণি বড়ই সন্দেহ করিবে! তাহা হইলে আমি আপনার কন্যার সম্বন্ধে কোন নূতন সংবাদই পাইব না। এখানকার পথ ঘাট আমার খুবই পরিচিত, আমি একাই যাইতে পারিব।"

রমাপ্রসন্ন হরিমতির কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন—"তাহাই হউক। আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।"

হরিমতি চলিয়া গেলে, রমাপ্রসন্ন সনাতনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সনাতন! তুমি ঘরের ছেলে! ছেলেবেলা হইতেই তুমি আমাদের আশ্রয়ে মানুষ হইয়াছ। হেমরাণী শবদাহ করিয়া গৃহে ফেরে নাই। ইহাতে গ্রামের লোক নানা কথা রটাইবে। এজন্য তুমি এরূপ একটা সংবাদ পল্লী মধ্যে রাষ্ট্র করিয়া দিও, যে তুমিই তাহাকে নিরাশ্রয়া দেখিয়া ও সে তার বাড়ীতে একা থাকিতে স্বীকৃতা না হওয়ায়—তাহাকে তুমি তাহার মাসীর বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছ।"

সহসা সন্ন্যাসীকে শ্মশানমধ্যে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া, শববাহীরা কিরূপভাবে ভয়ে ও আতঙ্কে অভিভূত হইয়া শ্মশানভূমি ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছিল—সে ব্যাপার সনাতন জানিত না। কেননা সে সেই সময়ে মাথায় লাঠীর আঘাত পাইয়া মূর্চ্ছিত হয়।

এজন্য সনাতন বলিল—"আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহা ত

করিবই। কিন্তু এ সম্বন্ধে হেমেন্দ্রবাবুকে জানাইলে তিনি কি পরামর্শ দেন, সে চেষ্টাটাও ত একবার করা উচিত।"

রমাপ্রসন্ন কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন—"ভাল! তাহাই করিও। আর আমার মত হতভাগ্য ব্যক্তি এখনও যে জীবিত আছে, একথা শুনিয়া তিনি খুবই বিস্মিত হইবেন। তাঁহাকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিও—যেন তিনি আমার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও না বলেন। আমি ঠিক সময় বুঝিয়া তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। বিশেষ কোন গূহ্য কারণেই আমাকে এখন কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইবে।"

রমাপ্রসন্ন সনাতনের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, বিদায় লইলেন। সনাতন অশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহার পদধূলি লইয়া, দেবানন্দপুরে ফিরিয়া গিয়া, হেমরাণীর বাটীর সদোর দরোজায় একটা চাবি লাগাইয়া তাহার নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেল।

(১৬)

নীলুখুড়ো ও তাঁর দলবল প্রভাতের বহুপূর্ব্বে দেবানন্দপুরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তিনি প্রবীণ ও অভিজ্ঞ লোক। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি তাঁহার সঙ্গীদের ভীত দেখিয়া, মনে যে একটা ভয় পান নাই তাহা নয়। হাজার হৌক, সেকালের লোক ত।

শ্মশান ঘাট হইতে ফিরিবার দীর্ঘ পথে, অপেক্ষাকৃত শান্তচিত্তে, স্থির ভাবে, মধ্যরাত্রের সেই অদ্ভুত ঘটনাটা মনে মনে আলোচনা করিয়া, তিনি বড়ই একটা আত্মগ্লানি ও লজ্জা অনুভব করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"কর্ত্তাদের মুখে শুনিয়াছি, অনেক সন্ন্যাসী শবসাধনার জন্য, গভীর রাত্রে শ্মশানে আসেন। আমরা কাল রাত্রে যে দীর্ঘাকার সন্ন্যাসীকে শ্মশানে দেখিয়াছিলাম, ইনি হয়তঃ—তাঁহাদের মত কোন

একজন। যাহা হউক, ছোঁড়াদের বুদ্ধিতে চলিয়া কাজটা খুব গর্হিত হইয়া গিয়াছে। হেমেন্দ্রবাবু একথা শুনিলেই বা বলিবেন কি? সকল দোষ, সকল নিন্দা, আমারই ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে।”

একথা হেমেন্দ্রবাবুকে জানান যায় কি না—তখন সেই বিষয় লইয়াই তাহাদের কয়জনের মধ্যে একটা তর্ক উঠিল। তর্কের শেষ মীমাংসা এই হইল যে উপস্থিত হেমেন্দ্রবাবুর সহিত এত সকালে দেখা করিবার প্রয়োজন নাই। বেলা আটটা নয়টার কম ত তিনি বৈঠকখানায় আসেন না। সেই সময়ে নীলুখুড়োই তাঁহাকে সকল কথা জানাইবেন।

অন্যদিন হেমেনবাবু একটু দেরীতে বাহিরের বৈঠকখানায় আসেন। সে দিন খুবই সকাল সকাল আসিয়াছেন। কেননা হেমরাণীদের ব্যাপারটা আগাগোড়া আলোচনা করায়, গত রাত্রে তাঁহার সুনিদ্রা হয় নাই। মনটাও খুব চঞ্চল। তিনি বাহিরের বৈঠকখানার বারান্দায় এক-খানি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়, সেই দিনের একখানি ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মন বড় চঞ্চল।

হেমরাণীদের পাড়াতেই, তাঁহার এক বিশ্বাসী পাইক বাস করিত। হেমেন বাবু তাহাকেও বলিয়া রাখিয়াছিলেন, সনাতন ফিরিয়া আসিলেই সে যেন তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দেয়। পাইক সকাল হইবা মাত্রই মনিবের হুকুম পালন করিতে গিয়া দেখিল, চক্রবর্ত্তী বাড়ীর সদর দ্বারে চাবিতালা লাগান।

বেলা আটটা বাজিয়া গেল—নীলুখুড়ো ও তাঁহার দল বল বা সনাতন তখনও বাড়ী ফেরেন নাই। পাইক তাহা দেখিয়া, হেমেন্দ্রবাবুর বৈঠক-খানায় উপস্থিত হইল।

হেমেন্দ্রকুমার সোৎসুকে বলিলেন—“খপর কিরে রত্না! নীলুঠাকুর কি ফিরিয়া আসিয়াছেন?”

রত্না করজোড়ে প্রণাম করিয়া বলিল—“না ধর্ম্মাবতার! এত বেলা

হইয়া গেল, তবুও তাঁরা ফিরিয়া আসেন নাই। তার উপর চক্রবর্ত্তী বাড়ীর সদরদ্বারে বাহির হইতে চাবিতালা লাগান। এইটীতেই আমার বড় খট্‌কা লাগিয়াছে। তাই হুজুরকে জানাইতে আসিলাম।"

হেমেন্দ্র সবিস্ময়ে বলিলেন—"সেকি! বাহির হইতে বাড়ীর দোয়ারে চাবি দিলই বা কে? রতন! তুই একবার চট্ করে নীলুঠাকুরের বাড়ীতে যা। আমার নাম ক'রে তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়। আর যদি তাঁকে তাঁর বাড়ীতে না দেখ্‌তে পাস্, তাহ'লে শিবরামপুরের শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত যাবি। তাঁদের কেন এত দেরী হ'চ্ছে জানতে চাই।"

রতন পাইক প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ভৃত্য, হেমেন্দ্রের জন্য রূপার পেয়ালায় চা তৈয়ারি করিয়া আনিল। হেমেন্দ্রকুমার চা' পাত্রটী নিঃশেষ করিয়া আবার সংবাদপত্রের দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

এমন সময়ে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নীলুখুড়ো ডাকিলেন—"বাবাজি!"

নীলুখুড়োকে দেখিয়া হেমেন্দ্র সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"খুড়ো। ব্যাপার কি? তোমাদের ফির্‌তে এত বেলা হ'ল কেন?"

নীলুখুড়ো মনে ভাবিয়াছিলেন—যে কথাটা একবারেই গোপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু হেমেন্দ্রের মুখের ভঙ্গী দেখিয়া তিনি ভাবিলেন—তাহা করা ঠিক নয়। হেমেন্দ্রকুমারের মেজাজ তিনি খুব ভালরূপই জানিতেন। মিথ্যা কথা আর প্রবঞ্চনার উপর তিনি ভারি চটা। এজন্য নীলুখুড়ো, হেমেন্দ্রের পার্শ্বে একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, মলিনমুখে কম্পিতস্বরে বলিলেন—"সে অনেক কথা! ভয়ে বলবো—না নির্ভয়ে বল্‌বো?"

নীলুখুড়ো এই হেমেন্দ্রনাথেরই আশ্রিত ব্যক্তি। আপনার খুড়ো না হইলেও তিনি তাঁহাকে পিতৃব্যের মতই সম্মান করিতেন। তাহার কথা

শুনিয়া হেমেন্দ্র বড়ই সন্ধিগ্ধ হইয়া বলিলেন—"ব্যাপার কি? আপনার কথার ভঙ্গীতে আমার বড় ভয় হইতেছে।"

নীলুখুড়ো অন্য উপায় না দেখিয়া, সমস্ত ঘটনার একটুও না বাদ দিয়া যারপর যেমনটী হইয়াছিল সবই হেমেন্দ্রকুমারকে বলিয়া ফেলিলেন।

ঘটনাটা শুনিয়া হেমেন্দ্র খুবই বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"এটা যেন একটা উপন্যাসের কথা। আপনি যা বলিতেছেন, তা' যদি সত্যই হয়, তাহলে আপনারা খুবই একটা ভ্রম করেছেন। আপনাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেচনাকে একটুও প্রশংসা কর্ত্তে আমি প্রস্তুত নই। যাই হ'ক সনাতন আর হেমরাণী গেল কোথায়?"

নীলুখুড়ো বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"সে কি! তারা এখনও ফেরেনি!"

রতনা পাইককে হেমেন্দ্রবাবু এই নীলুখুড়োর সন্ধানেই পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু পথি মধ্যে খুড়োর সহিত দেখা হওয়ায়, রত্না তাহাকে হেমেন্দ্রবাবুর জোর তলবের কথা জ্ঞাপন করিয়া, শ্মশানে না গিয়া, একটু অতিরিক্ত বুদ্ধি খরচ করিয়া নবকুমার মণ্ডলের বাড়ীতে সরাসর চলিয়া গেল।

নবকুমার আর সনাতন তখন তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নিবিষ্ট মনে এই অদ্ভুত ব্যাপারের আলোচনা করিতেছিল। এমন সময়ে রতন গিয়া বলিল—"সনাতন দা! বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন।"

সনাতন একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"যেখানে বাঘের ভয়, সেই খানেই সন্ধ্যা হয়! এখন উপায় কি বলুন?"

নবকুমার বলিল—"এ ডাক ত উপেক্ষা করবার জো নেই। তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে নির্জ্জনে সব কথা বল গে। তারপর যা হবার তাই হবে, কিম্বা যা করা উচিত, তিনিই করবেন।"

সনাতন অতি বিষণ্ণমুখে হেমেন্দ্রকুমারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ। মুখ বিশুষ্ক ও শবের মত বিবর্ণ।

হেমেন্দ্রবাবু ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করিলেন—"হেমরাণি কোথায় সনাতন? তাহাদের বাটীর দ্বারে বাহির হইতে চাবি দিল কে?"

সনাতন বলিল—"চাবি আমিই দিয়াছি। শ্মশানে বড়ই একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। আপনার কাছে সে সব বলিতে আমার সাহস হইতেছে না।"

হেমেন্দ্র ব্যাকুলতার সহিত বলিলেন,—"ব্যাপার কি—শীঘ্র বল।"

সনাতন বলিল,—"আপনি পাশের ঘরে চলুন। এখানে এ সব সাংঘাতিক কথা বলা ঠিক নয়।"

হেমেন্দ্রকুমার আশঙ্কাকম্পিত উদ্বেলিত হৃদয়ে, পাশের ঘরে উঠিয়া আসিয়া, ঘরের দরোজাটী ভেজাইয়া দিয়া বলিলেন—"চারিদিকেই দেখিতেছি রহস্যময় ব্যাপার! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? শীঘ্র বল—হেমরাণী কোথায়?"

সনাতন তখন লাঠিয়াল কর্ত্তৃক তাহার আক্রমণের ব্যাপার হইতে—সন্ন্যাসীর সুরেন্দ্রবাবুর উদ্যান প্রবেশ পর্য্যন্ত, সমস্ত ঘটনা একে একে গুছাইয়া বলিয়া ফেলিল। হেমেন্দ্র শুনিয়া, চমকিত ভীত ও বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক অবস্থায় থাকিয়া, তিনি একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"সুরেন্দ্রের যে এতটা অধঃপতন হইয়াছে, তাহা জানিতাম না! আমাদের এ পবিত্র রায়-বংশে যে এমন একটা কুলাঙ্গার জন্মিতে পারে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। মাধবের কন্যার ব্যাপারে, এই রমাপ্রসন্নকে আমিই বলিয়াছিলাম 'তারামণির মাথায় ঘোল ঢালিয়া তাহাকে গ্রামের বাহির করিয়া দিয়া, তাহার ঘর জ্বালাইয়া দাও। কিন্তু রমাপ্রসন্ন দয়াবশে তখন তাহা না

করিয়া, তাহাকে খাল বাসচ্যুত করিয়াছিলেন। এখন তাহার ফল ফলিয়াছে।"

সনাতন ইহার উত্তরে কিছুই বলিল না। হেমেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন,—"আমি নিজে কাশীতে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া রমাপ্রসন্নের মৃত্যুসংবাদ জানিয়া আসিয়াছিলাম। তখন হইতেই আমার মনে একটা সন্দেহ থাকিয়া যায়। তার পর এই সুদীর্ঘ পাঁচবৎসর কাল, যখন তিনি দেশে ফিরিলেন না, কিম্বা আমার সহিত গোপনেও একবার দেখা করিবার চেষ্টা করিলেন না তখন আমি স্থির সিদ্ধান্ত করি, তিনি প্রকৃত পক্ষে জীবিত থাকিলে কখনও এরূপ হইত না। এখন তোমার কথায় আমার প্রত্যয় হইতেছে। আমার জন্য না হৌক, তাঁহার অবস্থাহীন স্ত্রী-কন্যার জন্যও একবার গোপনে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন, কিম্বা আমাকে পত্র লিখিয়া তাঁহার মনের কথা বলিতে পারিতেন। তিনি যখন তাহা করেন নাই, আর তাঁহার পত্নীও জনরবে বিশ্বাস করিয়া, বিধবার মত আচরণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে আমরা মৃতের সামিলই করিয়া লইয়াছি। এখন তাঁহার সহসা আবির্ভাব, যেন দৈব ঘটনার মত। সাতদিন পরে আমিই না হয়, শিবরামপুরের মন্দিরে তার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিব। সনাতন সত্য বলিতে কি, যতক্ষণ না তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি, ততক্ষণ আমার কিছুতেই সুদৃঢ় প্রত্যয় হইতেছে না।"

সনাতন বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আমি যদি এ সম্বন্ধে প্রতারিত না হইয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসী সে রমাপ্রসন্ন—তাহাতে কোন সন্দেহই নাই!"

হেমেন্দ্র বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন—"এখন হেমরাণীর উদ্ধারের জন্য করা যায় কি? এখনই বিশজন লাঠিয়াল পাঠাইয়া আমি হেমরাণীকে উদ্ধার করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।"

সনাতন বলিল—"রাঙ্গাবাবু! আমি আপনার ভৃত্য—দাসানুদাস। আমি যদি কোন কথা বলি, আর সেটা যদি শুনিবার যোগ্য হয়, তাহা আপনি নিশ্চয়ই শুনিবেন। অন্ততঃ হেমরাণীর পিতার ফিরে আসা পর্য্যন্ত, এই সাত দিন কাল আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। তিনি কি সংকল্প লইয়া সেখানে গিয়াছেন, তাহা ত আমরা ঠিক জানি না। হয় ত আমাদের এই তাড়াতাড়িতে তাঁর উদ্দেশ্য হানি হইতে পারে।"

হেমেন্দ্রকুমার মনে মনে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া এই কথাটার আলোচনা করিয়া বুঝিলেন—সনাতন যাহা বলিতেছে, তাহাই যেন এ ক্ষেত্রে ঠিক।

তখনকার মত এই ব্যাপারের এইরূপ নিষ্পত্তি হইল। সনাতনকে হেমেন্দ্রবাবু বলিলেন—"এই কয় দিন তুমি রাত্রিকালে, হেমরাণীর বাটীতেই শয়ন করিবে। দিনের বেলা বাটীর দ্বারে যেমন চাবি দেওয়া থাকে, সেইরূপ করিও। রাত্রে রতন পাইক—তোমার সঙ্গে থাকিবে। এর মধ্যে কোন কিছু নূতন ঘটনা ঘটিলে, আমাকে তখনই জানাইবে। খুব সাবধানে থাকিও।"

সনাতন বলিল—"হুজুরের উপদেশ পালন করিতে এ সনাতন কখনই গাফিলি করে নাই। রতন আমার সঙ্গে থাকিলে খুবই সুবিধা।"

হেমেন্দ্রবাবু—নীলুখুড়োকে বলিয়া দিয়াছিলেন—"লোকে অবশ্য এ সম্বন্ধে খুব কৌতুহলী হইয়া, আপনাকে হেমরাণীর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিবে। আমি জানি, শিবরামপুরের এক ক্রোশ দক্ষিণে দুর্গাপুরে রমাপ্রসন্নের এক দূর সম্পর্কীয়া শ্যালিকা আছেন। আপনি এই কথাটা প্রচার করিয়া দিবেন—হেমরাণী এই বিপদে বড়ই বুকভাঙ্গা হইয়া পড়ায়, আমি নিজে তাহাকে তাহার মাসীর বাড়ীতে পৌছিয়া দিয়াছি। আপনাকে এ গ্রামের লোক মুরুব্বি বলিয়া মান্য করে। সুতরাং আপনার কথায় কেহই অবিশ্বাস করিবে না। আপনার সঙ্গীদেরও এ সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিবেন।"

নীলুখুড়ো ফিরিয়া আসিয়া দুই চারিজন প্রতিবাসীর, অদম্য কৌতুহল

নিবৃত্তির জন্য, এইরূপ একটা জনরব প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন। আর এই জনরবটা আগুণের হল্‌কার মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

রমাপ্রসন্নের মিত্রপক্ষীয়গণ, এই সংবাদ শুনিয়া হায়-হায় করিতে লাগিল। আর শত্রুপক্ষ যাহারা, তাহারা মনে মনে বলিল—দিন কতক পয়সার মুখ দেখিয়া, লোকটা যেন ছোট খাট আমীর হইয়া পড়িয়াছিল। এখন মেয়েটা যে কোথায় দাঁড়ায়, তার পথ নাই।

সংসারের গতিকই এই। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

(৪৭)

আমেদপুরের জমীদারী কাছারীর পাশ দিয়া দামোদর নদ প্রবাহিত। দামোদরের তীরেই এই কাছারি ও তৎসংলগ্ন বাগান বাড়ী।

বড়তরফেরও এখানে কয়েকটী পত্তনী ও দর-পত্তনী ছিল। এজন্য হেমেন্দ্রকুমারও ছোট-তরফের মত, এখানে এক কাছারি-বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাগান বাড়ী ছিল না।

শ্মশান-ঘাটের নিকটে যে নদীর তীরে ডাকাতি হইয়াছিল, সেটী দামোদরের একটী ক্ষুদ্র শাখা মাত্র। সমস্ত রাত্রি জোরে নৌকা চালাইয়া, প্রত্যুষের পূর্ব্বে, আমেদপুরের বাগান বাড়ীর ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগিল।

রুদ্ররাম তাহার প্রভুর আদেশে ক্লোরোফরম শুঁখাইয়া, হেমরাণীকে অচেতন করিয়া রাখে। মধ্যে হেমরাণীর একটু চেতনা সঞ্চার হওয়ায় হৃদয়হীন রুদ্ররাম, আবার তাহাকে এই মোহকরা ঔষধের সহায়তায়, অচেতন করিয়া ফেলে। সেই মূর্চ্ছা—তখনও ভাঙ্গে নাই।

নদীর দিকে বাবুদেরই একটী ক্ষুদ্র বাঁধা ঘাট ছিল। রুদ্ররামের আদেশে মাঝিরা এই ঘাটেই নৌকা ভিড়াইল। বলাবাহুল্য, এই আট জন মাঝি আটজন লাঠিয়াল বই আর কিছু নয়। দাঁড় চালাইতে, আর লাঠি ধরিতে, উভয় কাজেই তারা অভ্যস্ত।

রুদ্ররাম, তারামণি ও দুইজন মাঝি, ধরা ধরি করিয়া হেমরাণীর মূর্চ্ছিত দেহ বাগানের মধ্যে আনিল।

বাগানে একজন উড়ে মালি ও এক ভৃত্য ছিল। তখনও প্রভাত হয় নাই। বালার্ক-কিরণ প্রকৃতির বুকে তখনও স্বর্ণপ্রভা বর্ষণ করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। সুতরাং সেই বাগানে যে তিনটী জীব ছিল, তাহাদের কেহই শয্যাত্যাগ করে নাই। মনিব অনেক রাত্রে বাগানে আসায়, তারা সারারাত জাগিয়া ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে।

রুদ্ররাম, হেমরাণীর মূর্চ্ছিত দেহ লইয়া, নীচের এক ক্ষুদ্র কক্ষে শয্যার উপর স্থাপন করিল। তখনও তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গে নাই। মনিবও তখন নিদ্রিত। তাহাকে জাগাইয়া দেওয়া, আর বাঘের ঘুম ভাঙ্গান একই কথা। সুতরাং শয়তান রুদ্ররাম, তারামণিকে বলিল—"তারা! তুই এই ঘরে থাক। একে চৌকী দে। আমি একবার মনিবকে জাগিয়ে খপরটা দেবার চেষ্টা করি।"

তারামণি, শয্যার উপর রক্ষিত হেমরাণীর সেই স্পন্দহীন দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"বলি নায়েব মশাই! তুমি ঐ বিষটা বেশী পরিমাণে একে শোঁকাও নি'ত? নৌকোতে তবু ওর হাত পা নড়ছিল। শ্বাস প্রশ্বাসটা জোরে বইছিল। এখন যেন একেবারে মরার মত নিঃসাড় হয়ে আসছে। আমার বড় ভয় কচ্ছে।"

"থাম্ মাগী থাম্"—বলিয়া হেমরাণীর শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কিয়ৎক্ষণ হতভম্বের মত একদৃষ্টে তাহার শববর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, নাসাগ্রে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া রুদ্ররাম দেখিল—শ্বাসপ্রবাহ অতি মৃদুভাবে বহিতেছে।

পাছে হেমরাণী জাগিয়া উঠে, এই ভয়েই রুদ্ররাম অতিরিক্ত বুদ্ধি খরচ করিয়া সেই সাংঘাতিক বিষ হেমরাণীকে দ্বিতীয়বার শোঁকাইয়াছিল। এজন্য সে বড়ই ভয় পাইল। মনিবের ত এরূপ উপদেশ ছিল না।

রুদ্ররামের বিশুষ্ক মুখ দেখিয়া তারামণি বলিল—"ব্যাপারটা কি বুঝছো বল দেখি নায়েব মশাই? সব ফরসা হয়ে যাবে না ত!"

রুদ্ররাম বলিল—"ঠিক ত বুঝতে পাচ্ছিনি! ভাল এক নচ্ছার কাজে হাত দিয়েছিলুম!"

আর তারামণিও সমস্ত রাত্রি হেমরাণীর শয্যাপার্শ্বে ঠায় বসিয়া থাকিয়া, বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল—"আমাদের আর দোষ কি নায়েব মশাই? ওকে আমরা ত এখানে প্রাণ শুদ্ধ পৌঁছে দিয়াছি। আমাদের ঝুঁকি এইখানেই শেষ। এখন মনিবের কাজ মনিবই করুক।"

রুদ্ররাম মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"চুপ কর তুই! ভারি বুদ্ধি তোর! ছুঁড়িটা যদি মরে যায়, তখন একটা মহা ঝুঁকি আমাদের দু'জনের ঘাড়েই চাপ্‌বে। মনিব যে কি শয়তান—তাতো জানিস্‌। শেষ সাফ্‌ স'রে দাঁড়াবে, আর খুনের দায়ে তুই আর আমি ফাঁসে যাবো!

তারামণি সভয় চিত্তে বলিল—"বল কি—নায়েব মশাই! খুনের দায়? কি সর্ব্বনাশই কল্লে তুমি বাবু! আমি মেয়ে মানুষ, অত শত কি জানি বল। চল আমরা এখান থেকে সরে পড়ি।"

তারামণির এই অসার যুক্তিটা শুনিয়া রুদ্ররাম বলিল—"সরেই বা যাবি কোথায়! মনিবের চোখের আড়াল হতে পারিস। কিন্তু পুলিসের হাত থেকে এড়ান শক্ত কথা। ওসব পাগলামি ছেড়ে দে। এখন একটা কাজ করতে পারিস তুই তারামণি?"

তারামণি। কি কাজ?

রুদ্ররাম। বাবুর ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিতে পারিস?

তারামণি। খুনের দায়ে পড়ার চেয়ে সেটা আমি খুব সহজ কাজ বলে মনে করি।

তারামণি এই কথা বলিয়া, ধীরে ধীরে নিদ্রিত সুরেন্দ্রকুমারের কক্ষে

প্রবেশ করিল। দ্বারের কাছে টেবিলের উপর, জার্ম্মান-সিল্‌ভারের একটা ছোট জগ্‌ ছিল। সেটা সহসা তাহার অঁাচল লাগিয়া মাটিতে পড়িয়া যাওয়ায় তাহার শব্দে সুরেন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চমকিয়া উঠিয়া, নিদ্রা ও জাগরণের মাঝখানে থাকিয়া, জড়িতস্বরে বলিল—"কেও ?"

তারামণিকে আর স্বতন্ত্র চেষ্টা করিয়া, সুরেন্দ্রবাবুকে জাগাইবার চেষ্টা করিতে হইল না। সুরেন্দ্র তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া বলিল—"ব্যাপার কি তারা ? তোর মুখ অত শুখ্‌নো কেন ? তোরা কখন এসেছিস্‌ ? খবর ভাল ত ?"

তারামণি এতগুলি ব্যাকুল প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দেওয়া অসম্ভব ভাবিয়া, হেমরাণী সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার সুরেন্দ্রকে খুলিয়া বলিল। সব কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র বিমর্ষমুখে বলিল—"আমি জানি, ঐ রুদ্ররামটা একটা আস্ত—ষ্টুপিড্‌। ওর মাথায় একেবারে গোবরভরা। আমি বলেছিলেম, একটীবার মাত্র ওই ঔষধ-মাখানো রুমালটী শুঁকিয়ে দিও। তাতে পাঁচ ছয় ঘণ্টা অচেতন হয়ে থাক্‌বে। তা নয়—তার উপর নিজের বুদ্ধিতে একটা বাহাদুরী করা হয়েছে। চল দেখি গিয়ে ব্যাপার কি ?"

হেমরাণীর কক্ষে আসিয়া সুরেন্দ্র দেখিল, শুভ্র শয্যা আলো করিয়া এক বিদ্যুৎপ্রভাময়ী স্বর্ণপ্রতিমা শুইয়া আছে। তাহার কেশপাশ এলায়িত। চাঁদকে মেঘে ঢাকিলে যেমন হয়, মুখে ঠিক সেইরূপ একটা মলিন ভাব। মুদিত নেত্র। অতি মৃদুস্পন্দিত উরস। তাহার মনে পাপ—কাজেই হেমরাণীর পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে তাহার যেন একটা সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। মূর্চ্ছিতার মুখের অবস্থা, শ্বাস-প্রশ্বাসের ভঙ্গী ইত্যাদি সবই গোলমেলে !

সুরেন্দ্রকুমার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তাই ত। দেখিতেছি, আর এক মহা বিপদে পড়িলাম। এই অজ্‌ পাড়াগাঁয়ে, ভাল ডাক্তারই বা পাই কোথায় ?"

সহসা তাহার মনে হইল, এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে একজন অ-পাশ-করা, শতেকমারা ডাক্তার আছেন। তাঁহাকে আনাইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য, সুরেন্দ্র নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। মুখহাত ধুইয়া, স্নানান্তে মগজ ঠাণ্ডা করিয়া, একটু চা পান করিয়া, সুরেন্দ্র ব্যস্তভাবে একখানি চিঠি লিখিয়া একজন পাইককে পত্র লইয়া যাইবার সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে তারামণি আসিয়া সংবাদ দিল,—"বাবু ছুঁড়ীটার জ্ঞান হইয়াছে। এখন বেশ সহজ লোক।"

তারামণির আনীত এ সংবাদে, সুরেন্দ্রকুমারের প্রাণের অর্দ্ধেক বোঝা নামিয়া গেল। হেমরাণী যে কক্ষে ছিল, তার পার্শ্বেই আর একটী ক্ষুদ্র কক্ষ। সুরেন্দ্রকুমার এবার চেতনাপ্রাপ্ত হেমরাণীর সম্মুখে না গিয়া, সেই কক্ষমধ্যে লুকাইয়া তাহার অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখিয়া, তারামণিকে অস্ফুট স্বরে বলিল—"একটু গরম দুধ পাঠাইয়া দিতেছি। সে টুকু খাওয়াইয়া দিলে, অনেকটা সুস্থ হইবে। উপস্থিত তাই করগে যাও। এক ঘণ্টা বাদে আবার আমাকে খপর দিও।"

তারামণিকে বিদায় দিয়া, সুরেন্দ্র এক মহা ভাবনার মধ্যে পড়িল। এই ব্যাপার লইয়া এতক্ষণে দেবানন্দপুরে যে একটা হুলস্থূল ঘটিয়াছে, তার আর কোন সন্দেহই নাই। কেননা সে যাহা করিয়াছে, সেরূপ পৈশাচিক কাজ, আর কেহ কখনও করে নাই।

সুরেন্দ্র তাহার ভৃত্যকে বলিল—"শীঘ্র নায়েব-মশাইকে এখানে পাঠিয়ে দে।"

আহ্বানমাত্রেই রুদ্ররাম হুজুরে হাজির হইয়া, গরুড়ের মত যুক্তকরে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"হুজুর—কি স্মরণ করিয়াছেন আমাকে?"

সুরেন্দ্র বলিলেন—"হাঁ—তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে। তোমার আর এখানে থাকিবার দরকার নাই। এখানকার ব্যাপার আমিই সামলাইয়া

লইব। তুমি রামানন্দপুরে ফিরিয়া যাও। আর দেবানন্দপুরে একজন বিশ্বাসী গোয়েন্দা পাঠাইয়া, সংবাদ সংগ্রহ করিবে—কে কি বলিতেছে! আর সে সংবাদ আমাকে রেজেষ্টারী চিঠিতে জানাইবে।”

এত কাণ্ড করিবার পর, রুদ্ররাম মাত্র ঘণ্টাকয়েক হইল আমেদপুরের কাছারিতে পৌঁছিয়াছে। তখনও তাহার স্নানাহার পর্য্যন্ত হয় নাই। কেননা পৌঁছিবার পরই সে হেমরাণীকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল।

মনিবের এই জরুর হুকুম শুনিয়া, সে মনিবকে, আর তার এই নচ্ছারী চাকরীকে, মনে মনে শতবার ধিক্কার দিয়া বলিল—“হুজুরের গোলাম আমি। যা হুকুম করিবেন, তাহাই করিব।”

সুরেন্দ্রকুমার। কিন্তু এ কথাটা যেন তোমার মনে থাকে, যে এই হেমেন্দ্র আমার দারুণ জ্ঞাতিশত্রু। সে এই ব্যাপারটা লইয়া কোন কিছু গোলযোগ পাকাইতেছে কিনা—তাহারও সংবাদ তোমায় রাখিতে হইবে।

রুদ্ররাম। সে বিষয়ে কোন গাফিলিই হইবে না।

সুরেন্দ্র। তোমার তহবিলে কিছু টাকা আছে—আর আমি তোমায় আরও একশো টাকা দিতেছি। টাকার মায়া করিও না। আমি চাই মান—ইজ্জত—প্রতিষ্ঠা। এটা যেন তোমার সর্ব্বদা মনে থাকে।

“নিশ্চয়ই থাকিবে” বলিয়া রুদ্ররাম টাকা কয়টি লইয়া চলিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া একটু হাঁফ ছাড়িয়া বলিল—“যে কাজ করিয়াছ, তাহাতেই তোমার মানের দর্পের মর্ম্ম বুঝিয়া লইয়াছি। আমি ত এত বড় একটা শয়তান—কিন্তু তুমি মহাবিপদের সময়ে এক অসহায়া নারীর ইজ্জতকে বিপদাপন্ন করিয়া এক কীর্ত্তি রাখিলে। যে দিন দেখিব—তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, সেই দিন বুঝিব তোমার প্রকৃত ইজ্জত বজায় হইয়াছে।”

যে নৌকায় হেমরাণীকে আনা হইয়াছিল, সে নৌকা সুরেন্দ্রের

নিজের। তাহা তখনও ঘাটে বাঁধা ছিল। রুদ্ররাম তাড়াতাড়ি স্নানটা সারিয়া, কাপড় ছাড়িয়া নৌকায় উঠিল। রুদ্ররাম এত ঝটিতি আমেদপুরের কাছারি হইতে চলিয়া গেল, যে তারামণি তাহা জানিবার অবসরও পাইল না। কেননা সে তখন অভাগিনী হেমরাণীর খিজমৎ করিতে খুবই ব্যস্ত।

(১৮)

রাণীর শরীরটা—তাহার চেতনালাভের সঙ্গে সঙ্গেই, অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে। শরীরের সুস্থ অবস্থার সহিত, তাহার মনে অতীত রাত্রের সমস্ত কথা জাগিয়া উঠিল। সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"আমাকে তোমরা কোথায় আনিয়াছ ?"

তারামণি অতি সহজভাবে বলিল—"তোমার কোন ভয় নাই মা ! তুমি নিরাপদ স্থানেই আছ।"

হেমরাণী। তুমি কে ?

তারামণি। যে বাবু তোমাকে ডাকাতের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—আমি তাঁর বাড়ীর ঝি।

হেমরাণী। তোমার বাবুর নাম কি ?

তারামণি। তাঁর নাম সুরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী। তিনি একজন মস্ত জমীদার !

হেমরাণী। রামানন্দপুরের জমীদার সুরেনবাবু ?

তারামণি। হাঁ—তিনিই তোমার উদ্ধার কর্ত্তা !

হেমরাণী। সত্যই কি আমাকে ডাকাতে ধরিয়াছিল ?

তারামণি। ওমা—ডাকাত বলে ডাকাত ! কে জানে তারা কোথা থেকে, তোমায় লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার বাবু নৌকা করে এই কাছারিতে আস্‌ছিলেন। তোমাদের নৌকাখানাকে জোরে যেতে দেখে, তিনি

বল্লেন—নৌকো থামাও। তারা নৌকা থামিয়ে পিস্তলের আওয়াজ কল্লে। আমাদের বাবুর শিকারে ভারি সখ। ভাগ্যে তাঁর কাছে একটা দোনালা বন্দুক ছিল! তিনি সেইটের আওয়াজ কর্ত্তেই, ডাকাতেরা বেগতিক দেখে নৌকা থেকে ঝুপঝাপ করে জলে লাফিয়ে পড়লো। তারপর আমার বাবু আর তাঁর লোকজন গিয়ে, তোমাদের নৌকাখানাকে ধরে, তোমায় উদ্ধার কল্লেন। তখন তোমার হাত মুখ বাঁধা। তুমি ভয়ে মুচ্ছো গিয়েছ! ও-মা! সে কি একটা সর্ব্বনেশে ব্যাপার!

হেমরাণী তারামণির বলিবার ভঙ্গীতে, কথাটা যেন প্রকৃত বলিয়া মনে করিল। সে বলিল—"ভগবান তোমার বাবুর মঙ্গল করুন। কিন্তু বাছা—আমি এর কিছু টের পাইনি!"

তারামণি দেখিল, যে ঔষধ ধরিয়াছে। কাজেই সে মহোৎসাহে বলিল—"কি ক'রে তুমি টের পাবে মা? তুমি তখন অঘোর অচৈতন্য। সমস্ত রাত্রির পর এত বেলায় তোমার চেতনা হয়েছে। এর ভেতর কত ডাক্তার-বদ্দি এল—কত কি হ'ল! আমার বাবু তোমার জন্য কি কম টাকাটা খরচ করেছেন? আচ্ছা তোমাকে ডাকাতরা ধল্লে কোথা থেকে? তোমার সঙ্গে কি কেউ ছিল না?"

তারামণির মুখে এই অদ্ভুত উপন্যাস শুনিয়া, হেমরাণী তাহার কথা গুলা ধ্রুব সত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া লইল। সেও তাহার মাতার মৃত্যুর পর হইতে শ্মশানে আগমন পর্য্যন্ত, সব কথাই এক নিঃশ্বাসে তাহাকে বলিয়া ফেলিল।

তারামণি রান্না ঘর হইতে একবাটী দুধ আনিয়া বলিল—"একটু দুধ খাও। তা হ'লে চট্ করে সামলে উঠ্‌তে পারবে। বাবু তোমার জন্য এই দুধটুকু পাঠিয়ে দিয়েছেন! অনেক বাড়ীতে ঝি-গিরি করে এসেছি, কিন্তু এমন উঁচু মেজাজ মনিব—আর কোথাও দেখিনি মা। তুমি তাঁর কেউ নয়, তবু তিনি তোমার জন্য না কল্লেন কি? তাঁব নৌকোতে যদি

বন্দুকটা না থাক্‌তো, ডাকাতরা হয়ত তাঁকেই গুলি করে মেরে ফেল্‌তো। এখন নাও মা, লক্ষ্মী মেয়ের মত এই দুধ টুকু খেয়ে নাও।"

হেমরাণী বলিল—"ঝি! সব কথাই ত তোমায় বলেছি। আমার এখন অশৌচ অবস্থা। স্নান না করে আমি কোন কিছু কর্ত্তে পারিনি!

তারামণি ভাবিল—কথাটাও ঠিক বটে। সে বলিল—"তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি একবার বাবুর কাছ থেকে জেনে আসি, তোমার শরীরের এ অবস্থায় স্নানটা করা উচিত কিনা?"

তারামণি চলিয়া গেলে রাণী মনে মনে বলিল—"এ বল্‌ছে এই বাবুর ঝি! একে আমি যেন কোথায় দেখেছি, ব'লে বোধ হচ্ছে। দেখি ও মাগী কোথায় গেল? কে জানে আমার মনে একটা ভয়ানক সন্দেহ হ'চ্ছে।"

সেই ঘরের পার্শ্বে আর একটী কক্ষ। সুরেন্দ্রকুমার এই কক্ষেই ওৎ পাতিয়া তারামণির ও হেমরাণীর কথা শুনিতেছিল—আর তারামণির বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাহাকে মনে মনে খুব তারিফ্‌ করিতেছিল।

"মন—নারায়ণ।" তার পিতা যখন তখনই এই কথা বলিতেন। হেমরাণী মনে ভাবিল—"ঝি মাগিটা কোথায় গেল, একবার দেখিলে ভাল হইত।"

সহসা পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে মৃদু স্বরে কথোপকথন শব্দ শ্রুত হইল। হেমরাণী সেই দরজায় কাণ রাখিয়া কে কি কথা কহিতেছে, তাহা শুনিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দ্বারটী ভেজান থাকায় সে ঘরের ভিতরের কথাগুলি স্পষ্ট শুনিতে পাইল না।

কিন্তু ভগবান তাহার সহায়। সে দেখিল, সেই দ্বারের এক স্থানে একটী গোলাকার ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। সে সেই ছিদ্র দিয়া দেখিল, সেই ঝি ও তাহার বাবু ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথোপকথন করিতেছে। কথা গুলি সেখান হইতে সে স্পষ্টভাবে শুনিতে পাইল। আর সে তাহার

উদ্ধারকারী এই জমীদার ও তাঁর ঝিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবারও বেশ একটা সুযোগ পাইল।

তারামণিকে তারিফ্ করিয়া সুরেন্দ্র বলিল—"আমি এই ঘরের জানালার পাখীগুলি একটু ফাঁক করিয়া, তোমাদের সব কথাই শুনিয়াছি। তোমার বাহাদুরী আছে তারামণি?"

তারামণি বলিল—"সেটা হুজুরের অনুগ্রহ। এখন ওকে পেড়ে ফেল্‌তে পারি তবে ত? অনেক অনেক সুন্দরী আমি দেখেছি, কিন্তু এমনটী আর কোথাও চ'খে পড়েনি। আমি আপনার চোখ্ দুটীকে বাহাদুরী দিই বাবু! কথায় বলে—বড় লোকের নজর!"

এইরূপ অতিরিক্ত ও অযাচিত প্রশংসাবাদে গর্ব্বে স্ফীত ও আনন্দ মুখরিত হইয়া সুরেন্দ্র বলিল—"এখন খপর কি?"

তারামণি। স্নান না করে দুধ ও কিছুতেই খাবে না, এই জেদ্ ধরেছে।

সুরেন্দ্র। স্নান কর্ত্তে চায় কর্ত্তে দাও। ওকে যে ওষুধটা শুঁকিয়ে এখানে আনা হয়েছে, তার জন্য ওর সর্ব্ব শরীরে একটা অবসাদ এসেছে। স্নানে হয় ত সেটা যেতে পারে। তবে ওকে একা কেটে যেতে দিও না। তুমি সঙ্গে সঙ্গে ঘাট পর্য্যন্ত গিয়ে স্নান করিয়ে নিয়ে এস।

তারামণি চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে সুরেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া, তাহার হাতে দশটী টাকা দিয়া বলিল—"এই নাও তোমার আজকের দুতীগিরির পুরস্কার। ওকে যখন আমার নিজের কর্ত্তে পার্ব্বো, তখন তোমাকে আরও খুসী করে দোব।"

তারামণি দন্তপাতি বিকশিত করিয়া, প্রফুল্ল চিত্তে টাকা কয়েকটী আঁচলে বাঁধিতে লাগিল। তারপর সহাস্য মুখে বলিল—"হুজুরের খেয়েই এ তারামণি মানুষ। আগে ওকে আপনার ক'রে দিই। তারপর আমার পাওনাগণ্ডা যাবে কোথা?"

মেঘমেদুর অম্বরে, সহসা অন্ধকারের ছায়া পড়িলে, তাহা যেমন খুবই মলিন ভাব ধারণ করে, এই সব সাংঘাতিক কথা শুনিয়া, হেমরাণীর মাতৃ-বিয়োগ ব্যথাময় মলিন মুখখানি, আরও মলিন হইয়া পড়িল।

সে মনে মনে ভাবিল—দুঃখের একটা সীমা আছে, দুর্ভাগ্যের একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী আছে। আমার মত অভাগীর কি তাহাও নাই? আমার বিধাতা কি সকলের বিধাতা যিনি—তিনি ন'ন।

সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিল—"ভগবান! বিপদবারণ! এ মহা বিপদে আমাকে রক্ষা কর প্রভু! স্বামী আমাকে বিনাদোষে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও আমি সহ্য করিয়াছি। আমার গর্ভধারিণী এ সংসারে আমায় একা ফেলিয়া গেলেন—তাহাতেও বুক বাঁধিয়াছি। বিদেশে বিঘোরে পিতার অকাল মৃত্যুর শোকও ভুলিয়াছি। কিন্তু যে মহা বিপদ আজ আমার সম্মুখে, তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় করিয়া দাও প্রভু!"

তারামণি তখনই সেই কক্ষে আবার ফিরিয়া আসিবে এই ভয়ে, হেমরাণী দ্রুতপদে সেই দ্বারের কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া শয্যায় শুইল।

তারামণি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমবেদনার স্বরে বলিল—"আবার বিছানায় শুলে কেন গা মা?"

রাণী কাতর ভাবে বলিল—"বড্ড মাথা ঘুরছে! আর বসবার শক্তি হলো না দেখে বিছানায় শুয়ে পড়েছি।"

তারামণি বলিল—"চল তোমায় নাইয়ে আনি গে। না স্নান কল্লে যখন তুমি দুধটুকু খাবে না, তখন বাবু বল্লেন স্নান করিয়েই নিয়ে এস!"

হেমরাণী। তোমার বাবু কোথায়?

তারামণি। তিনি দোতালায় ঘরে বসে, তাঁর জমীদারীর কাজ কচ্ছেন।

হেমরাণী বুঝিল, শয়তানী এই তারামণি ঘোর মিথ্যাবাদিনী। তাহার এই

সময়ে ইচ্ছা হইল, যেন সে বলিয়া ফেলে তাহাদের সকল কথাই সে শুনিয়াছে। কিন্তু তাহার ততটা সাহস হইল না।

রাণী বলিল—"চল তবে স্নান করে আসি।"

তারামণি। তেলটা মাখবে না?

রাণী। আমায় এ অশৌচ অবস্থায়, কি তেল মেখে স্নান কর্ত্তে আছে বাছা!

তারামণি বুঝিল—রাণীর কথা মিথ্যা নয়। সে তাহাকে লইয়া নদীতীরে আসিল। সেই বাগান বাড়ীর পিছনেই দামোদর প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া, ছুটিয়া যাইতেছে!

সৈকতভূমে দাঁড়াইয়া, হেমরাণী অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল। সে মনে মনে সংকল্প স্থির করিল—"আর ওই বাগানে ফিরিব না। এই দামোদরের স্ফীত তরঙ্গ রাশির মধ্যে আমার সকল জ্বালার, সকল ভয়ের, অবসান হইবে। এই রূপ ও যৌবন আমার মহাশত্রু। আজ দামোদরের জলে ডুবিয়া, আমি এই দুই মহাশত্রুকে বিনাশ করিব।"

রাণী যে সৈকতভূমি দিয়া জলে নামিতেছিল, সেখানে কোন বাঁধা ঘাট ছিল না। তারামণি কাদার ভয়ে কষ্ট স্বীকার করিয়া, তীর ভূমিতে নামে নাই। সে একটী মাটীর ঢিপির উপর বসিয়া রাণীর জলে নামা দেখিতেছিল। তাহার মত কলঙ্কিতার মনে তিলমাত্র সন্দেহ জন্মে নাই, যে হেমরাণী জলে ডুবিয়া মরিতে পারে।

এই সময়ে কে যেন রাণীর মনের মধ্য হইতে বলিল—"হেমরাণি! তোমার মত দুর্ভাগ্যবতী আর কেহই নাই। তুমি সংসারে নিঃসহায়, স্বামী থাকিতে স্বামীহীনা, তোমার রূপ যৌবন তোমার মহাশত্রু। কামকলুষিত এক পাপিষ্ঠের নিষ্ঠুর লালসা, লোলজিহবা বিস্তার করিয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত। তোমার মা, তোমার জন্য ঐ মেঘান্তরালে অপেক্ষা করিতেছেন।

তুমি তাঁহার কাছে চলিয়া যাও। ঐ সুনীল মেঘরাজ্যে চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে। সেখানে মানুষের পশুত্ব নাই, অত্যাচার নাই, পীড়ন নাই।”

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে সে জলে নামিতে লাগিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তাহাকে যেন গ্রাস করিতে আসিল। কিন্তু রাণী ইহাতে একটুও ভয় পাইল না। সে তখন আগ্রীব সলিলরাশির মধ্যে।

তীর হইতে তারামণি চীৎকার করিয়া বলিল—“ওগো বাছা! আর বেশীদূর যাইও না। ওখানে ঘুর্ণী আছে! ঐখান হইতেই একটা ডুব দি শীঘ্র উঠিয়া এস!”

তারামণির চীৎকার ধ্বনি হেমরাণীর কাণে পৌছিল। কিন্তু সে শুনিয়াও শুনিল না। সহসা একটা প্রবল ঢেউ আসায়, সে টাল সামলাইতে না পারিয়া, ঘুর্ণায়মান সলিলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া তলাইয়া গেল।

এক্ষেত্রে তারামণি কিছুই করিতে পারিল না। কেননা সে সাঁতার জানেনা। যখন সে দেখিল হেমরাণী আর জল হইতে উঠিল না, তখন সে মলিন মুখে দ্রুতপদে সুরেন্দ্রকুমারের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

সুরেন্দ্রকুমার মনের মধ্যে একটা নূতন স্বপ্ন রাজ্য সৃষ্টি করিয়া, ভবিষ্যতের অতি উজ্জল সুখস্বপ্নে বিভোরচিত্ত ছিলেন, এমন সময়ে তারামণি হাঁফাইতে হাঁফাইতে, সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—“হুজুর! হুজুর! সর্ব্বনাশ হইয়াছে!”

সুরেন্দ্রকুমারের সুখস্বপ্নমাখা অতি যত্নে গড়া সুখচিন্তাগুলি, তাসের বাড়ীর মত তখনই ভাঙ্গিয়া চূরিয়া গেল। সুরেন্দ্র চমকিত চিত্তে, ব্যাকুল ভাবে তারামণিকে বলিল—“ব্যাপার কি তারা? তুই অমন করিয়া হাঁফাইতেছিস্ কেন?”

তারামণি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—“হুজুর! হেমরাণী স্নান করিতে করিতে জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

সুরেন্দ্র ইজি-চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মুখ বাঁকাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"তবে তুই সঙ্গে গিয়েছিলি কি করতে ?"

তারামণি শুষ্কমুখে সজলচোখে নাকি কান্নার সুরে বলিল—"আমি কি করবো বলুন। আমি ক্রমাগতঃ তাকে সাবধান করছি—বেশী জলে যেওনা। ওখানে ঘুর্ণী আছে। তা সে আমার কথা শুনলে কি! এক গলাজলে যেমন নামা, অমনি তলিয়ে যাওয়া।

মুখের গ্রাস অসম্ভব উপায়ে মুখ হইতে খসিয়া পড়িল দেখিয়া, সুরেন্দ্র-কুমার ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া বাহিরে আসিলেন। বাগানে যে সব কৃষাণ কাজ করিতেছিল বা চাকর বাকর ছিল, সবাইকে জড় করিয়া, নদীকূলে আসিয়া বলিলেন—"ঐ ঘুর্ণীর কাছে এক স্ত্রীলোক ডুবিয়া গিয়াছে। যে তাকে জল হইতে তুলিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে দশটাকা বকশীস দিব।"

যাহারা সাঁতার জানিত, তাহারা এই পুরস্কারের লোভে টপাটপ্ জলে পড়িল। তাহারা অনেক সাঁতরাইল, পানকৌড়ির মত অনেক ডুব মারিল, তবুও নিমজ্জিত দেহ খুঁজিয়া পাইল না। সবাই নিরাশহৃদয়ে মলিনমুখে তীরে উঠিয়া আসিল।

তারামণি বলিল—"যখন ডুবিয়াছিল তখনি তখনি এইসব লোক পাইলে হয়ত লাসটা পাওয়া যাইত। স্রোতের টান দেখিতেছেন ত? কোথায় যে ভাসিয়া গেল—কে জানে! এখন করা যায় কি ?"

সুরেন্দ্র মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, তারামণিকে মারিতে উদ্যত হইল। কিন্তু মনে কি একটা ভাবিয়া সে সামলাইয়া গেল। তারপর সে স্থিরভাবে, এক দৃষ্টিতে সেই ঘুর্ণায়মান সলিলরাশির দিকে চাহিয়া রহিল।

তারামণি সুরেন্দ্রকুমারের বিকট দৃষ্টি ও উদাসনেত্রের ভঙ্গী দেখিয়া, একটু ভয় পাইয়া বলিল—"এখন করা যায় কি হুজুর ?"

সুরেন্দ্রকুমার অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে বলিল—"করবো ছাইপাঁশ, আর

তোর মুণ্ডপাত! এটা পুলিস-কেসে দাঁড়াতে পারে। থানায় গিয়ে দেখ্‌ছি ডায়েরী করতে হবে।"

তারামণি পুলিসের নাম শুনিয়া ভয় পাইয়া বলিল—"না—না বাবু! তা করবেন না। পুলিসের জেরা বড় শক্ত ব্যাপার। আমি একবার এক গয়না চুরীর মোকদ্দামায় পড়ে, এ সম্বন্ধে খুবই আক্কেল পেয়েছিলুম। কথায় বলে—বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। ওসব চেপে যান। আপনি নিজেই জড়িয়ে পড়বেন। আমাদের আর কি? এ সব কাজ যখন জেনে শুনেই কচ্চি তখন আমাদের এক পা ঘরে, আর এক পা জেলে। আপনার নাম যশ মান সম্ভ্রম আছে। সেটা ভুলছেন কেন?"

তারামণির কথাটা মনে মনে ভাবিয়া সুরেন্দ্র বলিল—"Damn it—the cursed game! তুই ঠিক বলেছিস্ তারা!" সে তারামণিকে লইয়া কুঠীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল। আর ড্রয়ার হইতে টাকা বাহির করিয়া যে সব লোক হেমরাণীকে উদ্ধার করিবার জন্য আহূত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককে দুইটী করিয়া টাকা বকশীস দিয়া, তাহাদের মুখবন্ধ করিয়া দিল।

(২৯)

নারীর যাহা সর্ব্বস্বধন, তাহা রক্ষার জন্য হেমরাণী জলে ডুবিল বটে, কিন্তু তাহার মৃত্যু হইল না। কথায় বলে—রাখে কৃষ্ণ মারে কে? কথাটা ষোল আনার উপর সত্য। সুতরাং ভগবান তাহাকে আবার বাঁচাইলেন।

সেই সময়ে ঘটনাচক্রবশে, এক ভদ্রলোক সপরিবারে নৌকা করিয়া তাঁহার গন্তব্যস্থানে যাইতেছিলেন। সহসা মাঝিরা হেমরাণীর সেই ভাসমান দেহ দেখিয়া চীৎকার করিয়া ওঠায়, নৌকারোহী ভদ্রলোকটী বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"ব্যাপার কিরে?"

মাঝি তাঁহাকে সেই স্রোতে ভাসমান দেহটীকে দেখাইয়া দিল। আর তিনি

তখনই তাহাদের আদেশ করিলেন—"তোরা এখনি জলে পড়্। যে উহাকে বাঁচাইতে পারিবে, তাকে প্রচুর বকশীস দিব।"

মাঝিরা তখনই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সেই দেহ নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। বাবুটী সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেটি এক পরমা সুন্দরী রমণীর জল নিমজ্জিত দেহ। ভাবিলেন, এটা—দৈব দুর্ঘটনা, না আত্মহত্যা! যাহা হউক আর এ যেই হোক, ইহাকে চেষ্টা করিয়া বাঁচাইতে হইবে। কেননা জীবনের অনেক চিহ্ন তাহার দেহে বর্ত্তমান।

এই ভদ্রলোকটী গম্ভীর প্রকৃতির। কেননা, এই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়াও তিনি কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখাইলেন না। মুখের চেহারা দেখিলে, তাঁহাকে কোন অবস্থাপন্ন পদস্থ লোক বলিয়াই বোধ হয়।

তাঁহার চীৎকার শুনিয়া, তাঁহার পত্নীও নৌকার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনিও নৌকার পাটাতনের উপর এক পরমাসুন্দরী যুবতীর স্পন্দহীন দেহ দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওমা! একি সর্ব্বনাশ!"

বাবুটী বলিলেন—"চুপ কর সুরবালা! ভয় পাইও না। আগে একে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।"

তিনি মাঝিদিগকে আদেশ করায়, তাহারা তাহাদের নিজেদের চলিত প্রথামত চেষ্টা চরিত্র করিয়া, কতকটা জল বাহির করাইয়া দিল। তারপর কৃত্রিম উপায়ে চেষ্টা করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসও আনা হইল। এ সব জলে ডোবার হাঙ্গামে কি করিতে হয়, অনেক নৌকাবাহী সে সম্বন্ধে খুব ওয়াকিবহাল।

বাবুটী মাঝিদের বলিলেন—"আর খানিকটা যাইতে পারিলেই আমরা আরামবাগে পৌঁছিব। সেখানে না গেলে এর কোন উপায়ই হইবে না। আশার কথা এই, যে চাপরাসীরা আমার জন্য ঘাটে গাড়ি প্রস্তুত রাখিবে।"

যথা সময়ে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। বাবুটী তীরে

উঠিবামাত্র একজন আরদালি আসিয়া তাঁহাকে সেলাম করিয়া বলিল—"ব্যাপার কি ধর্ম্মাবতার ?"

এই সদাশয় পরোপকারী প্রৌঢ় বাবুটীর নাম শিবশঙ্কর রায়। তিনি পদ গৌরবে একজন ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট। আরামবাগ সব-ডিভিজান, তাঁহারই চার্জ্জে ছিল।

ডেপুটী বাবু তাঁহার চাপরাসীকে বলিলেন—"রামচরণ! তুই আর একখানা গাড়ী ডাকিয়া আন। এই গাড়ীতে আমরা চলিয়া যাই। তুই সেই গাড়ীতে মালপত্র গুছাইয়া বাঙ্গলোতে লইয়া আয়।"

সেই গাড়ির গদি দু'খানি পাশাপাশি করিয়া, শিবশঙ্কর বাবু হেমরাণীর অচেতন দেহটী তুলিয়া কোন রকমে তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী সুরবালা দেবী, ও শিশুসন্তান হেমশঙ্কর অতি কষ্টে এক ধারে বসিলেন। গাড়ীর ঘোড়া দুটা খুব তেজীয়ান ছিল। ডেপুটীবাবু হুকুম করিলেন—"জোরসে হাঁকাও।" কেননা তখনও অনেকটা পথ তাঁহাদের গাড়ীতে যাইতে হইবে।

অৰ্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তাহারা তাঁহাদের ডেরায় আসিয়া পৌঁছিলেন। মহকুমার হাকিমের থাকিবার আবাসস্থান, সুতরাং বাড়িখানি নিতান্ত ছোট নয়।

শিবশঙ্কর বাবু, একটা প্রশস্ত বায়ু চলাচলপূর্ণ কক্ষে হেমরাণীকে শোয়াইয়া দিলেন। তৎপরে আর একজন চাপরাশিকে একখানা চিঠি লিখিয়া দিয়া স্থানীয় সিবিল-মেডিক্যাল-অফিসারের বাড়ীতে পাঠাইলেন।

শিবশঙ্কর বাবুর তলব পাইবামাত্র তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু এই ডাক্তার বাবু, তাড়াতাড়ি তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"কখন এলেন আপনি? ব্যাপার কি?"

শিবশঙ্কর বাবু মলিনমুখে বলিলেন—এই মাত্র আসছি ভাই। একটা Serious drowning accident চল চল উপরে চল। তারপর আর

...শা বার্ত্তা হবে। দামোদরে এই স্ত্রীলোকের দেহটা স্রোতে ভেসে ...। তাকেই আমরা বাড়ীতে এনেছি।

...ক্তার বাবু উপরে আসিয়া, চেতনা-পরিশূন্য অভাগিনী হেমরাণীর দেহ ... করিয়া বলিলেন—"Danger Stage কাটিয়া গিয়াছে। এখন ... চিকিৎসা প্রয়োজন। কোন ভয় নাই। শিবশঙ্কর বাবু অবসর বুঝিয়া ... সমস্ত ঘটনাই ডাক্তার বাবুকে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন।

...দ কাছেই সিভিল-হস্পিটাল। তখনই প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র আসিল। ...র বাবু আবার উপরে গিয়া, রোগীকে নিজহস্তে ঔষধ খাওয়াইলেন। ...লা এই ডাক্তার বাবুকে দেবরের মত দেখিতেন। মমতাময়ী সুরবালা-... আফ্‌শোষের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"আহা! অতি সুন্দর মেয়েটী। ...ই বাঁচবে ত ঠাকুর পো?"

...ক্তার বাবু বলিলেন—"কোন ভয় নাই বৌ-দিদি! চেষ্টার ত্রুটি হইবে ... তবে এখন ঈশ্বর যা করেন। আপনি একটু নিয়মমত একে ঔষধ খাওয়াবেন। আমার বিশ্বাস, আজ রাত্রের মধ্যেই এর চেতনা হবে।

...ক্তার বাবুর সংক্ষিপ্ত ইংরাজি নাম—এস, পি, মুখার্জ্জি। পুরা ... নাম—শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। চিকিৎসায় তাঁর ভারি সুনাম। ... রোগীর উপর তাঁর খুবই দয়া। আর গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও ... খুব মোটা বেতন পান। তাহা ছাড়া প্রাইভেট্ প্র্যাকটিস্‌ও আছে।

...ই বিচক্ষণ চিকিৎসক যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই হইল। শিব-...বুর গুণবতী পত্নী সুরবালা, সুশিক্ষিতা ও স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী। ... বারটা পর্য্যন্ত জাগিয়া, তিনি নিজেই রোগীকে ঔষধ খাওয়াইলেন—শুশ্রূষা করিলেন। তাঁহার সুফলও খুব শীঘ্র ফলিল। মুমূর্ষু রোগীর ... ফিরিয়া আসিল। চেতনা হইবামাত্রই হেমরাণী চক্ষু মেলিল। সে ...য়ে সেই সজ্জিত গৃহকক্ষের চারিদিকে একবার বিস্মিতের মত চাহিল।

তারপর জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে সকল কথাই জাগিয়া উঠিল। সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"আমি কোথায় আছি ?"

এক স্নেহমাখা বীণা-বিনিন্দিত কোমল স্বরে, কে যেন তাহার শিয়রের দিক হইতে বলিল—"ভয় নাই মা ! তুমি অতি নিরাপদ স্থানে আছ।"

হেমরাণী গ্রীবা ফিরাইবামাত্রই দেখিল—তাহার শিয়রে বসিয়া উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, আয়তলোচনা, মৃদুহাস্য স্ফুরিতাধরা অপূর্ব্ব নারী। সে আয়ত নেত্রযুগলে কতই স্নেহ, কতই করুণা, কতই মমতা।

হেমরাণী সবিস্ময়ে বলিল—"কে তুমি মা ! বিশ্ব-বিমোহিনী, জগদ্ধাত্রী রূপে কে তুমি আমার শয্যা পার্শ্ব আলো করিয়া বসিয়া আছ মা ?"

শিবশঙ্কর বাবুর পত্নী স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন—"এখন আমি তোমার মা। আমরাই তোমাকে জল হইতে তুলিয়া আমাদের বাড়ীতে আনিয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া রাণীর চোখে জল আসিল। তাহার মৃতা জননীর স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। তারপর সেই শ্মশান-মধ্যে ব্যাপার, সুরেন্দ্রকুমারের উদ্যানের সেই ভীষণ চক্রান্তের কথা, সবই মনে পড়ায়, সে ভয় পাইয়া চক্ষু মুদিল।

ডাক্তারবাবু একটী নিদ্রাকর ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। দুধের সহিত ঔষধের সেই পুরিয়াটি খাওয়াইতে হইবে, এইরূপ উপদেশ।

সুরবালা দেবী, দুধের বাটীতে সেই পুরিয়াটি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"মা ! এই ঔষধ টুকু খাও। এতে ঘুম আস্‌বে। ঘুমুলেই তুমি সেরে যাবে।"

হেমরাণী বলিল—"আজ আর দুধ খাবো না।"

সুরবালা স্নেহপূর্ণ তিরস্কারের সহিত বলিলেন—"এটা তোমার জীবন রক্ষার ওষুধ। জীবন রক্ষার জন্যে ন্যায় অন্যায় মানতে গেলে ত চলবে না। আমি তোমার—মা। মার কথার অবাধ্য হ'তে নেই।"

এত স্নেহ! এত মমতা! এত করুণা! এতটা আগ্রহ! এই মৃত ভরস্কারের মধ্যে! হেমরাণী আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না।

সুরবালা ধীরে ধীরে তাহাকে শয্যা হইতে তুলিলেন। সে স্পর্শ যেন ...ের কোমল স্নেহভরা। হেমরাণী সেই ঔষধ মিশ্রিত দুধটুকু খাইয়া ...লেন। আর অল্পক্ষণ পরেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

ইহার পর দিন সে খুবই সুস্থ বোধ করিল। তখন সে এতটা সামর্থ্য ও ...ক্ত পাইয়াছে, যে বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার কক্ষের জানলার কাছে ...াইয়া মুক্ত প্রকৃতির স্নিগ্ধ বাতাস সেবন করিতেছে।

রাণীকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ দেখিয়া, সুরবালা বড়ই একটা আনন্দ লাভ ...রলেন। কৌশল করিয়া রাণীর নিকট হইতে, ক্রমে ক্রমে তিনি তাহার ...ন্তরের কথা গুলি জানিয়া লইলেন। স্বামীকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া, ...রদিন এক পুরোহিত ডাকাইয়া, অশৌচান্তের যাহা কিছু করণীয়, তাহার ...বস্থা করিয়া দিলেন। শিবশঙ্কর নিজে শুদ্ধ শ্রোত্রিয়। এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ...পুটী বলিয়া সাহেবী মেজাজের ডেপুটী নহেন। রাণীর অশৌচান্তের দিন ...টী ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত খাওয়ান হইল। রাণী চোখের জল মুছিতে মুছিতে ...ার শেষকৃত্য করিল।

এ যে অসম্ভব করুণা—অযাচিত দয়া—সুদুর্লভ মহত্ত্ব। হেমরাণী ...জন্য মনে বড়ই একটা তৃপ্তি লাভ করিল। যেমন পতি—তেমনি পত্নী। উদারতায়, করুণায়, স্নেহে, সহানুভূতিতে কে যে বড়—তাহা স্থির করিবার যো ...ই। দেখিতে দেখিতে সুখ দুঃখ ও ভবিষ্যতের চিন্তায়, একটী সপ্তাহ ...িয়া গেল। এই একটী সপ্তাহের মধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে যেটুকু ...কোচ, যেটুকু আপনা আপনি ভাবের অভাব ছিল, তাহাও কাটিয়া গেল।

ঝি চাকর অনেক থাকিলেও, রাণী তাহাদের হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া ...সারের কাজ করে। রান্না ঘরে গিয়া, রসুয়ে-ঠাকুরকে সরাইয়া দিয়া

শিবশঙ্করবাবু যেরূপ তরকারি খাইতে ভালবাসেন, তাহাই সে রাঁধিয়া দে কর্ত্তার আহারের সময় স্বহস্তে তাঁহার ঠাঁই করে, একখানি পাখা লইয়া তাঁর কাছে বসিয়া বাতাস করে। শিবশঙ্কর বাবু ইহাতে বড়ই একটা তৃপ্তি, বড় একটা আনন্দ অনুভব করেন। তিনি তাঁহার পত্নীকে একদিন বলিয়াছিলেন "তুমি চিরদিনই বলিয়া আসিতেছ, যদি তোমার একটী মেয়ে হইত। মেয়ে সাধ তোমার বড় বেশী। এই কুড়োনো মেয়েটী দেখিতেছি—বড়ই মায়া ও আমাদের যখন ছাড়িয়া যাইবে, তখন কি করিবে সুরবালা ?"

আর হেমশঙ্কর! সে পাঁচ বৎসরের বালক। সেও রাণীকে চিনিয়াছে। দিদিমণি বলিতে সে অজ্ঞান। দিদিমণির বিছানায় শুইলে, দিদিমণি ঘুম না পাড়াইলে তার ঘুম হয় না, দিদিমণি খাওয়াই না দিলে, তার ভাল খাওয়া হয় না। দিদিমণির কাছে রূপকথা না শুনি তার রাত্রে সুনিদ্রা হয় না।

আর হেমরাণীও মনে মনে ভাবে—"যেমন স্বামী—তেমনি স্ত্রী। দেবতা ভাগে—দেবীই জুটিয়াছেন। মাতৃত্বের এমন স্নেহময় মূর্ত্তি, আর ত কখন আমি দেখি নাই। আমি যে এঁর অসীম স্নেহযত্নে দিনে দিনে মায়ের শো ভুলিতেছি। আমি যে বহুদিন পূর্ব্বে পিতৃহীন হইয়াছি, এ কথাও এ আমার স্মৃতিপথ হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে।"

একদিন শিবশঙ্কর বাবুর স্ত্রী দেখিলেন, হেমরাণীর হাতে যে দুগা বালা আছে—তাহা পিতলের। তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই কষ্ট হইল তৎপরদিন তাঁহার এ কষ্ট নিবারণের একটা পূর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল।

যে ডাক্তারবাবু হেমরাণীকে বাঁচাইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশ একদিন ডেপুটীবাবুর সপরিবারে নিমন্ত্রণ হইল। কাজের দিনে সুরবালা দে সকাল হইতেই নিজের বাড়ী ছাড়িয়া, অন্নপূর্ণারূপে ঠাকুরপোর সন্তুষ্টি উপস্থিত হইলেন। তিনিই যেন সেই গৃহের কর্ত্রী।

সেই দিন প্রভাতে অর্থাৎ ডাক্তারের বাড়ী নিমন্ত্রণ যাইবার পূর্ব্বে, তিনি রাণীকে বলিলেন—"তুমিও আমার সঙ্গে চল রাণি! ডাক্তার বাবু বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন তোমাকে লইয়া যাইতে। না গেলে তিনি মনে বড় দুঃখ করবেন।"

রাণী বলিল—"তা হ'লে তোমার ঘর আগ্‌লে থাক্‌বে কে মা?"

সুরবালা বলিলেন—"ঘরে থাকবার ঢের লোক আছে। ডেপুটীর বাড়ী হচ্ছে—বাঘের বাসা। এখানে চোরে চুরী কর্ত্তে আসবে না। তোমার না যাওয়াটা ভাল দেখায় না। মা আমি তোমার; আমি যেখানে যাব আমার সঙ্গে সেখানে যেতে তোমার কোন সংকোচ, কোন বাধাই নেই।"

স্নেহ-মাখানো এই মোলায়েম জোরের হুকুমটি অমান্য করিতে হেমরাণীর সাহস হইল না। সুরবালা রাণীকে স্নান করাইয়া তাহাকে একখানি বহুমূল্য জরিপাড় শাড়ী বাহির করিয়া দিলেন। স্বহস্তে তাহার চুল বাঁধিয়া সিন্দুর পরাইয়া দিলেন। তারপর নিজের গহনার বাক্স লইয়া, তাহা হইতে বার গাছি গোখ্‌রি চুড়ী ও এক ছড়া হার বাহির করিয়া, হেমরাণীকে পরাইয়া দিলেন। হেমরাণী ইহাতে বড়ই একটা লজ্জা ও সংকোচ বোধ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কোন আপত্তি করিতে পারিল না।

বুদ্ধিমতী সুরবালা হেমরাণীর মনের ভাব লুফিয়া লইয়া সহাস্যে বলিলেন,—"ডাক্তারবাবুর বাড়ীর সকলেই জানে, যে তুমি আমার মেয়ে! আমার মেয়েকে যখন নিমন্ত্রণে নিয়ে যাচ্ছি, তখন তাকে আমার মেয়ের মতনই সাজিয়ে নিয়ে যাব। যদি এটা করলে আমি একটু সুখ পাই, আনন্দ পাই, তাহাতে বাধা দিবার কোন অধিকার—মাতৃস্নেহের আইনের বিধানে, তোমার যে নাই মা! ভারি দুষ্ট মেয়ে তুমি। যা বলি তাই শোন।"

এইরূপ মুখতাড়া খাইয়া হেমরাণী এ সম্বন্ধে কোনরূপ অসম্মতি জানাইতে পারিল না। সেই সমুজ্জ্বল গিনি-সোনার নির্ম্মিত স্বর্ণালঙ্কারে আর সেই

সুন্দর সাঁচ্চাপাড় কাপড় খানিতে, তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে ফুটিয়া উঠিল।

সুরবালা দেবী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তা এইবার আমার মেয়ের মত তোমাকে দেখিতে হইয়াছে বটে।"

এই অপূর্ব্ব সহানুভূতি, এই মায়া, এই দয়া, মানব হৃদয়ে ভগবৎ প্রেরিত দুর্ল্লভ দান। এগুলি সকলের প্রাণে থাকে না। যাহার থাকে, সে এই দুঃখের ঝঞ্ঝাময় সংসারের ঘোরান্ধকারের মধ্যে প্রদীপ্ত বিদ্যুতের আলো। মানুষের চিরদিন যায় না। আজ যে সুখে হাসিতেছে, কাল হয়ত বিধাতার বিধানে সকলেরই যখন দুঃখের অবস্থা আসিতে পারে, তখন অপরের দুঃখের দিনে এইরূপ একটা সান্ত্বনা ও সহানুভূতিতে কেবল যে পুণ্য লাভ হয় তা নয়, প্রাণে একটা অপূর্ব্ব শান্তি আসিয়া দেখা দেয়। কিন্তু জগতে আজকাল এরূপ মহাপ্রাণ জীব বড়ই কম। সেই জন্য এই দুঃখের সংসারে দুঃখের তীব্রতাও বড় বেশী হইয়া পড়ে।

এ জগতে হেমরাণীর একমাত্র আশ্রয়স্থল কালহস্তে বিচূর্ণিত। পিতা মাতা নাই, স্বামী থাকিতেও নাই। এত দুঃখ কাহারও হইতে পারে না। তবুও এ মহা দুঃখের মধ্যে সে আজকাল মহা সুখী। কেন না এক স্বার্থকলুষ বর্জ্জিত, স্নেহময় সংসারের পুণ্যময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আশ্রয় সে পাইয়াছে। এই কয় দিনেই সে যেন এই পরস্নেহমুগ্ধ, পরদুঃখকাতর দম্পতীর হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ স্থানটী অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে।

হেমরাণী বহুবার মনে মনে ভাবিয়াছে, এখানে আর কত দিন ইঁহাদের গলগ্রহ হইয়া থাকিব? কিন্তু তৎপরক্ষণেই এ কথাটাও তাহার মনের পাশে কঠোর প্রতিধ্বনি করিয়াছে—"সংসারে তোমার কে আছে, যার কাছে গিয়া এতটা শান্তি পাইবে, এতটা নিরাপদ অবস্থায় থাকিবে।"

এক একবার সনাতনের জন্য তাহার মনটা বড়ই চঞ্চল হয়। এজন্য

সুরবালা দেবীকে বলিয়া দেবানন্দপুরে একজন লোক পাঠাইয়া, সনাতনের সংবাদ লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সেই লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"সনাতন তাহাদের নিজ বাড়ীতে নাই। কোন কাজের জন্য বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। আর চক্রবর্ত্তী বাবুদের বাড়ার দোয়ারেও চাবি লাগানো।' কাজেই রাণী নিরাশ হইয়া সনাতনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল।

তবুও একদিন সে খুব সাহসে বুক বাঁধিয়া সুরবালা দেবীকে বলিয়াছিল—"মা! আমাকে দিন কতকের জন্য একবার বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও না।"

একথা শুনিবামাত্রই, সুরবালা একটু কৃত্রিম কোপের সহিত বলিয়াছিলেন, "আমি কি তোমায় চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারিব না? যদি তোমাকে পেটে ধরিতাম, তাহাহইলে না হয় জোর করিতে পারিতাম।" এই আফ্‌শোসের কথাগুলি রাণীর প্রাণে বড়ই তীব্র আঘাত করিয়াছিল। সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিল। এর পর হইতে সে আর কখনও তাহার নূতন মাকে এ বিষয়ে কোন অনুরোধ করে নাই।

আর একটা দৈবপ্রেরিত ঘটনা হইতে, শিবশঙ্কর বাবুর সংসারে রাণীর সব আধিপত্য বাড়িয়া গেল। সেটা আর কিছুই নয়—রাণীর আসার পরেই ডেপুটী শিবশঙ্কর বাবুর বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি এখন ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা আর সমস্ত মহকুমার ভার পাইয়াছেন।

শিবশঙ্করবাবু একদিন তাঁহার পত্নীকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন—"দেখ! আমাদের এই কুড়োনো মেয়েটা দেখ্‌ছি খুব পয়মন্ত! আমি এবার প্রমোশানের আশা করি নি, তবু গবর্ণমেণ্ট অযাচিত ভাবে, আমার পদোন্নতি করে দিয়েছেন। তোমার ত দু'সেট গয়না আছে। রাণীকে যে চুড়ী ও হার পরিয়ে দিয়েছ, তা ওর গায়েই থাক্‌। ওগুলো আর খুলে নিও না।"

সুরবালা দেবী সহাস্যে বলিলেন—"তোমার মত হাকিমের ডিক্রী

ডিস্‌মিস্‌ হবার আগেই, আমি এ সম্বন্ধে নিজেই হুকুম জারি করেছি রাণী কাল রাত্রে আমাকে এই গহনাগুলি তুলে রাখবার জন্য ভারি পীড়াপীড়ি লাগিয়ে দিয়েছিল। আমি একটা ধমক দিয়া বললুম,—"মা হয়ে কি মেয়ের গা থেকে কেউ গয়না খুলে নেয়? এমন অনাসৃষ্টি কথাও ত কোথাও শুনিনি না। ও গুলি—তোমার। যা তোমার অঙ্গে পরিয়ে দিয়েছি, তা কি আর খুলে নিতে আছে। পাঁচজনে মনে করবে কি?"

শিবশঙ্করবাবু পত্নীর হৃদয়ের মহত্বে বড়ই সুখী হইলেন। তিনি সহাস্যে বলিলেন—"হাকিমের হুকুমের উপর হুকুম জারি করা অভ্যাসটা তোমার আজকাল খুবই হয়েছে দেখ্‌ছি।"

সুরবালা মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন—"তোমার মত হাকিমকে আমি এই আঁচলে বেঁধে রেখেছি। তোমার হুকুম মানি বটে, কিন্তু তোমায় এত টুকুও ভয় করিনি!

(২০)

রাণীকে এই পুণ্যময়, স্নেহময়, সুখের সংসারে নিরাপদে রাখিয়া একবার আমাদের সন্ন্যাসী রমাপ্রসন্নের সংবাদ লইতে হইবে।

প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন রমাপ্রসন্ন দেখিলেন, একখানিও নৌকা পাওয়া গেল না, তখন নিরুপায় হইয়া তিনি অগত্যা পদব্রজেই আমোদপুরের কাছারিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেই নদীতীর হইতে আমোদপুরের কাছারি সাতটী ক্রোশ পথ। তিনি পদব্রজেই এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

এদিকে হেমরাণী জলে ডুবিয়া যাওয়ার পর হইতে সুরেন্দ্রর মনটাও খুব দমিয়া পড়িয়াছে। তাহারই বিবেচনার দোষে, কৃতকার্য্যের ফলে একটী অতিসুন্দর ফোটাফুল অকালে বৃন্তচ্যুত হইল; এই চিন্তাটা তাহার মনকে

বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহার মনের প্রধান ভাবনা এই, পাছে এ ব্যাপারে একটা পুলিস-কেস্ হইয়া পড়ে। পাছে কেহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তাহার নামটা এই আত্মহত্যার ব্যাপারের সঙ্গে জড়াইয়া না দেয়।

একদিন অপরাহ্নে সুরেন্দ্র বাগানের দ্বিতলের বারান্দায় বেতের ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় চুরুট টানিতেছে, আর মনে মনে অতীতের কথাগুলি ভাবিতেছে, এমন সময়ে তারামণি নিঃশব্দপদসঞ্চারে, ভয়ে ভয়ে, তাহার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"হুজুর!"

সুরেন্দ্র মুখ ফিরাইয়া দেখিল—তারামণি। ঘৃণায় রোষে জ্বলিয়া সুরেন্দ্র পরুষকণ্ঠে বলিল—"আবার তুই এখানে কি করিতে আসিয়াছিস! তোর কাজ তো শেষ হইয়াছে। এখন তুই বিদায় পাইতে পারিস।"

তারামণির চোখে কুম্ভীরের শোকাশ্রু বহিল। সে হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে মলিনমুখে বলিল—"আমি কি করিব হুজুর! আমার দোষ কি? আমারই তো এ ব্যাপারে বেশ দু'পয়সা হইত। দোষ আপনার নয় আমার পোড়া কপালের। তা আজ আমায় চলিয়া যাইতে বলিতেছেন কেন? এ অপরাহ্নে এই অজানা দেশে আমি একা কোথায় যাইব!"

সুরেন্দ্র তারামণির এই কথায় একটু নরম হইয়া বলিল—"আমি তোকে আজই চলিয়া যাইতে বলিতেছি না। আজ রাত্রিটা তুই এখানে থাক্। কাল সকালে তোর এখান থেকে চ'লে যাবার বন্দোবস্ত ঠিক্ ক'রে দোব। নায়েব রুদ্ররাম তোকে পঞ্চাশ টাকা দেবে—তাকে আমি ডাকে চিঠি লিখে দিয়েছি। তুই আর আমার সুমুখে আসিস্ নি তারামণি! তোকে দেখ্‌লে আমার হেমরাণীর কথা মনে পড়ে, তার অপমৃত্যুর কথা মনে পড়ে, আমার ভীষণ ও নিষ্ঠুর পাপের কথা মনে পড়ে। যে পুণ্যময় বংশে আমার জন্ম, সেই পবিত্র বংশে আমার মত নরাধম যে কলঙ্ক দিয়েছে, সে কথাও মনে পড়ে। আমায় একটু নির্জ্জনে থাক্‌তে দে! ভাবতে দে।

একটু কাঁদতে দে। দু'টো জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রাণের ব্যথাটা একটু কমাতে দে।"

তারামণি সুরেন্দ্রের এই আবেগময়, উচ্ছাসময়, অনুশোচনাময়, ব্যথাময়, কথায় মনে একটু কষ্ট পাইল। সে যেমন নিঃশব্দে সেখানে আসিয়াছিল, সেইরূপ নিঃশব্দে সেই স্থান ত্যাগ করিল।

সন্ধ্যা আসিল। আকাশে তারার দল চিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। স্নিগ্ধ সান্ধ্যবায়ু, সেই বারান্দার উপর দিয়া সুরেন্দ্রের চিন্তাকাতর ললাটদেশ স্পর্শ করিয়া, পার্শ্বস্থ বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল। উদ্যানে কয়েকটা গন্ধরাজ, মালতী ও বেলার গাছ ছিল। তাহাতে অনেক ফুল ফুটিয়াছে। বাতাস সেই সুমিষ্ট গন্ধ চুরি করিয়া চারিদিকে ছড়াইতেছে।

সুরেন্দ্র ভাবিল, সান্ধ্য সমীরণ যেন হেমরাণীর জন্য হায়-হায় করিতেছে। সেই সন্ধ্যাজ্যোতিঃমণ্ডিত আকাশ হইতে জ্বলন্ত তারা গুলা তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে—"ওই—ওই—সেই! যার হৃদয় নাই, প্রাণ নাই, মমতা নাই, বিবেচনা নাই—ওই সেই নিষ্ঠুর নরকুল কলঙ্ক। সে অনুভব করিল, সুবাস ভরা বেলা মল্লিকা চামেলির গন্ধে, যেন শ্মশানের পূতিগন্ধময় ধূম মিশ্রিত। প্রকৃতির বক্ষঃব্যাপী অন্ধকার যেন অতি উৎকট, অতি ভীষণ!

চাকরে ভিতরের কক্ষে সেজের মধ্যে বাতি জ্বালিয়া দিয়াছে। সুরেন্দ্র কি যেন একটা শূন্য, হা-হুতাশময়, জ্বালাময় প্রাণ লইয়া, সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। সে দেখিল, সেজের ভিতরের আলোটা যেন তাহার প্রাণের অনুকরণে মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে।

সুরেন্দ্র দেখিল—ঘরে বাহিরে, বারান্দায়, উদ্যানে, কোথাও তার জ্বালাময় প্রাণের শান্তি ঘটিল না। তাহার প্রাণের জ্বালা শান্তির মহৌষধ তাহার আলমারির বুকে লুকানো ছিল। সুরেন্দ্র ব্রাণ্ডির বোতল বাহির করিয়া, এক পেগ্ খাইল।

ক্রমে, ক্রমে, এক, দুই, তিন করিয়া তিন চারি পাত্র সুরা উদরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহার মস্তিষ্কের বল, প্রাণের প্রসন্নতা, হৃদয়ের সাহস আবার ফিরিয়া আসিল। সে একখানি ইজি-চেয়ারে লম্বমান হইয়া শুইয়া, এই জলমগ্না হেমরাণীর অদৃষ্টের শোচনীয় পরিণাম কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাভিভূত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে স্বপ্নে দেখিল—কে যেন, সেই জলনিমজ্জিতা হেমরাণীকে সলিল-সমাধি হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহার কক্ষ মধ্যে শয্যার উপরে শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে। হেমরাণীর ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ এলায়িত। বসন সলিলসিক্ত, আলু থালু। নেত্র মুদিত, মুখের বর্ণ পাংশুবর্ণ। ওষ্ঠপুট চিরজন্মের মত [illegible]। হৃদয়ে স্পন্দন নাই, দেহে অনুভূতি নাই। সে মরিয়াছে!

সুরেন্দ্র [illegible]তদেহ দেখিয়া স্বপ্নের ঘোরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"হেমরাণি! তোমার এ শোচনীয় অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। বল—বল হেমরাণি! আমার এ কঠোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

সহসা কে একজন গম্ভীর কণ্ঠে তাহার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে কি তাহা আমি তোমাকে বলিয়া দিব।"

এই কঠোর স্বরে সুরেন্দ্রের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তাহার নেশার ঘোর কাটিল না। আল্কোহলের জড়তাময় সুতীব্র শক্তি, তখনও তাহার দেহ মন ও জিহ্বাকে ঘোর মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

সুরেন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র দেখিল তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, এক গৈরিকমণ্ডিত, রুদ্রাক্ষভূষিত, অগ্নিদৃষ্টিময় সন্ন্যাসী।

সুরেন্দ্র মনে মনে বড় ভয় পাইল। সে প্রথমে ভাবিল—এটা স্বপ্নের উৎকট খেয়াল বা দৃষ্টিবিভ্রম। ভাল করিয়া চক্ষু দুটী একবার রগড়াইয়া লইয়া

সে বুঝিল—তাহার ভ্রম নয়, সত্যই এক দীর্ঘাকার ক্ষুদ্র ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

সুরেন্দ্র সভয়কণ্ঠে বলিল—"কে আপনি? কি চান এখানে?"

সন্ন্যাসী বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমি চাই আমার কন্যা হেমরাণীকে!"

সুরেন্দ্র বলিল,—"হেমরাণী? দেবানন্দপুরের রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর কন্যা! সে এখানে আসিবে কেন? আপনি নিশ্চয়ই ভ্রমে পড়িয়াছেন।"

সন্ন্যাসী। না—আমি ভ্রমে পড়ি নাই। তুমিই সত্য গোপন করিতেছ। তুমিই তাহাকে শ্মশান হইতে রুদ্রকান্তের সহায়তায় লুঠ করিয়া এইখানে আনিয়াছ। দাও সুরেন্দ্র—আমার কন্যা ফিরাইয়া দাও।

সুরেন্দ্র সভয়ে বলিল—কে তুমি? তুমি কি সেই রমাপ্রসন্ন? অসম্ভব!

সন্ন্যাসী রোষদীপ্ত নয়নে বলিলেন—"হাঁ আমিই সেই রমাপ্রসন্ন—যাহার কন্যাকে তুমি অতি হীন তস্করের মত অপহরণ করিয়াছ।"

সহসা সেই কক্ষে বজ্রপতন হইলে, সুরেন্দ্র বোধ হয় অতটা চমকিত হইত না। সে জানে রমাপ্রসন্ন বহুকাল মরিয়াছে। এ নিশ্চয়ই কোন বুজরুক। তাহার সহিত চালাকি করিতে আসিয়াছে।

সামলাইয়া লইয়া সুরেন্দ্র বলিল—"রমাপ্রসন্ন ত বহুদিন মরিয়াছে। সত্য বল কে তুমি?"

সন্ন্যাসী। জমীদার সুরেন্দ্রকুমার! আবার বলিতেছি, আমিই সেই রমাপ্রসন্ন। বহুবার তুমি এ জীবনে আমায় দেখিয়াছ, একবার আমার এ মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ দেখি!"

সুরেন্দ্র সত্য সত্যই রমাপ্রসন্নকে এক সময়ে খুব ভালরূপই চিনিত। তাঁহার ভ্রূর উপর একটী গভীর কাটা দাগ ছিল, সহসা সেই দাগটী দেখিয়া সুরেন্দ্র তাঁহাকে তখনই চিনিতে পারিল। সে ভয়ে শিহরিয়া

উঠিয়া বলিল—"সত্যই আপনি রমাপ্রসন্ন! আপনার কন্যা—হেমরাণী? আপনার কন্যা হেমরাণী? সে আজ জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।"

সন্ন্যাসী সরোষে বলিলেন—"তুমি ঘোর মিথ্যাবাদী! তুমি অতি দূষিত চরিত্র! তাহাকে নিশ্চয়ই এ বাগানের মধ্যে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছ, না হয় তাহাকে তুমি অন্য কোথাও সরাইয়া দিয়াছ। অতি হীন পিশাচে যা করিতে পারে না, তুমি তাহাই করিয়াছ। মাতৃশোকাতুরা আমার সেই অনাথা কন্যাকে শ্মশানঘাট হইতে অপহরণ করিয়া রামানন্দ রায়ের নামে, আর পবিত্র রায়বংশে গভীর কলঙ্ক ক্ষেপণ করিয়াছ! শীঘ্র বল—হেমরাণী কোথায়?"

ভয় আতঙ্ক-পীড়িত, মদিরা মোহচ্যুত, সুরেন্দ্রের মাথায় সহসা একটা মতলব আসিল। সে বলিল—"যদি আমি না বলি?"

রমাপ্রসন্ন তাঁহার হাতের ছোট ত্রিশূলটী সুরেন্দ্রের দিকে উত্তোলিত করিয়া বলিলেন—"যে আমার বংশে কলঙ্কারোপ করিয়াছে, আমার এই শাণিত, ক্ষুধার্ত্ত ত্রিশূল, তার শোণিত পান করিবে!"

সুরেন্দ্র সেই শাণিতমুখ ত্রিশূল দেখিয়া ভয় পাইল। সহসা উপস্থিত বুদ্ধিবশে সে বলিল—"আপনি মিথ্যা অপবাদ দিতেছেন! আমি যে হেমরাণীকে অপহরণ করিয়াছি, তাহার প্রমাণ?"

রমাপ্রসন্ন কঠোরস্বরে বলিলেন—"প্রমাণ তোমার ওই শুষ্কমুখ—নষ্ট নেত্র, কম্পিত হৃদয় ও কণ্ঠস্বর। এর চেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমার শ্রীরামপুরের বাগানের বিশ্বাসী খানসামা নবীন—আর পাপিয়সী তারামণি।

তখন আর সুরেন্দ্র কোনমতে অপ্রত্যয় করিতে পারিল না—যে এই সন্ন্যাসী রমাপ্রসন্ন তার কন্যার সন্ধানেই আসিয়াছে। কিন্তু সে ঘোর শয়তান। সহসা দমিবার ছেলে নয়। সে একটু রুষ্ট ভাবে বলিল—"তোমার সাহসকে আমি বাহাদুরী দিই, যে তুমি একাকী এ উদ্যানে, এ গভীর

রাত্রে প্রবেশ করিয়াছ। ভুলিয়া গিয়াছ কি তুমি, যে তুমি একজন ফেরারী খুনী আসামী! পুলিস্ এখনও ওয়ারেণ্ট লইয়া তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে!"

রমাপ্রসন্ন মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন—"তোমার নামে যখন আমি আমার কন্যাহরণ ও ডাকাতির অভিযোগ আনিব, তখনই আমি বাধ্য হইয়া আত্মপ্রকাশ করিব। আগে ত তোমাকে জেলে পাঠাই, তারপর আমিও না হয়, জেলের মধ্যে তোমার পাশের কামরাটা দখল করিয়া বসিব।"

সুরেন্দ্র মনে মনে ভাবিল—"অসম্ভব কিছুই নয়! হেমেন্দ্র ভায়া যখন আমার পরম শত্রু, তখন এরূপ একটা সাংঘাতিক মোকদ্দমা ঘটাও বিচিত্র নয়।"

সুতরাং সুরেন্দ্র ভয় পাইয়া একটু নরম ভাবে বলিল—"ভাল, দেখা যাইবে তখন কিসে কি হয়!"

রমাপ্রসন্ন বলিলেন—"সুরেন্দ্রবাবু! আর আমি সময় নষ্ট করিতে পারি না। সত্য বল—হেমরাণী কোথায়?"

সুরেন্দ্র। ধর্ম্মের দোহাই! হেমরাণী জলে ডুবিয়া মরিয়াছে!

রমাপ্রসন্ন। আত্মহত্যা?

সুরেন্দ্র। বোধ হয় তাই!

রমাপ্রসন্ন। কখন এ কাণ্ড ঘটিল?

সুরেন্দ্র। আজ মধ্যাহ্ন পূর্ব্বে।

রমাপ্রসন্ন তখনও যেন এ কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সুরেন্দ্রের ব্যবহারে তিনি সহিষ্ণুতা হারাইলেন। আত্মগোপনের জন্যই তাঁহার এ সন্ন্যাসীর বেশ। প্রকৃত পক্ষে তিনি শমদম প্রবৃত্তিপূর্ণ সন্ন্যাসী নহেন। সম্পূর্ণ রূপে একজন সংসারী জীব।

তিনি সরোষে বলিলেন—"সুরেন্দ্র যদি নিজের মঙ্গল চাও, ত সত্য কথা বল।

সুরেন্দ্র স্থিরভাবে ও একটু দৃঢ়তার সহিত বলিল—"হেমরাণী জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তুমি তারামণিকে জিজ্ঞাসা করিতে পার!"

রমাপ্রসন্ন তারামণির নামোল্লেখে, গভীর অন্ধকারে যেন একটা আলোকছটা দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন—"ভাল! এই তারামণি এখন কোথায়?"

সুরেন্দ্র মনে মনে ভাবিতেছিল, কোন উপায়ে রাত্রের শেষ কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া দিলেই, সে রমাপ্রসন্নকে পরদিন প্রভাতে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিবে। সুতরাং সে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে বলিল—"তারামণি ত এখানে নাই। সে রামানন্দপুরে তার বাটীতেই আছে।"

রমাপ্রসন্ন সুরেন্দ্রের এ নষ্টামী আর সহিতে পারিলেন না। তিনি তখনই তাহাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিলেন। খুব কাছেই একটা মেহগনি কাঠের টেবিল ছিল। তাহার সরু কাণাটা মাথায় লাগায়, সুরেন্দ্র সটান মেঝের উপর পড়িয়া গিয়া জ্ঞান হারাইল।

রমাপ্রসন্ন দেখিলেন—টেবিলের উপর একটী চব্‌সের তালা রহিয়াছে। তিনি সেই কুলুপটী লইয়া সুরেন্দ্রের কক্ষের দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর নীচে নামিয়া আসিয়া, সেই কুঠীর নিম্নতলে আর যে একটী কক্ষ ছিল, তাহাও তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। কই—কোথায় ত হেমরাণী নাই! আর তারামণিই বা কই? তবে সুরেন্দ্র যাহা বলিয়াছে, তাহাই কি ঠিক?

পার্শ্বের কক্ষে তখনও এক মাটীর দেড়্‌কোর উপর, একটী প্রদীপ মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। তারামণি, এই ক্ষুদ্র কক্ষে এক তক্তাপোষের উপর শুইয়া, নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছে। আলো নিভাইয়া ঘুমানো, তারামণির স্বভাব বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ সেই দিন মধ্যাহ্নেই বাগানের

ঘাটে নদীর জলে হেমরাণী ডুবিয়া মরিয়াছে। এজন্য তাহার বড় ভয়, যে পাছে হেমরাণী ভূত হইয়া তার ঘাড় মটকাইয়া দেয়।

তারামণিকে দেখিবামাত্রই রমাপ্রসন্ন তখনই চিনিতে পারিলেন। তিনি তাহাকে সজোরে নাড়িয়া দিয়া ভীমস্বরে ডাকিলেন—"তারামণি!"

এই ধাক্কা খাইয়া তারামণির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে সভয়ে শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িয়া, চোখ্ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল—"কে আপনি?"

রমাপ্রসন্ন ভীষণ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"আমি তোর যম! তোর মনিব সুরেন রায়কে খুন্ করিয়াছি। এইবার তোর পালা! কিন্তু তোকে হত্যা বা মার্জ্জনা করিবার পূর্ব্বে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

তারামণি ভয়ে কাঁপিতে বলিল—"না—না, আমাকে খুন কর্‌বেন না। আজ আমার চোখের সম্মুখে এক সতীসাধ্বী নিজের ধর্ম্মরক্ষার জন্য, অনায়াসে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। সে বড়ই পুণ্যবতী। এজন্য মরিতে তিলমাত্র ডরায় নাই। আমি মহা পাপিষ্ঠা—মরিতে আমার বড় ভয়।"

রমাপ্রসন্ন। যে ডুবিয়া মরিয়াছে—সে কে?

তারামণি। দেবানন্দপুরের নায়েব রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর মেয়ে—

তারামণি তখনও ছদ্মবেশী রমাপ্রসন্নকে চিনিতে পারে নাই। পারিবার সম্ভাবনাও নাই। কাজেই সে এই ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বড়ই ভয় পাইয়াছিল। তাঁহার জ্বলন্ত নেত্র, রোষপূর্ণ ক্রুদ্ধমূর্ত্তি, তাহাকে বিশ্বাস করাইয়া দিয়াছিল, এই সন্ন্যাসীর অসম্ভব কাজ কিছুই নাই।

রমাপ্রসন্ন সরোষে বলিলেন—"তাহাকে এখানে আনিল কে?"

তারামণি। রামানন্দপুরের জমীদার সুরেনবাবু।

রমাপ্রসন্ন। তুই এখানে আছিস্ কেন?

তারামণি। আমি সুরেনবাবুর দাসী।

রমাপ্রসন্ন বিদ্রূপের সহিত বলিলেন—"দাসী—না—দূতী ? এখন সত্য বল হেমরাণী কোথায় ? মিথ্যা বলিলে তোর গলা টিপিয়া মারিব।

রমাপ্রসন্ন তাহাকে একটু ভয় দেখাইবার জন্য, সত্যসত্যই তাহার গ্রীবার দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। তারামণি ভয় পাইয়া, মাটীতে বসিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"আপনি যা বলেছেন—সত্যই আমি তাই। আমি দূতী! কিন্তু পেটের দায়ে আমাকে এ সব ঘৃণ্য কাজ করতে হলেও এবারে যে পাপ করেছি, তার আর তুলনা নাই—মার্জ্জনা নাই। আমি আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি—হেমরাণী জলে ডুবে গেছে! আহা! বাছার জলে ডোবার ব্যাপারটা মনে ভেবে ভেবে, আজ সারারাত আমি চোখ বুজ্‌তে পারিনি।"

এই কথা বলিয়া তারামণি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, সেই দিন মধ্যাহ্নের সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিয়া ফেলিল। রমাপ্রসন্ন তাহার বলিবার অবস্থা ও অশ্রুপূর্ণ নেত্র দেখিয়া বুঝিলেন, তারামণি মিথ্যা কথা বলিতেছে না।

হেমরাণীর মৃত্যু সংবাদে তাঁর চোখে জল আসিল। তিনি একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"জগদম্বে মা! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

তারপর তিনি সহসা সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া, অন্ধকারে মিশাইয়া গেলেন। তারামণি তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবার কোন অবসর পাইল না। তাহার মনে বোধ হইল, সে যেন একটা কঠোর স্বপ্ন দেখিতেছিল।

এই সন্ন্যাসী বলিয়াছিল—"তোর মনিবকে খুন করিয়া আসিয়াছি।" নিজের প্রাণের ভয়েই তারামণি বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এ কথাটা সে তখন ভালরূপে তলাইয়া বুঝিবার অবসর পায় নাই। কথাটা সত্য কি মিথ্যা, নির্ণয় করিবার জন্য সে তখনই উপরের বৈঠকখানা ঘরে চলিয়া গেল।

এই বাগানবাড়ীটী ছোট ধরণের। উপর নীচে মোটে তিনটী ঘর। সুরেন্দ্র—উপরের বৈঠকখানা ঘরেই থাকিত। নীচে অন্য লোকজন থাকিত। চাকরদের থাকিবার স্থান স্বতন্ত্র।

তারামণি তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া দেখিল—সুরেন বাবুর বৈঠকখানা ঘরে, বাহির দিক হইতে তালা লাগানো। চাবিটী দ্বারের গায়ে, সেই তালাতেই লাগান ছিল।

সে চাবি খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুরেন্দ্রকুমার অচেতন অবস্থায় মেঝের উপর লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছে।

সে তখনই ঠাণ্ডা জল সংগ্রহ করিয়া, সুরেন্দ্রের মুখে চোখে ছিটা দিতে লাগিল। তার পর কিছুক্ষণ বাতাস করায় মূর্চ্ছিত সুরেন্দ্রের চেতনা হইল।

সুরেন্দ্রকে ধরিয়া তারামণি নিকটস্থ এক বিছানার উপরে শোয়াইয়া দিল। ফানুসের মধ্যে বাতিটা তখনও দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, আর রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

সুরেন্দ্র সচকিতে বলিল—"একটা সন্ন্যাসী এখানে এসেছিল। সে কোথায় গেল ?"

তারামণি। সে অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে। আশ্চজ্জি কথা বলবো কি হুজুর! আমিও আজ তার হাত থেকে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি। আপনারও গ্রহবল খুব, তাই আপনিও বেঁচে গেলেন। বাপরে বাপ্— সন্নিসি—না একটা দস্যি! একটা মহা কুগ্রহ!

সুরেন্দ্র একটী নিরাশার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হায়! হায়! যদি তাহাকে কোন র[illegible] করতে পারতাম, তা হলে গ্রহের ফলটা তাকে ভাল করে বুঝাতে [illegible]তুম! যাই হোক, যদি রায়বংশে আমার জন্ম হয়, তবে এ আঘাতের, এ অপমানের, এ লাঞ্ছনার ফল আমি এক দিন ভাল করেই নোব।"

(২১)

শ্রীমতী সুরবালা দেবী—ডেপুটী শিবশঙ্কর বাবুর উপযুক্ত গৃহিণী। শিবশঙ্করের প্রথম জীবনটা খুব কষ্টে কাটিয়াছিল। মাতুলালয়ে থাকিয়া তিনি

অনেক চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। এজন্য যতদিন তাহার মাতুলানী জীবিত ছিলেন, তিনি তাঁহার সাহায্যের জন্য, প্রতি মাসে নিয়মিত রূপে পঞ্চাশটী করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিতেন। মাতুল ও মাতুলানী উভয়েই এখন স্বর্গবাসী। তাঁহাদের সন্তান সন্ততিও হয় নাই।

কলিকাতায় তাঁহাদের এক খানি বাড়ী ছিল। কৃতজ্ঞ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ভাগিনেয় শিবশঙ্কর বাবুকেই তাঁহারা সেই বাড়ী খানি দিয়া গিয়াছেন। আর শিবশঙ্করবাবুও সেই বাড়ী খানিকে উত্তমরূপে মেরামত ও নানাস্থানে নূতন ঘর নির্ম্মাণ দ্বারা, ত্রিতলে পরিবর্ত্তিত করিয়া, তাহার ভোল ফিরাইয়া নূতন করিয়া তুলিয়াছেন। এইটীই এখন তাঁর কলিকাতার আবাস বাটী।

এখন এই বাটীতে শিবশঙ্কর বাবুর দুটী ভাগিনেয় বাস করিতেছেন। তাঁহারা কলিকাতায় মামার বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেছেন। শিবশঙ্কর বাবু নিজে মাতুলাশ্রয়ে পালিত হইয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার ভাগিনাগণও অবশ্য খুব যত্নে পালিত হইতেছেন। শিবশঙ্কর বাবু যখন কলিকাতায় আসেন, তখন এই বাড়ীতেই থাকেন।

শিবশঙ্কর বাবু তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলেন—"আমার পত্নী সুরবালা বড়ই পয়মন্ত। তাঁহার পয়েই আমি এখন এত বড় ডেপুটি।" সুরবালার কাছে তিনি যে এ কথাটা বলিতেন না, তাহাও নয়। কিন্তু সুরবালা স্বামীর এই অযাচিত প্রশংসাবাদে, একটু মুখ টিপিয়া হাসিতেন মাত্র। কোনরূপ গর্ব্ব অনুভব করিতেন না।

সুরবালা—নারী কুলে রত্ন। তাহার রূপ উজ্জল শ্যামবর্ণ। তাঁহার মনটী হীরকের মত উজ্জল। তাঁহার সংসার-জীবন, নারীর হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি গুলির পূর্ণবিকাশে কৌমুদীর মত চির সমুজ্জল। যে সকল দাসী চাকর একবার তাঁহার সংসারে চাকরীতে প্রবেশ করিত, তাহারা কখনই তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইত না। তাহারা নিজেদের দেশ ছাড়িয়া, মনিবের সঙ্গে নানা জেলায়

জল খাইত, তবু অন্যত্র চাকরীর চেষ্টা করিত না। স্বামীর সেবাই সুরবালার জীবনের প্রধান ব্রত। সংসারে তাঁর অধীনস্থ যারা, তাদের সুখস্বচ্ছন্দ বিধান করা, তাঁহার নিত্য করণীয় কর্ম্ম। সর্ব্বদাই তাঁর মুখে হাসি লাগিয়া আছে। দস্তুরমত শিক্ষিতা তিনি। আর এ শিক্ষার জ্ঞান তাঁহার ছিল বটে—কিন্তু জ্ঞানের দর্প তিলমাত্র ছিলনা।

এই সুরবালার জন্যই শিবশঙ্কর বাবুর সংসারে আসিয়া, রাণী শোক দুঃখ সব ভুলিতেছিল। তাহা হইলেও স্মৃতিটাকে ত একেবারে লোপ করা যায় না। এক একবার তাহার মনটা দেবানন্দপুরের সেই নিভৃতপল্লীর শ্যামাঞ্চলে আবৃত, বাস্তুভিটাটীর জন্য বড়ই কাঁদিয়া উঠিত, এক একবার স্বর্গগতা মা'র জন্য তাঁর বুকে মহা ঝড় উঠিত। কিন্তু সুরবালার স্নেহমাখা কথা ও হাসি মুখ দেখিলে, শোকের সে তীব্র ভাবটা খুবই কমিয়া আসিত। সময়ে সময়ে সনাতনের জন্য তাহার মনটা বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িত। কিন্তু হায়! সনাতনের সন্ধানে লোক পাঠাইয়াও যে সে নিরাশ হইয়াছে।

শিবশঙ্কর বাবুর এক গুরুদেব ছিলেন। তাঁর নাম শ্রীমৎ আনন্দ স্বামী। এই বিশাল ভারতের কোন স্থানেই তাঁর নির্দ্দিষ্ট নিবাস ছিল না। বৎসরের মধ্যে নিয়ম করিয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ করাই, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। দেব-নিবাস হিমালয়ের নিভৃত শৈলকন্দর, আর পুরীর সমুদ্রতীর, তাঁহার বড়ই আরামের নিবাস। এই দুটি জায়গায় তিনি কিছু বেশী দিন থাকিতেন। তিনি গৃহত্যাগী। আজন্ম ব্রহ্মচারী। চিরকুমার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। স্বামিজীর গাম্ভীর্য্যময় তেজপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিলেই ভক্তির উদয় হয়। শ্রুতি স্মৃতি বেদ বেদাঙ্গ উপনিষদ পুরাণ উপপুরাণে তাঁর অসীম অধিকার।

কাশীধামে তিনি 'আনন্দাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—এজন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কাশীবাস করিতেও হইত। মোটের উপর—পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। এই সমস্ত

ব্যাপারে তাঁর প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। কিন্তু কোথা হইতে যে টাকা কড়ি আসিত তাহা কেহ জানিত না। সকলের চেয়ে তিনি পুরীর সমুদ্রতীর বড়ই পছন্দ করিতেন। পুরীর শঙ্কর-মঠের নিকটে আর ভুবনেশ্বরে, তাঁহার দুইটী গোপনীয় সাধনকেন্দ্র ছিল। মোটের উপর কথা হইতেছে, সারা বৎসরের ছয়টী ঋতুকে তিনি সমান ভাবে ভাগ করিয়া যখন যেখানে থাকা তাঁহার ইচ্ছা বা প্রয়োজন হইত, সেই খানেই তিনি থাকিতেন।

এই আনন্দ-স্বামীর, অনেক অবস্থাবান উচ্চপদস্থ শিষ্যসখা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালীও ছিল, হিন্দুস্থানীও ছিল। স্বামীজির গমনাগমনের পথে, যে শিষ্যের ডেরা পড়িত, তিনি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। তিনি শিষ্যগণকে সন্তানের মত দেখিতেন। পারত পক্ষে তাহাদের দান গ্রহণ করিতেন না। শিষ্যেরাও জানিত—স্বামিজীর প্রচুর অর্থ আছে। তিনি কাহারও প্রত্যাশী নহেন।

আনন্দস্বামী, ডেপুটী শিবশঙ্কর বাবুকে পূর্ব্বেই তাঁহার আগমন সংবাদ দিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কাজেই শিবশঙ্কর বাবুর সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছাটা বড়ই বলবতী হইয়া পড়িল।

অবশেষে এই প্রত্যাশিত শুভদিনও দেখা দিল। শিবশঙ্কর বাবু সস্ত্রীক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর সহসা আগমনে, এই ভক্তিপরায়ণ দম্পতি, বড়ই একটা আনন্দ বোধ করিলেন।

হেমরাণী স্বামিজীর গম্ভীর ও প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া, মনে মনে বড়ই একটা আনন্দ বোধ করিল। স্বামিজি যখন আহারে বসিলেন—তখন সুরবালা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। হেমরাণী সুরবালার আদেশে, স্বামীজিকে ব্যজন করিতেছিল।

স্বামিজী বারেকমাত্র হেমরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া—সুরবালাকে জিজ্ঞাসিলেন "এটি কে মা সুরবালা ?"

সুরবালা। এটি আমার কুড়ানো মেয়ে!

স্বামিজী। ভাগ্যগুণে অনেকে পথের মাঝেখানে দামী জহরৎ কুড়াইয়া পায়। এ মেয়েটীর লক্ষণ আর রকম সকম দেখিয়া বোধ হইতেছে, এর মধ্যে যেন কিছু সার জিনিস আছে। আর রূপেও দেখ্‌ছি যেন সাক্ষাৎ কমলার মত। দিব্বি মেয়েটী ত মা!

স্বামিজীর এ প্রশংসাবাদে, হেমরাণীর আরক্ত গণ্ডস্থল, যেন শারদীয় স্থলপদ্মের মত লাল হইয়া উঠিল। আত্মপ্রশংসা শুনিবার অনিচ্ছাসঞ্জাত একটা সংকোচভাবের জন্যই, এরূপ ভাব পরিবর্ত্তন ঘটিল।

এমন সময়ে শিবশঙ্কর বাবু আসিয়া স্বামিজীর অদূরে বসিলেন। সুরবালা মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া, সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। আনন্দ স্বামী, তখন আহার শেষ করিয়াছেন। আচমনান্তে মুখশুদ্ধি গ্রহণ করিয়া তিনি শিবশঙ্কর বাবুর সহিত বাহিরের বৈঠকখানায় চলিয়া আসিলেন।

শিবশঙ্কর বাবু বেলা বারটার এদিকে কোর্টে যান না। নবাগত এই যুবতীর সম্বন্ধে সকল কথা জানিবার জন্য, স্বামিজীর মনে কেমন একটা অদম্য কৌতুহল জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন—"শিবশঙ্কর! এ কুড়োনো মেয়েটীকে তুমি কোথায় পেলে?"

শিবশঙ্কর বাবু হেমরাণী সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা, স্বামিজীকে সংক্ষেপে বলিয়া গেলেন। স্বামিজী মৌনমুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"কার মেয়ে বল্লে?"

শিবশঙ্কর। দেবানন্দপুরের বড়-তরফের নায়েব রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর!

স্বামিজী। এই রমাপ্রসন্নের আর কোন সংবাদ তুমি রাখ?

শিবশঙ্কর। শুনিয়াছি, তিনি ইহলোকে নাই। তাঁর কন্যারও অন্ততঃ এইরূপ বিশ্বাস।

স্বামিজী। না—রমাপ্রসন্ন এখনও জীবিত। আমার কলিকাতা থাকিবার

ময়, সে তাহার এই অপহৃতা কন্যা সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্যই, আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছিল। তোমার মত এই রমাপ্রসন্নও আমার একজন শিষ্য। আহা! বেচারা তার মেয়েটীর সন্ধানে উন্মাদের মত চারি দিকে ঘুরিতেছে। কে জানে তার সেই নিরুদ্দিষ্টা জলমগ্না কন্যা, তোমার এখানে দুহিতার আদরে প্রতিপালিতা হইতেছে! একেই বলে ভাগ্য—ভবিতব্য! মা! জগদম্বে! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি নিস্তব্ধভাব ধারণ করিলেন।

তার পর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আনন্দস্বামী বলিলেন—"শিবশঙ্কর! তোমার মন আমি জানি। এ জগতে মানুষের আকারে পশুর ভাগই কিছু বেশী। "নামকো-ওয়াস্তের" দলই বড় ভারি। এজন্য আজ কাল খুব কম লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কর্ত্তব্যের জন্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া, সকল কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে। এলাহাবাদের—বারাণসী প্রসাদ আর তুমি, দেখিতেছি—সাধারণ পথ হইতে যেন বাহিরের গণ্ডীতে থাকিয়া, এ সংসারে কাজ করিতেছ। যাহা হউক এই রমাপ্রসন্ন ও তাহার কন্যা, এখন বিরুদ্ধ গ্রহের সঙ্গে সংগ্রামে নিযুক্ত। এই হেমরাণীর জীবনের ঘটনাগুলি সবই যেন উপন্যাসের ঘটনার মত অদ্ভুত। দেখিতেছি, দিনে দিনে তুমি ইহার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছ। কাজটা কিন্তু ভাল হইতেছে না। মায়ায় পরিণাম হইতেছে দুঃখ। জীবের জন্য ভগবান দুঃখ বলিয়া কোন কিছু স্বতন্ত্র কষ্ট সৃষ্টি করেন নাই। জীব যতই মায়ায় অধীন হয়, ততই সে দুঃখের অধীন হইয়া থাকে। তা এই মায়া, সেই জীবের কোন আত্মীয় সম্বন্ধেই হউক, অর্থ সম্বন্ধেই হউক, আর যাই হউক।"

শিবশঙ্কর একটী মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"যা বলিতেছেন তা সত্য। কিন্তু এর ত কোন আশ্রয় স্থান নাই। করিই বা কি?"

স্বামিজী। উহাকে উহার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দাও।

শিবশঙ্কর। শুনিয়াছি, অভাগিনী হেমরাণী স্বামী পরিত্যক্তা। যতটা আমি শুনিয়াছি, তাহাতে উহার দোষ কিছুই নাই। অমন লক্ষ্মী মেয়ে যে, তার কোন দোষই থাকিতে পারে না।

স্বামিজী। আমারও ধারণা ঠিক তাই। রমাপ্রসন্নের সহিত আমার সাক্ষাতের পুনরায় সম্ভাবনা আছে। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য, তাহার ব্যবস্থা আমি করিব। আমি এ সংবাদও রাখি, যে রমাপ্রসন্নের জামাতাটি অতি হতভাগা। সে অপব্যয়ে তাহার সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছে। যদি সে তার পত্নীকে আশ্রয় না দেয়, তাহা হইলে হেমরাণীর পরের ব্যবস্থা আমিই করিব।

শিবশঙ্কর। আপনি কি তাহা হইলে এখন পুরীর আশ্রমে যেতে সংকল্প কচ্ছেন। আমি বোধ হয় শীঘ্রই পুরীতেই বদলী হব।

স্বামিজী। না। হেমরাণীর শ্বশুর বাড়ী যাওয়া সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত শেষ না করে, আমি কোথাও যাচ্ছিনি। তুমি—যথা সময়ে যেও। আমি পৌছেই তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

স্বামিজীর কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করিয়া শিবশঙ্কর বাবু বুঝিলেন, স্বামিজী যাহা বলিয়াছেন—তাহাই ঠিক। পতির আশ্রয়ই স্ত্রীলোকের আত্মরক্ষার, মানরক্ষার, আবরু রক্ষার, প্রধান দুর্গ। যদি সত্যসত্যই সেই হতভাগা রাসমোহন হেমরাণীকে আশ্রয় না দেয়, তার আশ্রয়স্থানের অভাব ত হইবে না।

সেদিন আর গুরুশিষ্যে কোন কথাবার্ত্তা হইল না। স্বামিজী পর দিন প্রভাতে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

আনন্দস্বামী কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমে কালী দর্শন করিলেন। তার-পর ভবানীপুরে তিনি তাঁহার এক শিষ্যের বাসায় উঠিলেন। পুর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেক বড় বড় লোক আনন্দস্বামীর শিষ্য-দল-ভুক্ত। তাঁহার

ভবানীপুরের এই শিষ্যটী, কলিকাতা হাইকোটের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। তাঁহার অবস্থাও খুব উন্নত। রমাপ্রসন্নও দুই একবার আনন্দস্বামীর সঙ্গে, এই উকীলবাবুর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং এস্থান তাঁহার পক্ষে অপরিচিত নহে। আনন্দস্বামীর পূর্ব্ব উপদেশ অনুসারে, তিনি এই উকীল বাবুর বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। এই উকীল বাবুটী এখনও জীবিত। এজন্য তাঁহার নামোল্লেখে আমরা এস্থলে বিরত থাকিলাম।

আনন্দস্বামী একদিন নির্জ্জনে এই উকীল বাবুর বাড়ীতে রমাপ্রসন্নের সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় এই হেমরাণী।

আনন্দস্বামী বলিলেন—"রমাপ্রসন্ন! তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার কন্যা মরিয়া বাঁচিয়াছে। সে শিবশঙ্কর বাবুর সংসারে কন্যার মত আদরে পালিত হইতেছে। কিন্তু একটা কথা আমি খুবই ভাবিতেছি। তাহার স্থির মীমাংসাও করিয়াছি। কিন্তু তাহা তোমার সম্মতি সাপেক্ষ।"

রমাপ্রসন্ন। আমি চিরদিন আপনার আজ্ঞাবহ দাস। আপনি যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই আমার করণীয়। আপনার সমীচিন বিবেচনার উপরে গিয়া কাজ করি, এমন শক্তি ও বুদ্ধি আমার নাই। এ ক্ষেত্রে আপনার মীমাংসাটা শুনিতে পারি কি?

আনন্দস্বামী। পিত্রালয়ে খুব বেশী আদরে পালিত হওয়ায় নারীর যে সুখ, স্বামীগৃহে অনাদরে থাকিলেও বোধ হয় তার চেয়ে বেশী সুখ। আমার মতে রাণীর পক্ষে স্বামীগৃহই শ্রেষ্ঠ ও অতি নিরাপদ আশ্রয় স্থান।

রমাপ্রসন্ন। আপনি আমার সেই নষ্টবুদ্ধি জামাতার সম্বন্ধে সব কথাই তো জানেন প্রভু!

আনন্দস্বামী। তা জানি বটে। কিন্তু তুমিই বলিয়াছ—রাসমোহন এখন তাহার নিজ গৃহে বাস করিতেছে। অশান্ত পুরুষকে যদি প্রকৃতিস্থ করিতে

হয়, তাহা হইলে তাহা পারে কেবল তার—ধর্ম্মপত্নী। পথভ্রষ্ট স্বামীকে যদি পাপের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার শক্তি কাহারও থাকে, তাহা হইলে তাহা এই সহধর্ম্মিণীর শক্তিতেই হয়। হেমরাণী এতদিন সংসার চেনে নাই, স্বামী চেনে নাই, তার নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, আর এজন্য সে তাহার স্বামীকে সৎপথে আনিবার চেষ্টাও করে নাই, সুযোগও পায় নাই। দেখ ছোত সমাজের শাসন ও লোকমত মানিয়া, অতি সমাজদ্রোহী যে [illegible]কেও শিষ্ট শান্ত হইয়া মান আবরু বজায় করিয়া চলিতে হয়। [illegible]তুমি কোন উপায়ে যোগাড় যন্ত্র করিয়া হেমরাণীকে শ্বশুর বাড়ীতে তা[illegible] কাছে পাঠাইয়া দাও, আমার বিশ্বাস সে কখনই তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। আর ইহাও সম্ভব—এই হেমরাণী প্রীতি যত্ন স্নে[illegible] ভক্তি শুশ্রূষার গুণে, সেই হতভাগ্যকে একদিন আবার পুণ্যের পথে [illegible]ইয়া আনিতে পারে। জগতে এরূপ ঘটনাও দুর্ল্লভ নয়।

গুরুদেবের কথাগুলি মনে মনে কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিয়া, রমাপ্রসন্ন বলিলেন—"আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন—তাহাই ঠিক। কিন্তু তাহার সঙ্গে রসুলপুর পর্য্যন্ত যায় কে?"

আনন্দস্বামী। সঙ্গে যাবার আর মেয়েকে সাজাইয়া গুজাইয়া পাল্কী করিয়া পাঠাইবার বন্দোবস্ত, শিবশঙ্কর বাবুই করিয়া দিবেন। তবে তোমার পক্ষ হইতে এমন একজন লোক যাওয়া চাই, যাহাকে তোমার জামাতা খুব ভালরূপ চেনে।

রমাপ্রসন্ন কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—"সে লোক আমার আছে। আমার সৌভাগ্যের দিনের এক বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা, তার নাম সনাতন মণ্ডল, সেই এই কাজ করিতে সক্ষম। সে হেমরাণীকে মা বলিয়াছে। তার কথা সেদিন ত আপনাকে বলিয়াছি। আমি নিজেই যাইতে পারিতাম। কিন্তু আমার জামাতার চক্ষে আমি মৃত—সুতরাং আত্ম প্রকাশ না করাই ভাল।

আনন্দস্বামী। ইহাই সকলের চেয়ে সুন্দর যুক্তি। তুমি যে উপায়ে পার, দেবানন্দপুরে গিয়া সনাতনের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে সরাসর শিবশঙ্কর বাবুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিও। শিবশঙ্কর সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। মায়া কাটাইবার জন্য কৌমার্য্য অবলম্বন করিলাম, সংসার ছাড়িলাম, হায়! তবু এ মায়া যে আমায় ছাড়িতে চায় না রমাপ্রসন্ন?

এই সব কথা বার্ত্তার পর স্বামিজী তাঁহার সান্ধ্য কর্ত্তব্যগুলি পালনের জন্য, এক নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রমাপ্রসন্ন সেই দিনই ভবানী-পুর ছাড়িয়া রাত্রের ট্রেণে দেবানন্দপুরের পথ ধরিলেন।

(২২)

সুরেন্দ্র প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিসে সে হেমরাণীর শোচনীয় অপমৃত্যুর কথা ভুলিয়া যায়। চিত্তের দৃঢ়তা তাহার নাই। সুতরাং প্রাণের মধ্যে দিনরাত যে একটা অনুশোচনার আগুণ জ্বলিতেছিল, তাহা কমাইবার জন্য, সে মদের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল। বেশী মাত্রায় মদ্যপানজনিত উত্তেজনার ফলে, কিছুক্ষণের জন্য সে এই দাবদাহী চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাইত বটে, কিন্তু অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে আবার যে যাতনা—সেই যাতনা।

আমেদপুরের বাগান এখন আর তার ভাল লাগে না। পল্লীসুন্দরীর নয়নরঞ্জন সৌন্দর্য্য হইতে, যেন সকল মাধুরীই ঝরিয়া পড়িয়াছে। যদি কোন পুলিস হাঙ্গাম উপস্থিত হয়, এই জন্যই সুরেন্দ্র তারামণিকে বিদায় দিয়াছিল।

সুরেন্দ্র দুই এক দিন এদিক ওদিকের সংবাদ লইয়া জানিতে পারিল, কাছের কোন স্থানেই হেমরাণীর লাশ ভাসিয়া উঠে নাই, বা এ সম্বন্ধে কোনরূপ গোলমাল হয় নাই। তখন সে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে আমেদ-পুরের কাছারী ত্যাগ করিল।

শিবরামপুরের বাগানে না ফিরিয়া, সুরেন্দ্র সরাসর রামানন্দপুরের নিজের-

বাটীতেই আসিল। কিন্তু সেই কোলাহলসংকুল বাড়ীতে তাহার মন টিকিল না। সে আবার বাগানে চলিয়া গেল।

হায়! স্মৃতি কি ভয়ানক জিনিষ! একবার যাহা মনে আঁকিয়া যায়, কিছুতেই যে তাহা মুছিয়া ফেলা যায় না! এত নিষ্ঠুর, এত হৃদয় হীন, এই স্মৃতি! মানুষকে দুঃখ দিয়াই কি তার আনন্দ?

একদিন—সেদিন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, শিবরামপুরের বাগানের রায়-দীঘির নির্ম্মল জলে, চাঁদের পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। মৃদু সমীরান্দোলিত ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালার বুকে, সেই কলঙ্কী চাঁদ হেলিতেছে, দুলিতেছে, কাঁপিতেছে, হাসিতেছে। বেশ একটু ঠাণ্ডা হাওয়া, ফুলের গন্ধ চুরী করিয়া সুরেন্দ্রের নাসাগ্রে পৌছিয়া দিতেছে—তবু তার প্রাণে সুখ নাই, আনন্দ নাই, প্রফুল্লতা নাই, সজীবতা নাই।

রাত্রি তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে বলিয়া, পল্লী-প্রকৃতি নিশুতি অবস্থায় নীরবে ঘুমাইতেছে। সুরেন্দ্র ও তখন সুধা পানে বিভোর। তাহার মনটাও তখন খুব উদার, মুক্ত ও প্রফুল্ল! সে চক্ষু মুদিয়া, তাহার চির প্রিয় সেই আরাম চেয়ার খানিতে লম্বমান হইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সুরেন্দ্র পিছনে যেন কাহার পদশব্দ পাইল। সেই সচকিতে বলিল—"কেও?"

কেহ তাহার এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। আবার সেই পদশব্দ! সুরেন্দ্র অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় পাশের দিকে চোখ ফিরাইয়া দেখিল। সে সবিস্ময়ে দেখিল—এক রমণী মূর্ত্তি তাহার চেয়ারের অদূরে, যেখানে একটু সামান্য অন্ধকার ছিল, সেইখানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

সুরেন্দ্র আবার বলিল—"কেও?"

সে মূর্ত্তি নড়েনা, চড়েনা। কথাও কয় না। সুরেন্দ্রে মনে ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কে তুই?"

সেই মূর্ত্তি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুরেন্দ্র আরও ভয় পাইল। সে ভাবিল—এ আর কিছুই নয়! সলিল মধ্যে নিমজ্জিতা হেমরাণীর ছায়া মূর্ত্তি!

আর বেশী বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে ভাবিয়া, যেন সেই রমণীমূর্ত্তি নিকটে আসিয়া বলিল—"আমায় চিনিতে পারিতেছ না কি?"

সুরেন্দ্র দেখিল, হরিমতি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—"আমায় চিনিতে পারিতেছ না কি?"

সুরেন্দ্র বলিল—"কি প্রয়োজনে তুমি এ রাত্রে এখানে আসিলে হরিমতি?"

হরিমতি। একদিন তুমি আমার এক দণ্ডের অদর্শনে কাতর হইয়া পড়িতে। কত সাধিয়া, ভুলাইয়া, আশার ছলনায় মজাইয়া, আমায় এ পথে আনিয়া দাঁড় করাইলে! এত সহিয়াও যদি আমি একবার তোমায় দেখিতে আসি, তাহাতে কি দোষ হয় সুরেন্দ্র বাবু? তোমার যে আশার জিনিষ ছিল, সোনায় মোড়া সুখের স্বপ্ন ছিল, সে ত জলে ডুবিয়াছে। তবে আর কেন?"

সুরেন্দ্র সবিস্ময়ে বলিল—"কাহার কথা বলিতেছ তুমি?

হরিমতি। আমি সেই অভাগিনী হেমরাণীর কথাই বলিতেছি।

সুরেন্দ্র। সে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, এ কথা তুমি কেমন করিয়া জানিলে?

হরিমতি। এত আর মাধব গোয়ালার অভাগিনী কন্যা হরিমতি দাসী নয়! গ্রামে নগরে চারিদিকে যে টি টি পড়িয়া গিয়াছে সুরেনবাবু!

হরিমতির কথায় একটু ভয় পাইয়াছে সুরেন্দ্র বলিল—"লোকে বলে?"

হরিমতি। লোকে বলে—রামানন্দপুরের জমীদার সুরেন্দ্রকুমার রায়

চৌধুরী, মানুষে যাহা করিতে পারে না—তাহাই করিয়াছে। শ্মশানঘা
হইতে এক পিতৃমাতৃহীনা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে ডাকাতের মত অপহরণ করিয়া
তাহাকে তাঁর বাগানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল—আর সেই সাধ্বী নারী ইজ্জ
রক্ষার জন্য জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

কথাগুলি শুনিয়া সুরেন্দ্র বড়ই দমিয়া পড়িল। বিস্মিত চিত্তে ভাবিল
হরিমতি এসব কথা জানিল কিরূপে?

সে দৃঢ়স্বরে বলিল—"তাহা হইলে আমার জন্যই কি এই হেমরাণ
আত্মহত্যা করিয়াছে একথা বলিতে চাও?"

হরিমতি। নিশ্চয়ই তাই। সবাই ত হরিমতি নয় সুরেন বাবু
এক সোণার কৌটায় মোড়া, হীরেয় গড়া, অতি বহু মূল্য রত্ন, সকল সতী
সাধ্বীর বুকেই লুকানো আছে। সেটা, লম্পট চোরের হাত হতে রক্ষা
করবার জন্য, তারা জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করতে পারে। সবাই ত আমা
মত হতভাগিনী নয়—সুরেন্দ্রবাবু! আমার সর্ব্বনাশ করিয়া তুমি আমা
পথে বসাইয়াছ। পল্লীকুটীরে তুলসীতলায় নিত্য সন্ধ্যার দীপ জালিয়া
মোটা চালের অন্নে বস্ত্রে সুখী হইয়া আমি আমার বৈধব্য জীবনের দিনগু
কাটাইতেছিলাম। আমার সেই সুখের কুটীরে আগুন ধরাইয়া দিয়া, আ
তুমি আমাকে নরকের পথে বসাইয়াছ। স্মৃতির যাতনায়, আমি জীবন্মৃ
হইয়া আছি। হেমরাণী যে তোমার কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জ
ডুবিয়া মরিয়া বাঁচিয়াছে—তাহাতে আমি দুঃখিত নয়—বরঞ্চ সুখী। কি
একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি সুরেন্দ্র বাবু! তোমার এসব মহাপাপে
পরিণাম কি হইতে পারে?

হরিমতির কথাগুলা বড়ই রূঢ়! বড়ই মর্ম্মভেদী! সুরেন্দ্র একবার ম
ভাবিল—দরোয়ান ডাকিয়া ইহাকে বাগান হইতে বাহির করিয়া দিই। কি
তাহার সাহসে ততটা কুলাইল না। পাপীর মনে নানা সন্দেহ! নানা ভয়

সুরেন্দ্র বলিল—"হরিমতি! বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, যে এতটা স্পর্দ্ধার সহিত তুমি আজ আমার সঙ্গে এ ভাবে কথা কহিতেছ! এটা কি ঠিক?

হরিমতি বিদ্রুপের সহিত বলিল—"আমাকে মজাইয়া ভুলাইয়া, তুমি যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ—সেটাই কি ঠিক? তারপর আমাকে যে পথে বসাইতে উদ্যত হইয়াছ, সেটাও কি ঠিক সুরেন বাবু? হইতে পারে, তুমি প্রবল পরাক্রান্ত জমীদার। অনেক পয়সা তোমার হাতে। অনেক লাঠিয়াল তোমার তাঁবেদারিতে। কিন্তু আমার ত আর সে পবিত্র গৃহ-কক্ষ নাই, আশ্রয় স্থান নাই! তুমি লুঠ করিবেই কি? জ্বালাইয়া দিবেই বা কি? আমার সর্ব্বস্বধন যাহা, তাহা তুমি এর অনেক আগে অতি হীন তস্করের মত অপহরণ করিয়াছ। আমি তোমায় ভয় করিব কেন? তবে এ কথাটা শুনিয়া রাখ—তুমি। হেমরাণীর মৃতদেহ আমাদেরই গ্রামে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। আমি সে মৃত দেহ দেখিবামাত্রই, চিনিতে পারিয়াছিলাম। তাহা সনাক্ত করিলেই তোমার সর্ব্বনাশ হইত। করি নাই, কেবল তোমার মুখ চাহিয়া। এখনও তাহা করিতে পারি, কিন্তু সেটা তোমার ভবিষ্যৎ ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতেছে। কথায় বলে—আয়নার মুখ দেখাদেখি। তুমি যেমন দেখাইবে, আমি ঠিক তাই করিব! তুমি যখন আমায় ত্যাগ করিয়াছ, তখন তুমি জেলে যাও, ফাঁসে যাও, আমার তাতে আসে যায় কি?"

সুরেন্দ্র ভয়ে চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"সত্যই হেমরাণীর মৃত দেহ পুলিসের হাতে পড়িয়াছে? বল কি হরিমতি? তুমি কি রহস্য করিতে আসিয়াছ?"

হরিমতি। মনে ভাবিও না, যে আমি এ রাত্রে তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করিতে আসিয়াছি! তোমার আমেদপুরের কাছারির আধ ক্রোশ দূরে আমার মামার বাড়ী। তারা এখনও আমার মত অভাগীর মায়া কাটাইতে পারে নাই। তাই মাঝে মাঝে লুকাইয়া, তাদের সঙ্গে দেখা করিয়া

আসি। এবারও তাই গিয়াছিলাম। যেদিন এই পুলিস-হাঙ্গামা হয়, সেই দিনই এ সব ভয়ানক ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া, আমি সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া রামানন্দপুরে চলিয়া আসি।

সুরেন্দ্র। তুমি হেমরাণীকে চিনিলে কিরূপে?

হরিমতি। সেটা এখন নানা কারণে বলিব না। কিন্তু পরে সবই বলিব।

সুরেন্দ্র বুঝিল, হরিমতি এই ঘটনার সাহায্যে তাহার মনের উপর অনেকটা আধিপত্য বিকাশ করিয়াছে। তাহাকে জোর করিয়া তাড়াইলে বিপদ ঘটিতে পারে। এজন্য সে বলিল—"হরিমতি! এখন রাত্রি কত?"

হরিমতি বলিল—"বোধ হয় রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সুরেন্দ্র। তুমি যে বাগানে প্রবেশ করিয়াছ, আমার চাকরেরা তাহা জানে না বোধ হয়?

হরিমতি। বোধ হয় না।

সুরেন্দ্র। তুমি ঐ বৈঠকখানার কক্ষ মধ্যে চল। তোমার সঙ্গে আমি নির্জ্জনে দুই চারিটা দরকারী কথা কহিতে চাই।

হরিমতি একটু হাসিয়া বলিল—"বেশ তো! আমিও ত তোমার সঙ্গে একটা কাজের কথা কহিবার জন্যই এত রাত্রে আসিয়াছি।"

হরিমতিকে সঙ্গে লইয়া সুরেন্দ্র চিন্তিত মুখে কক্ষ মধ্যে আসিল। সে মনে মনে সংকল্প ঠিক করিয়া ফেলিল—এ শয়তানীকে হাতে রাখিতে হইবে—অন্ততঃ যতদিন না হেমরাণীর এ হাঙ্গামটা চুকিয়া যায়। এই সব ভাবিয়াই, সে হরিমতিকে কক্ষ মধ্যে আনিয়া ধীর স্বরে বলিল—"সত্যই হরিমতি! তোমার সহিত আমি যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা বড়ই নিষ্ঠুরের মত। এজন্য আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত। বল—কি করিলে তোমার মনের সন্তোষ হয়?"

হরিমতি খুব চতুরা। সে সুরেন্দ্রের সহসা এই ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ যে কি, তাহা অতি সহজেই বুঝিয়া লইয়া বলিল—"যদি যথার্থই এজন্য তোমার অনুতাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে তোমার চরণে চির-দিনের জন্য আশ্রয় দাও। যদি তুমি বিবাহ করিয়া পুনরায় সংসারী হইতে চাও, তাহাতে আমি কোন বাধা দিব না, একটুও অসন্তুষ্ট হইব না। কিন্তু আমার জীবন থাকিতে আমি আর কখনও তোমায় কোন নিরীহা অবলার সর্ব্বনাশ করিতে দিব না! প্রতিজ্ঞা কর—তুমি যেখানে থাকিবে, আমাকে সঙ্গে রাখিবে। আমায় আর কখনও নিষ্ঠুরের মত এ ভাবে ত্যাগ করিবে না।"

সুরেন্দ্র অগত্যা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—"ভাল তাহাতেই স্বীকার করিতেছি।"

হরিমতি বলিল—"আর একটা কথা আমার আছে?"

সুরেন্দ্র। কি?

হরিমতি। স্বীকার কর শয়তানী তারামণিকে তুমি তোমার বাগানে আর কখনও প্রবেশ করিতে দিবে না।

সুরেন্দ্র মনে মনে হাসিয়া বলিল—"বড়ই বাড়াবাড়ি দেখিতেছি যে তোর! একাবারে যেন আমায় পাইয়া বসিয়াছিস! এই তারামণির সঙ্গে যদি আমার সাক্ষাতের কখনও প্রয়োজন হয়, তাহাহইলে গুপ্তস্থানের ত অভাব হইবে না। থাক্—দিন কতক এখানে। তার পর এসব হাঙ্গাম থামিয়া গেলে—তোকে কুকুরীর মত পদাঘাতে তাড়াইয়া দিব।"

তার পর সে মুখ ফুটিয়া বলিল—"ইহাতে যদি তুমি খুসী হও, তাহাই হইবে।"

সুরেন্দ্র হরিমতির সহিত কথাবার্ত্তায় ক্রমশঃ তাহার মনের স্থিরতা হারাইয়া ফেলিতেছিল। এই আগন্তুক অশান্তি নাশ জন্য, সে আল্‌মারীর মধ্য হইতে ব্রাণ্ডির বোতল বাহির করিল।

হরিমতি হাস্যমুখে বলিল—"ওঃ! কতদিন বল দেখি তোমাকে আমি মদ ঢালিয়া দিই নাই। আবার যদি আমায় চরণে আশ্রয় দিলে, তাহা হইলে আজকে তোমার পরিচর্য্যা করিতে দাও।"

সুরেন্দ্র মলিন হাস্যের সহিত বলিল—"ভাল—তাহাই হউক।"

সে দিন ইচ্ছা করিয়াই হরিমতি তাহার বিধিপ্রদত্ত সৌন্দর্য্যটা, একটু মাজিয়া ঘসিয়া, উজ্জলতর করিয়া, একখানি কালাপাড় শিমলার ফিন্‌-ফিনে শাড়ী পরিয়া, তাম্বুল রাগে ঠোঁট দুটী রাঙ্গা করিয়া, বাগানে আসিয়াছিল।

হরিমতির হাত হইতে পানপাত্রটী লইয়া, সুরেন্দ্র তাহার তৃ-চতুর্থাংশ শূন্য করিয়া, গ্লাসটী হরিমতির সম্মুখে ধরিয়া বলিল—"তুমি আমার প্রসাদ পাও। তা না হ'লে আমি ছাড়্‌ছি না।"

হরিমতি একটু হাসিয়া বলিল—"আমাকে কি কখনও মদ খাইতে দেখিয়াছ?"

সুরেন্দ্র হরিমতিকে তাহার পার্শ্বে বসাইয়া বলিল—"এতটুকু খেলে ত মানুষ মরে না গো!"

হরিমতি অগত্যা অনুরোধে পড়িয়া, অবশিষ্ট সুরাটুকু সুরেন্দ্রের মনের তৃপ্তির জন্য মুখে ঢালিয়া দিল। কিন্তু সে এমন ভাবে ঢালিল—সে গ্লাস হইতে তাহার বার আনা অংশ, তাহার কাপড়ের উপর পড়িয়া গেল। সুরেন্দ্র তাহা দেখিতে পাইল না।

দুই এক পাত্র উদরস্থ হইবামাত্র, সুরেন্দ্রের প্রাণে লালসার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে দেখিল—হরিমতির চোখদুটী বিদ্যুৎপ্রভায় পূর্ণ। মুখখানি অতি সুন্দর। যৌবনের প্রবল জোয়ারের লাবণ্যময় স্রোত, তাহার প্রত্যেক অঙ্গে উছলিয়া উঠিতেছে।

লালসালোলুপ সুরেন্দ্র, হরিমতিকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"মতি! তোমার সেই গানটী গাও?"

হরিমতি অপাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলাইয়া, মধুর হাসিয়া বলিল—"আবার গান! আমার সাধের বীণা যে তুমিই ভাঙ্গিয়া দিয়াছ বঁধুয়া! আমার বীণার সুরভরা তারটি যে তুমিই ছিঁড়িয়া দিয়াছ সখা?"

সুরেন্দ্রের মেজাজটা সে দিন ভাল ছিল না। ক্রমাগতঃ মদিরাপান জন্য তাহার শীঘ্রই একটা মানসিক অবসাদ আসিল। তন্দ্রার অলস দেখা দিল। সে জড়িতস্বরে বলিল—"আমার বড় ঘুম পাচ্ছে মতি?"

হরিমতি ত তাহাই চায়। সে তাহাকে নিকটস্থ এক সোফার উপর শোয়াইয়া দিয়া, ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। সুরেন্দ্র তাহার পরিচর্য্যার গুণে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

সুরেন্দ্রকে নিদ্রাভিভুত দেখিয়া, হরিমতি তাহার গা ঠেলিয়া দুই তিন বার ডাকিল—"ও—সুরেন বাবু! ও জমীদার বাবু!"

সুরেন্দ্রবাবু জড়িত স্বরে বলিল—"যাও, ত্যক্ত করো না।"

সুরেন্দ্র ক্রমশঃ নেশার ঘোরে গভীর নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িল। হরিমতি সুরেন্দ্রের সহিত ভালবাসার বিবাদ মিটাইতে আসে নাই। সে আসিয়াছিল, তাহার নিজের কাজ করিতে। একটা শয়তানী মতলব হাঁসিল করিতে!

পনর মিনিট কাল ব্যজনের পর যখন সে দেখিল—সুরেন্দ্র গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত—তাহার নাক ডাকিতেছে, তখন সে তাহার পকেট হাতড়াইয়া একটী চাবির রিং বাহির করিল। সুরেন্দ্রের ড্রয়ারের ও আলমারির চাবি গুলি, সে খুব ভাল রূপই চিনিত। এর আগে, যখন সে সুরেন্দ্রের আদরিণী ছিল, তখন সুরেন্দ্রই ইচ্ছা করিয়া অনেক সময় আল্‌মারি হইতে কোন জিনিষ বাহির করিবার জন্য, তাহাকে এই চাবির রিং ফেলিয়া দিয়াছে।

অতি সহজে আলমারিটি খুলিয়া, হরিমতি তাহার মধ্যে একটী চিঠির

তাড়া পাইল। হতভাগিনীর বিবাহ হইয়াছিল, কলিকাতার কোন মধ্যবিৎ অবস্থাপন্ন ঘরে। এই সময়ে হরিমতি তাহার স্বামীর চিত্ততুষ্টির জন্য সামান্য রূপ বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিয়াছিল। সেই বিদ্যা, এখন তাহার বড়ই কাজে লাগিল।

সে সেই চিঠির তাড়ার মধ্য হইতে, কতকগুলি পত্র বাহির করিয়া লইয়া, বাকি গুলি ঠিক পূর্ব্ববৎ বাঁধিয়া যথাস্থানে রাখিয়া, আলমারিতে চাবি দিয়া সেই চাবিটী সুরেন্দ্রের পকেটে রাখিয়া দিল। এই করিতেই সে সেদিন বাগানে আসিয়াছিল। এত সহজে যে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

সে সেই চিঠিগুলি হাতে লইয়া মৃদু হাসিয়া, নিদ্রিত সুরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তোমার মৃত্যুবাণ আমার হাতে রহিল। যে উদ্দেশ্যে আজ এই সাংঘাতিক পত্রগুলি সংগ্রহ করিলাম, তাহা যদি কখনও ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এই গুলিই তোমার সর্ব্বনাশ করিবে।"

তার পর সে পার্শ্বের কক্ষে মেঝের উপর আঁচল পাতিয়া শুইয়া রাত্রের শেষ কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়া, প্রভাতে সকলের উঠিবার আগে সুরেন্দ্রকে জাগাইয়া, তাহার নিকট বিদায় লইয়া বাগান হইতে চলিয়া গেল।

সুরেন্দ্র, এ বিদায় প্রার্থনায় অসন্তুষ্ট হইল না। সে বলিল—"তাহলে তুমি এই বাগানেই আমার কাছে থাক্‌তে ইচ্ছা কর।"

হরিমতি, একটু টিট্‌কারির সহিত বলিল—"পয়সাওলা লোকেদের কথার নড়চড় হয় কেবল আমাদের মত গরীবদের সঙ্গে। আসবো—দুই চারি দিনের মধ্যে। তবে এবার একটা দিনক্ষণ না দেখে আর এখানে আসছি নি।"

হরিমতি হাসিমুখে বাগানবাড়ী হইতে চলিয়া গেল। সুরেন্দ্রের কখনও ঘুমের ঘোর কাটে নাই। সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

(২৩)

আনন্দ স্বামী যেরূপ পরামর্শ দিলেন, তাহাই তখনকার একমাত্র যুক্তি সঙ্গত কার্য্য এইরূপ স্থির করিয়া, রমাপ্রসন্ন একদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়া, সনাতনের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন "সনাতন! বাড়ীতে আছ কি?"

ঘটনাক্রমে সেদিন সনাতনের পিতা নবকুমার মণ্ডল, কোন বিবাহ উপলক্ষে, গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ রাখিতে এক কুটুম বাড়াতে গিয়াছিল।

তখন রাত্রি দশটা। সনাতন প্রায়ই তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে শয়ন করিত। তখনও সে ঘুমায় নাই।

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়াই, সনাতন তখনই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া, আগন্তুকের পদধূলি লইয়া বলিল—"খপর কি দেবতা? আপনার প্রথম পত্র পেয়েই তা হেমেন্দ্র বাবুকে দেখিয়েছিলুম। তিনি আপনার পত্রের লিখিত ঘটনাগুলি পড়ে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছেন বটে, কিন্তু আপনি আমাদের আর পত্রাদি দেন নাই কেন?"

রমাপ্রসন্ন—একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আমি অনেক ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত ছিলাম। কলিকাতা, আরামবাগ, এই সব স্থানে—হেমরাণীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এজন্য চিঠি দিতে পারিনি।"

সনাতন। আমার 'মা' কেমন আছেন!

রমাপ্রসন্ন। ভালই আছেন। এখানে এখন আর কেউ আসিয়া পড়িবে না ত সনাতন?

সনাতন। না—সে ভয় নাই। বাবা কুটুম বাড়ী গিয়াছেন। আর প্রতিবাসীদের অনেকের এক ঘুম হইয়া গেল। রাত্রে বড় কেউ একটা এখানে আসে না।

তখন রমাপ্রসন্ন, ডেপুটী বাবু শিবশঙ্কর কর্ত্তৃক—হেমরাণীর উদ্ধার ও তার পরের সমস্ত ঘটনাই—সনাতনকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। তার পর রাণীকে তার শ্বশুর বাড়ীতে পাঠানোর সম্বন্ধে যাহা সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে আর তাহা যে তাঁহার গুরুর আদেশ—একথা বলিতেও ভুলিলেন না।

সনাতন সবকথা গুলি সমনোযোগে শুনিয়া, অনেকটা প্রফুল্লচিত্ত হইল। যেখানেই হোক না কেন—হেমরাণী, সুখে ও নিরাপদে থাকিলেই যথেষ্ট! সে বলিল—"যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা খুবই পাকা মতলব। তা আমার বাবাঠাকুরটী এখন কোনরূপ হাঙ্গাম না করিলেই ভাল!"

রমাপ্রসন্ন বলিলেন—"সে বিষয়েও আমি অনেকটা সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি। শিবশঙ্কর বাবুর আদালতের একজন কর্ম্মচারির বাস, রাসমোহনের স্বগ্রামে। সে লোক সংবাদ আনিয়াছে—রাসমোহন কোথা হইতে টাকার জোগাড় করিয়া, মহাজনদের সহিত রফা নিষ্পত্তি করিয়া তাহার বাস্তুটুকু উদ্ধার করিয়াছে। আর এখন অনেকটা শিষ্ট শান্তভাবে নিজ গ্রামের ভিটাতেই বাস করিতেছে।"

সনাতনের মুখখানা এ কথায় বড়ই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল—"তা হলে মা'কে পাঠাবার দিন স্থির হলো কবে?"

রমাপ্রসন্ন। পরশু—খুব ভাল দিন আছে।

সনাতন। আমার মার সঙ্গে যাবে কে?

রমাপ্রসন্ন। তুমি!

সনাতন এ কথায় ভারি খুসী হইয়া বলিল—"তা হলে আজকের ভোরেই আমাদের দেবানন্দপুর ছাড়তে হবে দেখ্‌ছি।"

রমাপ্রসন্ন। নিশ্চয়ই।

সনাতন মুহূর্ত্ত মধ্যে কি ভাবিয়া লইয়া বলিল—"না শুভ কার্য্যে

কালহরণ কর্ত্তে নেই। আমি এখনিই আমার পিসিমাকে বলে কয়ে বিদায় নিয়ে আস্‌ছি। তিমি এখনও ঘুমোন নি।"

রমাপ্রসন্নকে চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে অন্ধকারে বসাইয়া রাখিয়া, বাড়ীর মধ্যে গিয়া সনাতন তাহার পিসিমাকে তাহার স্থানান্তরে গমনের কথা বলিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া সে রমাপ্রসন্নকে বলিল—"দাদাঠাকুর। মাসের মধ্যে ক'দিন বা আমি বাড়ি থাকি। পিসিকে যখন বলে রাজি ক'রে এসেছি, তখন ভয় কিসের? বাড়ীতে দুধ আছে, মিষ্টি আছে—আন্‌বো কি?

রমাপ্রসন্ন। না তার প্রয়োজন নেই। চল আমরা এই রাত্রেই যাই। ঘাটে নৌকা ঠিক করে এসেছি। নৌকাতেই একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে। দেবানন্দপুরে যদি কেউ কাল সকালে আমায় দেখ্‌তে পায়, ত আমার মহা বিপদ ঘট্‌বে। সবই ত জান তুমি সনাতন।

সনাতন বলিল—"সেটা ঠিক। রাতে রাতে যাওয়াই ভাল। আপনি বাহিরে একটু দাঁড়ান। পিসি আপনাকে দেখিলে হয়ত—সন্দেহ করিতে পারে। আমি এখনি আসিতেছি।"

পাঁচমিনিটের মধ্যে সনাতন বাহিরে আসিল। তাহার পিসি সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সনাতন, রমাপ্রসন্নের নিকটে আসিয়া বলিল—"তবে চলুন দাদাঠাকুর।"

(২৪)

শিবশঙ্কর বাবু রমাপ্রসন্নের চিঠি পাইয়া, হেমরাণীকে পাঠাইবার জন্য সর্ব্ববিষয়ে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। হেমরাণী তখন কার্য্যান্তরে ব্যস্ত। কাজেই পতি পত্নীতে নির্জ্জনে দুই চারিটি কথাবার্ত্তা কহিবার একটা বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলেন।

সুরবালা একখানি চিঠি পড়িতেছিলেন। সেখানি পড়া শেষ হইলে,

তিনি একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হায় রে! মায়া? আমার কোথাকার কে—তাহাকে পেটে ধরি নি, আমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই, তবুও তাকে পাঠাতে হবে বলে আমার প্রাণ কাঁদছে।"

শিবশঙ্কর বাবু মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন—"কেমন সুরবালা? তখনই ত আমি বলিয়াছিলাম, এই মায়ার পাপের জন্য তোমায় অনেক কষ্টভোগ করিতে হইবে। যাক্ রাণীকে পাঠানোর বিষয়ে তোমার স্বাধীন মত কি?

সুরবালা বলিলেন—"পল্লীগ্রামে আমার জন্ম। সেখানকার ব্যাপার আমরা খুব ভাল জানি। সহরে কে কাহাকে চেনে, কেই বা কার খপর রাখে? স্ত্রীলোকের নামে যে কলঙ্ক রটিলে—লোকে বলে "ওর মরাই ভাল" দেশের ভালমন্দ লোকে ভিতরের কথা না জেনে হেমের নামে সেই কলঙ্কই রটিয়েছে। স্বামীর আশ্রয় স্ত্রীলোকের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। বাপই বল, মা'ই বল, ভাই বল—আর সন্তানই বল, দর্প, তেজ, শুচিতা, স্বাধীনতা, কর্ত্তৃত্ব নিয়ে স্ত্রীলোকে স্বামীর কাছে যেমন নিরাপদে থাকে, এমন আর কোথাও নয়। স্বামী আদরে রাখুন, আর হেনস্তাই করুন, স্বামী-গৃহই স্ত্রীলোকের নিরাপদ দুর্গ। আমার মতে রাণীকে—পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত।

শিবশঙ্কর। পাঠিয়ে দেওয়া যখন ঠিক হলো, তখন আমরা রাণীকে আমাদের মেয়ের মত সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দোব। কি বল?

সুরবালা। তা তোমার বলবার আগেই আমি মনে মনে স্থির করে রেখেছি।

শিবশঙ্কর। কি স্থির করে রেখেছ সুরবালা?

সুরবালা সহাস্যে বলিলেন—"তা হ'লে একবার একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে ও ঘরে এস।

শিবশঙ্কর বাবু কক্ষান্তরে গিয়া বিস্মিতনেত্রে দেখিলেন—"বাঙ্গালীর

মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে হইলে, মা যেরূপ ভাবে তাহার বাক্স-পেটারা গুছাইয়া দেন, সুরবালা ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। একটী ভাল বিলাতী ট্রাঙ্কে, কয়েক জোড়া আটপৌরে কাপড়, ভাল দেশী কাপড়, কয়েকটা শেমিজ, জ্যাকেট, একবাক্স এসেন্স, ফিতা, চিরুণী, আরসী, একটী রূপার সিন্দুর কৌটা আরও কত কি জিনিষ। সেই পেটিকার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র হাত বাক্স ছিল। শিবশঙ্কর তাহা দেখিয়া বলিলেন—"ও বাক্সতে কি আছে ?"

সুরবালা ডালাটী খুলিবামাত্র শিবশঙ্কর বিস্মিতনেত্রে দেখিলেন, তাহার মধ্যে এক জোড়া বালা, মাথার সোণার কাঁটা, ফুল চিরুণী ও কয়েকটী ডায়মন কাটা মাকড়ী, সেই বাক্সের মধ্যে বেশ শৃঙ্খলার সহিত সাজানো রহিয়াছে।

উন্নতহৃদয়া, চির সৌভাগ্যবতী, আদরিণী পত্নীর কোন কার্য্য সম্বন্ধে শিবশঙ্কর কখনও অমত বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। তিনি হেমরাণীকে পাঠাইবার এই বিরাট আয়োজন দেখিয়া বুঝিলেন, আয়োজন ঠিক তাঁহার পত্নী সুরবালার মতনই হইয়াছে।

শিবশঙ্কর বাবুর চোখে আনন্দাশ্রু বহিল। তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"সুরবালা ! কেন নিজের হাতে এ মায়ার বন্ধন সৃষ্টি কর্‌লে ? কে এই হেমরাণী ! যার জন্য আজ আমাদের এই যন্ত্রণা ? এতটা চিন্তা ? এতটা মনোকষ্ট ?"

সুরবালা মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন—"তা হ'লে বল দেখি আমিই বা তোমার কে ? পল্লীগ্রামের এক নিভৃত গৃহের কোণে আমি লুকিয়েছিলুম, তুমি একদিন রাত্রে সেখান থেকে আমাকে টেনে এনে, এই সংসারের রাণী-গিরি করবার ভার দিয়েছ। আমাকে একদণ্ড না দেখলে, এখন তুমি অস্থির হ'য়ে পড়। আর তোমার এই অস্থিরতার জন্য আমি পাঁচ পাঁচটী বৎসর বাপের বাড়ী যেতে পাইনি। আমার মুখ একটু মলিন দেখলে, আগ্রহময়

অসংখ্য কুশল প্রশ্নে আমায় ব্যাকুল ক'রে তোল। আমার অসুখ বিসুখ হ'লে,কাছারী কামাই ক'রে আমার বিছানার কাছে বসে থাক। ভগবানের সারা সংসারটা এই ধরণে মায়ার সুত্রে গাঁথা। আমাদেরই বোঝবার ভ্রম—কেননা যখন আমরা মায়া-জনিত সুখটুকু ভোগ করিতে এত লোলুপ, তখন এই মায়া সৃজিত দুঃখটাও ভোগ করবো না কেন?

ঠিক এই সময়ে একজন পাশের ঘরে চোরের মত লুকাইয়া পতিপত্নীর এই সব কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল।

সে আর কেউ নয়—আমাদের হেমরাণী। সব কথা শুনিয়া তাহার চোখে আসিল। সে চোখ মুছিতে মুছিতে সে স্থান ত্যাগ করিল।

ইহার পরদিনে, রমাপ্রসন্ন সনাতনকে লইয়া শিবশঙ্কর বাবুর বাঙ্গলোতে পৌছিলেন। রমাপ্রসন্নের এ আগমনের উদ্দেশ্য, শিবশঙ্কর বাবু পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন ও তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় উভয়ের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ হয়। শিবশঙ্কর বাবুর গুরু ভাই এই রমাপ্রসন্ন। সুতরাং অতি যত্নের সহিত তিনি তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। রমাপ্রসন্নের সন্ন্যাস-গ্রহণের ভিতরের কথাটি সে কি, আনন্দস্বামী ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে বলেন নাই। হেমরাণী কেন যে নদীর জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল, তাহাও রাণী তাঁহাকে বলে নাই। বলিলে অনেক কথা বলিতে হয়। শিবশঙ্কর বাবু কেবলমাত্র এইটুকু জানিতেন, হেমরাণীর স্বামী তাহাকে লইয়া ঘর করে না। লোকটা এক বারবনিতার মোহে উন্মত্ত হইয়া, তাহার সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছে। আর রমাপ্রসন্ন সংসারের উপর বীতরাগ হইয়া, সন্ন্যাসী হইয়াছেন।

এই ডেপুটি শিবশঙ্কর বাবুর আবাস বাটিটী দুই মহল। ভিতর ও বাহির মহলের সমাবেশ একটু দূরে দূরে। কাজেই রমাপ্রসন্ন যে সে বাড়ীতে আসিয়াছেন, তাহা বাড়ীর ভিতরের কেউ জানিল না। কেবল মাত্র জানিল,

সুরবালা। কেন না—শিবশঙ্কর বাবুই ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে গোপনে রমা-প্রসন্নের উপস্থিতির কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন।

হেমরাণী তখনও জানিতে পারে নাই, যে তাহার পিতা জীবিত, আর তাহার খুব কাছে সেই বাঙ্গালোর সীমার মধ্যেই আছেন। এরূপ বন্দোবস্ত রমাপ্রসন্নের নিজের সতর্কতার ফলেই হইয়াছিল। এই জন্য রমাপ্রসন্ন বাহিরের মহলেই রহিয়া গেলেন।

রমাপ্রসন্ন বাহির বাড়ীতেই স্বপাক আহার করিলেন। কেবল সনাতনই বাড়ীর ভিতরে আহার করিতে গেল।

সহসা সনাতনকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া, হেমরাণী খুবই বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"একি সনাতন! তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে?"

সনাতন তাঁহার পদধূলি লইয়া, বারেকমাত্র তাহার মুখের দিক চাহিয়া বলিল—"হেমেন্দ্র বাবু আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। ডেপুটী বাবুর সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব। তাঁর আদেশ মতই আমি এখানে এসেছি যে মা। তোমাকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে দোবার ভার, আমারই উপর পড়েছে।"

রাণী ভিতরের কথা কিছুই জানিত না। সে আড়াল হইতে আড়ি পাতিয়া যতটুকু শুনিয়াছিল, তাহাতে বুঝিয়াছিল শিবশঙ্কর বাবুই তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। তাহা জানিয়া ও সে বলিল—"একবার দেবানন্দপুরে হেমেনদা'র সঙ্গে দেখা ক'রে গেলে হয় না সনাতন?"

সনাতন। না, তা হইতে পারে না মা! রসুলপুরে তাঁর বড় অসুখ। তিনিই তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। তাঁর সেবা করবার লোকের বড় অভাব। তিনি হেমেনবাবুকে পত্র লেখায়—তোমাকে নিয়ে যাবার ভার আমার উপর পড়েছে। ডেপুটী বাবুর পত্র পেয়েই ত তিনি আমায় পাঠালেন। দেবানন্দপুরে যাবার এর পর ঢের সময় পাবে।

রসুলপুরেই রাসমোহনের নিবাস। দেবানন্দপুর হইতে রসুলপুর তিন

ক্রোশ। সুতরাং রাণী তাহার স্বামীর পীড়ার সংবাদটা অবিশ্বাস করিতে না পারিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তাহা হইলে তাই কর।"

ইহার পর রাণী খুব যত্নের সহিত সনাতনকে আহারাদি করাইল। সুরবালা দেবীও, এটা-খাও ওটা-খাও বলিয়া, তাঁহার আদরিণী কন্যার প্রিয়পুত্র সনাতনকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সনাতন সুরবালার এ অমায়িকতায় বড়ই মুগ্ধ হইল।

শিবশঙ্কর বাবুর কাছারি সেদিন বন্ধ। রমাপ্রসন্ন অশ্রুপূর্ণ চক্ষে শিবশঙ্কর বাবুকে বলিলেন—"তিনটার পর দিন ভাল আছে। এই সময়ে যাত্রা করাই ঠিক। কথায় বলে, ভগবান মহাপাপীকে বেঁধে মারবার হুকুম দেন। বোধ হয়, আমার আর রাণীর মধ্যে এখন এক রশি স্থান ব্যবধান। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমি হাত-পা-বাঁধা হতভাগ্য জীব। মেয়েটাকে একবার দেখবার ইচ্ছে হলেও ভরসা করে ভিতরে যেতে পাচ্ছিনি। যাই হ'ক—আমার মত হতভাগার এখান থেকে আগে সরে যাওয়াই ভাল। আপনি আমায় যে উপকার কল্লেন, তা জীবনে ভুলবো না।" এই কথা বলিয়া রমাপ্রসন্ন চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতবেগে বাটির বাহির হইয়া গেলেন।

সেখান হইতে রসুলপুরে যাইতে হইলে পালকী ভিন্ন উপায় নাই। পথও বড় কম নয়, পাক্কা আড়াই ক্রোশ। শিবশঙ্কর বাবু, আর সময়ক্ষেপ না করিয়া বাড়ীর মধ্যে গেলেন। তিনি রমাপ্রসন্নের মুখেই সনাতনের গুণের পরিচয় পাইয়া ছিলেন। তাঁহার চাকরদের মধ্যেও এক জনের বাড়ী রসুলপুর। সেই চাকর ও সনাতন ও হেমরাণীর সঙ্গে যাহবে, এই ব্যবস্থাই স্থির হইয়াছিল।

সুরবালা দেবী সময় উপস্থিত দেখিয়া, রাণীকে সাজাইয়া গুজাইয়া ফেলিলেন। সমস্ত অলঙ্কার গুলি তাহার গায়ে পরাইয়া দিলেন। ছোট

ষ্টীল ট্রাঙ্কটী খুলিয়া, সমস্ত জিনিস পত্র ভাল করিয়া রাণীকে দেখাইয়া দিয়া, চাবিটি রাণীর আঁচলে বাঁধিয়া দিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

আর ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে রাণীর কণ্ঠদেশের ভিতরটাও একটা তীব্র শোকোচ্ছ্বাসে প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে সুরবালার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কেবলমাত্র বলিল—"মা! মা!" সে আর বেশী বলিতে পারিল না।

সুরবালার চোখেও তখন উন্মুক্ত অশ্রুধারা। রাণীর চোখ মুছাইয়া দিয়া সুরবালা দেবী দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় কাঁদিতে নাই মা! তীর্থ স্থানে যাবার সময় কি কেউ কাঁদে? শ্বশুরবাড়ী যে নারীর মহাতীর্থ।"

বুদ্ধিমতি রাণী, দীর্ঘস্থায়ী ভবিষ্যৎ বিয়োগের তীব্র প্রভাবের উচ্ছাসটা চাপিয়া রাখিয়া বলিল—"আবার আমায় কবে আনবি মা?"

সুরবালা বলিলেন—"আমি মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাইয়া তোমার তত্ত্ব করিব। সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি লিখিব। নিয়মমত আমার চিঠির জবাব দিও। তা হ'লে মনে এতটা কষ্ট হবে না।"

এমন সময়ে সনাতন ডাক দিল—"মা! পালকী আসিয়াছে।"

সুরবালা, রাণীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, পালকীতে তুলিয়া দিলেন। সেই পালকীর সঙ্গে চলিল—প্রহরীরূপে দুইজন পুলিশ কনষ্টেবল। আর এক ভৃত্য। সনাতন সর্ব্বাগ্রগামী। তার মনে আজ বড়ই আনন্দ। কেননা সে তার মাকে শ্বশুর বাড়ী পৌছাইয়া দিতে যাইতেছে।

(২৫)

"বাবাঠাকুর বাড়ী আছেন কি?" বলিয়া সনাতন, রসুলপুরের এক গৃহস্থ বাটীর দ্বারে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে দাঁড়াইয়া বার দুই ডাক পাড়িবামাত্রই

একজন ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া পালকী ও কনেষ্টবলদের দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল "কে গা তোমরা ? এ বাড়ী নয়। তোমাদের বাড়ী ভুল হইয়াছে।"

যে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, সে রাসমোহন স্বয়ং। সেই বিরল অন্ধকারে রাসমোহন একখানা পালকী এবং তার সঙ্গে দুই জন পুলিস কনষ্টেবল দেখিয়া একটু ভড়কাইয়া গিয়াছিল। সে যে বে-আইনী মতে হেমরাণীর বাস্তুভিটা টুকু রুদ্ররামকে এক কোবলা লিখিয়া বিক্রয় করিয়াছিল, সেই কথা সহসা তাহার মনে পড়িল। সে ভাবিল—ব্যাপারটা লইয়া এখন হয়তো একটা ফৌজদারি হাঙ্গাম বধিয়াছে। তাই দারোগা পালকী চড়িয়া তদারকে আসিয়াছে।

সে একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"তোমাদের বাড়ী ভুল হইয়াছে এ বাটীতে পালকী চড়িয়া কোন সোয়ারি আসিতে পারে না—আর তার কোন সম্ভাবনা নাই।"

বিরলান্ধকারের মধ্য হইতেও সনাতন রাসমোহনকে চিনিতে পারিয়া বলিল—"আমরা রাসমোহন চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়ী খুঁজিতেছি ! আমাদের সঙ্গের একজন লোক এই বাড়ী জানে। সেই আমাদের এই বাড়ীতে আনিয়াছে।"

কিন্তু একথা শুনিয়াও রাসমোহনের ভয় বা বিস্ময় গেল না। সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না, সেই পালকীতে কেই বা আছে—আর এদের সঙ্গে কনষ্টেবলই বা কেন ?

রাসমোহন বলিল—"তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ বাপু ?"

সনাতন বলিল—"দেবানন্দপুরের রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর বাড়ী হইতে।"

রাসমোহন। পালকীতে কে আছে ?

সনাতন। আপনার পরিবার।

রাসমোহন। আমার পরিবার ? হেমরাণী ? তুমি কে ? সনাতন না ?"

সনাতন। আজ্ঞে হাঁ—প্রাতঃপ্রণাম বাবাঠাকুর! এতক্ষণ কথাবার্ত্তার পরও যে আমায় চিনিতে পারিলেন না, ধন্য আপনি যাই হোক! এই কথা বলিয়া সে রাসমোহনের পদধূলি লইল।

রাসমোহন এই সনাতনকে খুবই চিনিত। সনাতন বহুবার তাহাদের রসুলপুরের বাটীতে আসা-যাওয়া করিয়াছে। হেমরাণীর স্বর্গগতমাতা বিন্দুবাসিনী দেবী, মাঝে মাঝে রসুলপুরে জামাতার তত্ত্ব লইবার জন্য এই সনাতনকেই দূতরূপে পাঠাইয়া দিতেন।

সনাতন বলিল—"বাবাঠাকুর! মা আমার পালকীতে বসিয়া অনর্থক কষ্ট পাইতেছেন। আগে তাঁহাকে নামাইয়া লইয়া যান।"

রাসমোহন হেমরাণীর হাত ধরিয়া নামাইয়া, তাহাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গিয়া তাহার পিসিমাকে বলিল—"ঘর থেকে বাইরে এসে দেখ পিসি মা! কে এসেছে?"

অষ্টালঙ্কারভূষিতা, বহুমূল্য বিচিত্র কৌষেয়বাসমণ্ডিতা, অপূর্ব্ব রূপসম্পদ শালিনী হেমরাণী—পিসিমার পদধূলি লইল। আর রাসমোহন পালকী ওয়ালাদের পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় করিয়া দিতে, বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিল।

পিসিমা, হেমরাণীকে তত্রাপি চিনিতে পারিলেন না। কেননা তাহার মুখমণ্ডল তখনও অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবৃত। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন—"কাদের মেয়ে গা তুমি?"

রাসমোহন সেখানে ছিল বলিয়া হেমরাণীর মুখখানি ঘোমটা ঢাকা ছিল। এখন সে মুখের ঘোমটাটী খুলিয়া বলিল—"ওমা! আমি তোমাদেরই মেয়ে। তোমারই ঘরের বউ। আমি হেমরাণী।"

পিসিমা এতক্ষণের পর হেমরাণীকে চিনিতে পারিয়া তাহার চিবুকে হাত দিয়া আদরভরে বলিলেন—"এস মা! ঘরের লক্ষ্মী আমার ঘরে এস!

পোড়া চোখে ঝাপসা ধরেছে, আলো আঁধারে ভাল ক'রে দেখতে পাইনি! তাই তোমায় চিনতে পারি নি মা।"

পিসিমা হেমরাণীকে সঙ্গে লইয়া ঘরের মধ্যে গেলেন। একখানি মাদুর বিছাইয়া দিয়া বলিলেন—"বস মা—ওই খানে বস।"

হেমরাণী মাদুরটা একটু মুড়িয়া সরাইয়া দিয়া, মাটীতে বসিয়া বলিল—"আপনি কেমন আছেন পিসি মা!"

পিসিমার চোখে তখন বাণের জল আসিয়াছে। তিনি আঁচলে চোখটা মুছিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আর মা! এখন ওপারে চলে যেতে পারলেই বাঁচি। যাই হোক ভাগ্যের কথা—এই, যে এখন আমার রাস্থর জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে—সে ঘরবাসী হয়েছে। তা তোমার মত এমন সোন্দর বৌকে নিয়ে যে ঘর কর্ত্তে পেলুম না, এই আমার বড়্ডো আপশোষ। তা থাক মা—আমার ঘর আলো করে রাজরাণী হয়ে থাক।"

হেমরাণী বলিল—"গুরুজনের আশীর্ব্বাদে কি না হয় পিসিমা? আশীর্ব্বাদ কর আমাদের। যেন তোমার এই বৃদ্ধ বয়েসে আমি মন খুলে তোমার কিছুদিন সেবা সুশ্রুষা কর্ত্তে পারি।"

"আহা বাছা আমার—লক্ষ্মী মেয়েটী আমার! তুমি চিরায়তী হও, তোমার সিঁথার সিঁদুর চির উজ্জল হয়ে থাক।" বলিয়া পিসিমাতা ঠাকুরাণী হেমরাণীর চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন—"এখন পুকুর ঘাটে গিয়ে পা'টা ধুয়ে এস। ঘরে যা কিছু আছে খেয়ে একটু জল খাও।"

পিতৃমাতৃহীনা হেমরাণী কি করিয়া এই সব অলঙ্কার আর বহুমূল্য কাপড় চোপড় পাইল, তাহা ভাবিয়া পিসিমা মনে মনে বড়ই একটা তীব্র কৌতুহল অনুভব করিলেন। কারণ হেমরাণীর মাতার মৃত্যুসংবাদ, তাঁহার কাণে পৌছিয়াছিল বহু বিলম্বে—অর্থাৎ হেমরাণীর রসুলপুরে আসিবার ঠিক এক সপ্তাহ পূর্ব্বে।

এজন্য পিসিমা রাসমোহনকে প্রায়ই বলিতেন—"এখন মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় তুমি ঘরবাসী হয়েছ বাবা। অমন চাঁদপানা বৌটি আমার! আহা বাছার আমার মা পর্য্যন্ত নেই—তাকে এখানে নিয়ে এসে ঘর সংসার কর, আমি এই বুড়োবয়সে দুদিন একটু আমোদ আহ্লাদ করে, শেষ দিন গুলো কাটিয়ে চ'লে যাই।"

রাসমোহনের চিরকালই গহিরি চাল। "যাচ্ছি-যাবো" গোছের স্বভাব। তাহা ছাড়া সে হেমরাণীর সহিত সেবার যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তার জন্য সে দেবানন্দপুরে যাইতে বড়ই সংকোচ বোধ করিতেছিল। সহসা অতর্কিত ভাবে তাহার পত্নী হেমরাণী কোথা হইতে, চারিদিক আলোকরা দেবীপ্রতিমার মতন, তাহার আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার কারণ সে ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না!

হেমরাণীর উজ্জল কান্তি, তদুপরি সমুজ্জল বেশভূষা, তার উপর বিনা আহ্বানে সহসা রসুলপুরে আগমন ইত্যাদি ব্যাপার রাসমোহনকে বড়ই বিস্মিত করিয়া দিল।

সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, বেহারারা ও সেই দুইজন পুলিশ কনষ্টেবল চলিয়া গিয়াছে। সেখানে একা দাঁড়াইয়া আছে—সনাতন।

রাসমোহন বলিল—"বেহারারা ভাড়া না লইয়া যে চলিয়া গেল সনাতন?

সনাতন বলিল—"আমাদের জমীদার হেমেন্দ্রবাবুর নিজের পালকী আর বেহারা। বেহারা গুলো তাঁর কাছথেকেই তাদের মেহনত আনা পাবে।

বলা বাহুল্য, রমাপ্রসন্নই সনাতনকে এই ভাবে কথা বলিবার জন্য তালিম দিয়াছিলেন! কেননা, ইহাতে রাণীর জলমগ্নের কথা ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা গুলি সবই গোপনে থাকিয়া যাইবে। সুতরাং সনাতন—এই ভাবেই রাসমোহনের প্রশ্নের জবাব দিল।

রাসমোহন ইহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইল না। সে সনাতনকে বলিল—"আমার সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে এস। আগে একটু জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হও। তার পর আহারান্তে আর সব কথা হবে।"

পিসিমা ঠাকুরাণী—হেমরাণী ও সনাতনের জন্য রন্ধন করিতে যাইতে-ছিলেন। হেমরাণী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল—"তোমার দাসী থাকতে তুমি এই রাত্রে সকড়ি হেঁসেল ঘাটবে পিসিমা! একে তুমি চোখে ঝাপসা দেখ!"

পিসিমা প্রদত্ত কয়েক খানা বাতাসা, দুইটী নারিকেল লাড়ু আর চারিটা মুড়ি খাইয়া হেমরাণী বড়ই তৃপ্তিলাভ করিল। এ যে তার নিজের ভাণ্ডারের চির প্রাপ্য, আদরের জিনিস। যেমন নিজের গাছের ফল, নিজের পুখুরের জল, খুব মিষ্টি লাগে, নিজের ঘরের এই মুড়ী ও নারিকেল সন্দেশ হেমরাণীর চক্ষে তার চেয়েও বেশী উপাদেয় বোধ হইল।

হেমরাণী তাহার ট্রাঙ্ক খুলিয়া একখানি পুরু সুরু ধোপদস্ত শাটী বাহির করিয়া পরিল। ভাণ্ডার গৃহ হইতে, তরকারি বাহির করিয়া কুটিতে লাগিল। তার পর উনান ধরাইয়া রান্না চড়াইয়া দিল। এখানে তার যেন কোন বাধা সংকোচ নাই কোন লজ্জা নাই, কোন ভয় নাই। এ যে তার নিজের ঘর। দুই তিনবার যে সে এ ঘর করিয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে সনাতন আসিয়া বলিল—"ওমা! একি ব্যাপার! আমার অন্নপূর্ণা মা যে হেঁসেলে ঢুকেছেন?"

রাণী বলিল—"আজ আমার কত আনন্দের দিন সনাতন! আজ আমি আমার নিজের বাড়ীতে নিজের হাতে রেঁধে তোমাদের খাওয়াব।"

হেমরাণীর হাতখরচের জন্য সুরবালা দেবী কুড়িটী টাকা আর কিছু রেজকী তাহার পেটিকার মধ্যে দিয়াছিলেন। হেমরাণী তাহা হইতে দুইটী সিকি বাহির করিয়া, সনাতনের হাত দিয়া কিছু ঘৃত, ময়দা, মিষ্টান্ন পিসিমার জন্য আনাইয়া লইল।

পল্লীগ্রামের লোক যতই দরিদ্র হোক না কেন—পল্লী গৃহস্থের ভাণ্ডার কখনও শূন্য থাকে না। আনাজ কোনাজ চাল দাল, পল্লী গৃহস্থের ভাণ্ডারে, সে সব দিনে নিত্য মজুত থাকিত। কেন না, সকল বাড়ীতে সকল সময়ে, অতিথি কুটুম্বের আগমন সম্ভাবনা থাকায়, কেহই ভাণ্ডার শূন্য রাখিত না।

যাহা কিছু ঘরে ছিল, তাহা দিয়াই সে অতি পরিপাটী রূপে রাঁধিল। তার পর হাত ধুইয়া, হেসেল পাড়িয়া—পিসিমার জন্য লুচী তৈয়ার করিল। পিসিমা অনেক দিন রাত্রে অভুক্ত অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। কিন্তু আজ হেমরাণীর চেষ্টায় তাঁহার বৈকালিকের ব্যবস্থা বেশ ভাল রকমই হইল।

রাসমোহনের আহার হইয়া গেলে, স্বামীর পাতে অন্নব্যঞ্জনের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল—সে তাহাই হাসি মুখে খাইল। স্বামী-গৃহের তেজের অন্ন যে বড় সুস্বাদ। বড় সুমিষ্ট। সুরবালার অত স্নেহ ও যত্নভরা খাওয়ানর আদরেও, সে এতটা তৃপ্তিলাভ করে নাই!

হায় হিন্দুরমণী! হায় মা! বঙ্গকুললক্ষ্মী! বিকৃত রুচিসম্পন্ন তথা-কথিত উন্নতসভ্যতাময় জগতের বুকে দাঁড়াইয়া, আজ তোমরাই কেবল নিজে-দের চরিত্রগত এই বিশিষ্টতা ও মহত্ত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। থাক মা—চিরদিনই তোমরা স্বামীর সংসারে সোহাগিনী সম্রাজ্ঞী হইয়া থাক। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর যেন এ বিশিষ্টতা, এ গর্ব্ব, এ আনন্দ, এ আত্মপ্রসাদ, কখনও না বিমলিন হয়।

(২৬)

আহারাদি শেষ করিয়া, রাসমোহন শয্যায় শুইয়া হেমরাণীর আগমন প্রতীক্ষায় সময়ক্ষেপ করিতেছে। কখন আসে—এই এল, অই আসিতেছে—এইরূপ একটা আগ্রহপূর্ণ আকাঙ্খা, বহুদিন পরে আজ যেন তাহার মনে বিরাজ করিতেছে।

সেই এক দিন—আর এই এক দিন। তখন সে হেমরাণীকে বিনাপরাধে প্রত্যাখান করিয়াছিল, কিছু টাকার জন্য। আর আজ সে সাগ্রহে প্রত্যাশা করিতেছে—তাহাকে একবার দেখিবার জন্য। তাহার কাছে কৃতাপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষার জন্য। আর তাহাকে দুইটা আদরের ও সোহাগের কথা বলিবার জন্য।

যথাসময়ে দ্বার পার্শ্বে মৃদু ভূষণশিঞ্জন শ্রুত হইল। হেমরাণী, হাস্যমুখে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারটী ভেজাইয়া দিয়া, মরালগতিতে স্বামীর নিকটস্থ হইয়া, তাহার পদধূলি লইল।

রাসমোহন লজ্জাবিজড়িত স্বরে বলিল—"হেমরাণি! তোমার কাছে আমি বড়ই অপরাধী। কেমন নয় কি?"

হেমরাণী বলিল—"আমিও কি তোমার কাছে অপরাধিনী নই।"

রাসমোহন। বল—তুমি আমার পূর্ব্বাপরাধ মার্জ্জনা করিলে।

হেমরাণী। তুমিও বল, যে আমার মত হতভাগিনী অপরাধিনী পত্নীকে ক্ষমা করিলে?

রাসমোহন হেমরাণীর কথার ভঙ্গীতে হাসিয়া ফেলিল। জীবন্ত স্বর্ণ প্রতিমা তুল্য হেমরাণীকে সে তাহার পার্শ্বে বসাইয়া, তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"কেমন ছিলে তুমি হেমরাণী!"

হেমরাণী বলিল—"যেমন তুমি রাখিয়াছিলে।"

রাসমোহন ভাবিল—এটা কি বিদ্রুপ? কিন্তু সে হেমরাণীর মুখের দিকে চহিয়া বুঝিল, এ কথায় বিদ্রুপের লেশমাত্র নাই।

রাসমোহন দেখিল—বর্ষার গঙ্গা যেমন কাণায় কাণায় উছলিয়া উঠে, ভরা যৌবনে রাণী সেই ভাবেই সৌন্দর্য্যে ভরপুর। সে রূপ দেখিলে, কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে হয়।

রাসমোহনের মনে বড়ই একটা কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছিল—রাণী

এ সব গহনা ও ভাল কাপড় পাইল কোথায় ? সে মনে মনে ভাবিল, হয়তো তাহার পিতৃ-পরিত্যক্ত অর্থে, রাণী এই সব অলঙ্কার গুলি গড়াইয়াছে। সুতরাং সে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে বড়ই লজ্জা বোধ করিল।

রাণী স্বামীর হাত দুখানি ধরিয়া বলিল—"আমি তোমার চরণাশ্রিতা দাসী। আমার একটী অনুরোধ রাখিবে কি ?"

রাসমোহন। নিশ্চয়ই রাখিব। জানিও হেমরাণী! আমি এখন আর সেই নষ্টচরিত্র নেশাখোর রাসমোহন নই।

রাণী। বল—চিরদিন আমায় এই ভাবে চরণে আশ্রয় দিবে।

রাসমোহন। এটা কি বেশী কথা হেমরাণী ? স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য যা, তা আমি এক দিনও করি নাই। তোমার মত সুন্দরী গুণবতী পত্নীকে ত্যাগ করিয়া, এক হীন চরিত্রা কুৎসিতার সাহচর্য্যে জীবনের একটা প্রধান অংশ কাটাইয়া দিয়াছি। আমি তোমায় এত দিন চিনিবার মত করিয়া চিনি নাই, দেখিবার মত দেখি নাই। আমার পাপের সীমা নাই, মার্জ্জনা নাই। তুমি স্বামী বলিয়া মার্জ্জনা করিতে পার, কিন্তু ভগবান তা করিবেন না!

রাসমোহন এই কথাগুলি তাহার প্রাণের ভিতর হইতেই বলিয়াছিল। সত্যসত্যই তাহার মনে বড়ই একটা অনুতাপ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং মনের ভাব ব্যক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে, বুকের বোঝাটা কমিয়া গিয়া তাহার চোখে জল আসিল।

হেমরাণী নিজের অঞ্চলে সেই অশ্রুধারা মুছাইয়া দিয়া বলিল—"তুমি আমার স্বামী—দেবতা—তুমি যাহা করিয়াছ ভালই করিয়াছ। এজন্য তোমার অনুতপ্ত হইবার কোন প্রয়োজনই নাই। তোমার সুখ যাহাতে, আনন্দ যাহাতে, তাহাতেই আমি সুখী। তাহাতে বাধা দিবার আমি কে ? কেননা আমি মনে মনে খুব ভালই জানিতাম, একদিন না একদিন তোমার এ

মোহ কাটিয়া যাইবে। মেঘমুক্ত চন্দ্রের মত আবার তুমি হাসির কৌমুদী ছড়াইয়া, আমার অন্ধকারময় প্রাণকে উজ্জলিত করিবে। বাবা যখন তখন বলিতেন—"সেটা অতীত—সেটা মৃতের দাখিল। যাহা চলিয়া গিয়াছে, তার জন্য আর ভাবিতে নাই।" সমুজ্জল বর্ত্তমান এখন আমাদের সম্মুখে! এস এই বর্ত্তমানকে আশ্রয় করিয়া, আমরা চির সুখী হই।"

হেমরাণীর মুখে, এত উঁচুদরের কথা, রাসমোহন আর কখনও শুনে নাই। সে মনে মনে ভাবিল, বিধাতা দয়া করিয়া এক উজ্জ্বল রত্ন আমার কণ্ঠে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। আমি তাহা নিজের বুদ্ধির দোষে হারাইতে বসিয়া ছিলাম। যখন আবার তাহা ফিরিয়া পাইয়াছি, দেবতার সেই অমূল্য দান আবার আমার হস্তগত হইয়াছে, তখন খুব সাবধান হইয়া চলিব, যাহাতে আর কখনও না আমার মতিভ্রম হয়।"

রাসমোহন আবেগভরে হেমরাণীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া, তাহাকে চুম্বন করিল। সে চুম্বনে প্রবল অনুরাগ ফুটিয়া উঠিল।

রাণীর জীবনে আজ প্রথম সুখের রজনী। সে দেখিল, আকাশের চাঁদ যেন অতি উজ্জ্বল। জ্যোৎস্না-প্লাবিত প্রকৃতির অঙ্গে, কে যেন অপূর্ব্ব শুভ্র লাবণ্য ফুটাইয়া দিয়াছে। কোথা হইতে বনফুলের গন্ধ আসিয়া, যেন তাহাকে আকুল করিয়া দিতেছে। মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া সে বলিল—"প্রভু! এই ভাবে সুখের সঙ্গীতে বিভোর হইয়াই, যেন আমাদের দুজনের জীবনের দিনরাত গুলি কাটিয়া যায়।"

আমরা ঠিক বলিতে পারি না, ভগবান রাণীর এ প্রাণের প্রার্থনাটী শুনিয়াছিলেন কি না?

পর দিনের প্রভাতে সকলের উঠিবার আগে, রাণী শয্যা হইতে উঠিয়া, গৃহস্থ সংসারের প্রয়োজনীয় পাটসাট যাহা কিছু সবই করিয়া ফেলিল। এই সব কাজ লোকাভাবে পিসিমা ঠাকুরাণীকেই স্বহস্তে করিতে হইত।

সনাতন চিরদিনই খুব প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে। রাণী সংসারের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া বহির্ব্বাটীতে গিয়া দেখিল, সনাতন কলিকাটী হাতে লইয়া তামাকু খাইতেছে।

রাণী তাড়াতাড়ি সনাতনের হাতে একটা টাকা দিয়া বলিল—"আর একটু বেলা হ'লে, তুমি বাজারে গিয়ে, চাল দাল ছাড়া সংসারের প্রয়োজনীয় আনাজ-কোনাজ মাছ তরকারী গুছিয়ে নিয়ে এস। আমি এখন সংসারের কাজ করিগে।"

সনাতন টাকাটী ট্যাঁকে গুজিয়া, রাণী চলিয়া যাইবার পর একটু হাসিয়া, মনে মনে বলিল—"ও বেটী! একরাত্রের মধ্যেই তুমি এই সংসারের গিন্নি হয়ে পড়েছ? আহা! ভগবান করুন, তুমি যেন চিরসুখী হও। অনেক কষ্ট পেয়েছ তুমি মা আমার। এখন তোমাকে সুখী দেখ্‌তে পেলে, তোমার ধর্ম্ম ছেলে সনাতন খুবই খুসী থাকবে।"

সেদিন আর পিসিমাকে হেঁসেলে যাইতে হইল না। আর কখনও যে হইবে, যেন তাহারও কোন সম্ভাবনা রহিল না। এই পিসিমা ঠাকুরাণীই, রাসমোহনকে বাল্যকাল হইতেই কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। রাসমোহন যতই নষ্টবুদ্ধি হৌক না কেন, সে পিসিমাকে বড়ই ভক্তি করিত। বিশেষতঃ তাহার পিতা মাতার মৃত্যুর পর হইতে, এই পিসিমাই তাঁহার সংসার বজায় রাখিয়া চলিতেছিলেন।

হেমরাণীকে পাইয়া, পিসিমার শেষ জীবনের অন্ধকারময় দিনগুলি খুবই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আর রাসমোহনও মনে ভাবিয়া দেখিল, এক উজ্জ্বল উষার পবিত্রালোক, তাহার গৃহ ব্যাপিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে আলোকে তাহার গৃহকক্ষের অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে। সে হেমরাণীকে অতীত কালের কোন কথাই প্রাণ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না, কেননা সে আজীবনই তাহার উপর এমন একটা অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, যাহার

মার্জ্জনা নাই। আর এটুকুও সে বুঝিত যে কষ্টময় অতীতের উপর একটা যবনিকা টানিয়া না দিলে, তাহার সুখে ভরা এই বর্ত্তমানটি বড়ই বিষময় হইয়া পড়িবে।

(২৭)

মানুষের অদৃষ্টে যখন কুগ্রহ গুলি দল বাঁধিয়া তাহাদের শক্তি বিকাশ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার রক্ষা পাওয়া খুবই অসম্ভব হইয়া উঠে। দর্পিত, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিহীন মানব যতই স্পর্দ্ধা করুক না কেন, একদিন না একদিন তাহার জীবনে এই বিরুদ্ধ গ্রহফল প্রকট হইয়া, তাহাকে খুবই দিশাহারা করিয়া ফেলে।

হেমরাণীর তখনও গ্রহের ফের কাটে নাই—কাজেই তাহার নূতন করিয়া গড়া, এই পবিত্র সংসার জীবনে, একদিন একটা প্রলয় ঝঞ্ঝা উঠিল। তাহাতে তাহার সুখ, মনের শান্তি, স্বামীর আদর, ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন সবই একদণ্ডে চুরমার হইয়া গেল।

তাহার কারণ কি বলিতেছি। রুদ্ররাম, রাসমোহনের সহিত কতক গুলি জোতজমী ভাগে চাষবাস করিত। সেই সময়টা চাষের সময়। কাজেই রুদ্ররাম এ সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিবার জন্য, সহসা একদিন রসুলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রামে পৌঁছিবার পর দিনের প্রভাতে, সে সরাসর রাসমোহনের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। রাসমোহন চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তাহার জমীজমার কাগজ পত্র দেখিতেছে, আর একটী ছোট হুঁকায় নল লাগাইয়া তামাকু টানিতেছে।

সনাতন, ঠিক ইহার দুইদিন আগে, রসুলপুর হইতে হেমরাণীর নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং রুদ্ররাম জানিতেও পারিল না, যে সনাতন সে বাটীতে আসিয়াছিল।

রুদ্ররাম চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়াই যোড় হস্তে বলিল—"প্রণাম দাদা ঠাকুর! ষয়কর্ম্মে আজকাল যে বড়ই আটা দেখ্‌ছি।"

রাসমোহন তাহার হাতের হুঁকাটী নামাইয়া, সহাস্যমুখে বলিল—আরে! রুদ্দুর দাদা যে! সহসা কি মনে করে?"

রুদ্ররাম দেখিল, রাসমোহনের চেহারাটা খুব ভালর দিকে পরিবর্ত্তন ইয়াছে। তাহার সেই বিশীর্ণ দেহে যেন একটা লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। র-অপ্রসন্ন মুখে আনন্দ ফুটিয়াছে। সহসা এ পরিবর্ত্তনের কারণ যে কি তা সে ঠিক ধরিতে পারিল না।

কিন্তু তাহার মনে তখন যে কথাটা বড়ই জোর করিয়া উঠিতেছিল, টাকে চাপিয়া রাখাও তাহার পক্ষে বড় অসম্ভব বোধ হইল। সুতরাং সে লিল—"শুনি ভায়া! ব্যাপারটা কি? চেহারাটা খুব ভালই দেখ্‌ছি যে?"

রাসমোহন। ব্যাপার বড় বেশী কিছু নয়। তবে আজকাল সংসারে কিয়া, গিন্নির একটু সেবা যত্ন পাইতেছি।

'গিন্নি' কথাটা শুনিয়া রুদ্ররাম একটু দমিয়া গেল। হেমরাণীর জলে ডাবার সংবাদ, সে তার মনিবের আর তারামণির মুখে, সবই শুনিয়াছিল। তরাং সে কৌতুহলবশে বলিল—"বলি ভায়া! আবার কি দ্বিতীয় পক্ষে ংসার করেছো, না কলকেতার সেইটাকে ঘরে এনে পুরেছো।"

কথাটা শুনিয়া রাসমোহন মনে মনে একটু রাগিল। এই চাষা-কুলোদ্ভব দ্ররাম যে এতটা স্বাধীনতা লইয়া কথাবার্ত্তা কয়, এটা তার মনের ইচ্ছা য়। কাজেই সে বলিল—"দেখ রুদ্ররাম দাদা! চিরদিন ত মানুষের একভাবে যায় না। সত্য বটে, একদিন ভ্রমে পড়িয়া, এক প্রেতিনীর কবল ত হইয়া, অনেক পয়সা নষ্ট করিয়াছি। কিন্তু আমার সে মোহ এখন টিয়া গিয়াছে। আমার ধর্ম্মপত্নী হেমরাণীকে এতদিন আমি চিনিতে পারি াই। সেই এখন আসিয়া আমার সংসার আলো করিয়া আছে।"

হেমরাণীর নাম শুনিবামাত্রই রুদ্ররাম চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"বটে—বটে—তা বেশ! ভায়া! তুমি সুখী হও এই ত আমার ইচ্ছা। চিরদিন বথামি করে, ঘর সংসার ছেড়ে বেড়ান কি ভাল? তা হ'ল ভাল। একদিন বৌদির হাতের রান্না চারিটি প্রসাদ খেতে পাব।"

মুখে এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিলেও, তাহার মনের মধ্যে একটা দারুণ সন্দেহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল—"তবে কি হেমরাণী জলে ডুবিয়া মরে নাই? আমার মনিব সুরেন্দ্রবাবু কি তাহা হইলে আমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে প্রবঞ্চনা করিলেন? না—না, অসম্ভব! আর তারামণি, সেই বা আমাকে মিথ্যা বলিবে কেন? এই হেমরাণী নিশ্চয়ই জলে ডুবিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া গিয়াছে।"

সংবাদটা তাহার পক্ষে তখন যেন একটা সমস্যার মত হইয়া দাঁড়াইল। সে মনে মনে ভাবিল—"সত্যই এ সেই হেমরাণী কি না—তাহা একবার ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। হেমরাণী ত আরও দুই তিন বার এ বাড়ীতে আসিয়াছিল। আমার স্ত্রী তাহাকে খুব ভালরূপই জানে। তাহাকে একবার কোন অছিলায়, ইহাদের বাড়ী পাঠাইয়া আজই এ রহস্যের, এ সন্দেহের একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিব।"

রুদ্ররাম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"দাদাঠাকুর! আমি যে জন্য এসেছিলুম, সে কথাটাও এইবার শেষ করে যাই। বলি এবারেও জমীগুলো ভাগে চাষ করা তোমার মত ত ভাই? আমি মোটে তিন দিনের ছুটী নিয়ে এসেছি। আর কিছু টাকাও তোমাকে দেবার জন্য জোগাড় ক'রে এনেছি। বল ত দিয়ে যাই।"

রাসমোহন সহাস্য মুখে বলিল—"এ বৎসরটা ত ভাগে চাষ চলুক। আস্‌ছে বছর দু'জনে যুক্তি করে যা হ'য় করা যাবে। তা টাকা দেবে কবে?"

"আজই—এখনিই" বলিয়া রুদ্ররাম তাহার জামার বুক-পকেট হইতে

পাঁচখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া, রাসমোহনের হাতে দিয়া বলিল—"খাজনার স্বরূপ অগ্রিম কিছু নাও। আবার একমাস পরে দেশ এসে আরও কিছু দিয়ে যাব।"

রাসমোহন হাসিমুখে টাকাগুলি লইয়া বলিল—"ওদিকের সংবাদ কি বল দেখি ভায়া?"

রুদ্ররাম। কোন দিকের?

রাসমোহন। আমার শ্বশুরের সেই ভিটার সম্বন্ধে? আমি ভাবছি এত গোলযোগের ভেতর না থেকে হেমরাণীকে সব খুলে বলি, আর তোমার কর্জ্জার টাকাটারও জোগাড় করি। টাকাটা পেলেই তুমি কোবালাখানা আমাকে ফিরিয়ে দিও।

রুদ্ররাম জিভ্ কাটিয়া বলিল—"সাবধান! ও রকম ছেলে মানুষী করো না। হেমরাণীকে একথা বলবার এখন দরকারই বা কি? কাজটা গোপনে আরম্ভ হয়েছিল—গোপনেই শেষ হবে। তুমি টাকাটার জোগাড় করতে থাক। কব্‌লাখানা ফিরিয়ে দোবার ভার আমি নিলুম। আমার মনিবকে জান ত ভাই। সে থানা আমার নামে আছে তাও জান তো? টের পেলে এখনি একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে বস্‌বে।"

রাসমোহন বলিল—"তুমি যা বল্‌ছ তাই হবে। তা একদিন এ বাড়ীতে প্রসাদ পাবার কি হবে বল?"

রুদ্ররাম হাসিয়া বলিল—"এ আর বেশী কথা কি? অনেক ভাগ্য কল্লে, ব্রাহ্মণের পাতের ভাত মেলে। তা আজ দুপুর বেলা বৌকে পাঠিয়ে দোব। তাকে একটু তরকারি দিলেই আমার পুরো প্রসাদ পাওয়া হবে।"

রাসমোহন হাসিয়া বলিল—"বেশ তাই হবে! কিন্তু বেশী বেলা করো না। হেমরাণী রাঁধেও খুব ভাল, আর সকাল সকাল হেঁসেল তুলে দেয়।"

রুদ্ররাম রাসমোহনের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। আর শয়তান

রুদ্ররাম তাহার পত্নীকে যথামত উপদেশ দিয়া, মধ্যাহ্ন পূর্ব্বে রাসমোহনে বাটীতে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য—এই প্রসাদ গ্রহণের অছিলায়, তাহার পত্নীর মারফৎ, সে হেমরাণীর পুনরাগমন সম্বন্ধে সমস্ত সঠিক সংবাদই সংগ্রহ করিয়া, সেই দিন অপরাহ্নে রামানন্দপুরে চলিয়া গেল। সে ভাবিল, যে সংবাদটা সংগ্রহ করিলাম, আমার বাবুকে স্থবিধা মত বেচিতে পারিলে বেশ দু'পয়সা আদায় হইবে। এবার আর তারামণিকে ভাগ দিতেছি না।

সংসারে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা বিনা কারণে পরের অনিষ্ট করিয়া একটা বিশেষ আনন্দ ভোগ করে। কিন্তু যেখানে এই সহজাত অনিষ্টকারিতা শক্তির সহিত, কোন স্বার্থ বিজড়িত থাকে, তখন পরের সর্ব্বনাশ ও অতি নির্দ্দোষীর অনিষ্ট করিতে, সেই ক্রূরকর্ম্মা ব্যক্তি ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করে না।

স্থতরাং রুদ্ররাম, তাহার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, প্রথমেই রাসমোহনকে একখানি পত্র লিখিল। আর এই পত্রখানি রেজিষ্ট্রী করিয়া, তাহা তৎপর দিনই ডাকে পাঠাইল।

পত্রে যাহা লেখা ছিল, এস্থলে তাহার পুনরুদ্ধার করিয়া এই পরিচ্ছেদটীকে কলঙ্করেখায় রঞ্জিত করিতে চাহি না। তাহাতে হেমরাণীর চরিত্রহীনতা, এক রাত্রি স্থরেন্দ্রকুমারের উদ্যানে বাস, তারপর পা পিছলাইয়া নদীর জলে ডুবিয়া যাওয়া, এই সব কথাই বেশী বেশী ছিল। কিন্তু স্থরেন্দ্রকুমার যে শ্মশানঘাট হইতে তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায় বা স্থরেন্দ্র ও সে নিজে এ ব্যাপারে প্রধান অভিনেতা, সে কথার কোন নামগন্ধও ছিল না।

এই পত্রের দ্বারাই শয়তান রুদ্ররামের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইল। হতভাগা রাসমোহন চিরদিনই নির্ব্বোধ আর লঘুচিত্ত। সে তার এই রুদ্ররাম দাদাকে

পরম হিতকারী বন্ধু বলিয়াই জানিত। কোন বিষয় তলাইয়া বুঝিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। সুতরাং রুদ্ররামের পত্র পড়িয়া, সহসা সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ রুদ্ররাম লিখিয়াছিল—"আমি যাহা লিখিলাম, তাহা সত্য কিনা, তাহার প্রধান সাক্ষীই তোমার ধর্ম্মপত্নী হেমরাণী। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে—সে যদি তোমার প্রশ্নের সত্য উত্তর দেয়, তাহা হইলে আমার কথাগুলি প্রকৃত কি না, তাহা তুমি ধরিতে পারিবে। তবে ভায়া! এ সব ব্যাপার লইয়া যেন একটা কেলেঙ্কারী করিয়া বসিও না। এ সকল ঘটনার পরও যদি তুমি হেমরাণীকে লইয়া ঘর সংসার করিতে ইচ্ছা কর করিও, না কর কোনরূপ হাঙ্গামহুজ্জুত না করিয়া তাহাকে মানে মানে বিদায় করিয়া দিও। আমার কর্ত্তব্য আমি করিলাম।"

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই এই সাংঘাতিক পত্রখানি রাসমোহনের হস্তগত হইয়াছিল। পত্রখানি আগাগোড়া, একবার নয়, দুই তিনবার পাঠ করিবার পর তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। রুদ্ররামের লিখিবার ভঙ্গী, আর হেমরাণীর এতদিন পরে পুনরাগমন, এই সব ঘটনায় তাহার মনের অবস্থা একাবারে ওলট-পালট হইয়া গেল। এরূপ সংকটে চিত্ত স্থির রাখিতে পারে, তেমন হুঁসিয়ার মন তার নয়। পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রও দুর্ম্মুখমুখে সীতার বিরুদ্ধে অপবাদ শুনিয়া, লক্ষ্মীরূপিণী সীতাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তা রাসমোহন ত অতি ছার ক্ষুদ্র কীট! সে প্রাণের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া, বাটীর বাহিরে চলিয়া গেল। কোথায় যে গেল—কেহ তাহা জানিতে পারিল না।

ক্রমশঃ রাত্রি বেশী হইতেছে, অথচ রাসমোহন এখনও বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছে না, এজন্য পিসি-মা বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া হেমরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ বৌমা! রাত্রি ত দশটা বেজে গেছে। তা রাসমোহন এখনও বাড়ী ফিরছে না কেন? তোমাকে সে কি কিছু বলে যায় নি?"

হেমরাণী বলিল—"না পিসি-মা! আমায় ত তিনি কিছুই বলে যান নি!"

আর এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া পিসি-মা শয্যা আশ্রয় করিলেন। হেমরাণী নিজের ঘরে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আশা-প্রতীক্ষার যন্ত্রণা বড় ভয়ানক। এই আসে—এই আসে, তবু পদশব্দ পাওয়া যায় না। এটা বড় কষ্টকর অবস্থা। যে হেমরাণী এত দিন মুখ বুজিয়া পতির অদর্শন কষ্ট সহিয়া আসিয়াছে, আজ কয়েক ঘণ্টার অদর্শনে, সে বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমাগতঃ দর্শন আর সাহচর্যের পরিণাম, এইরূপ একটা শঙ্কাময় আকুলতাই আনিয়া দিয়া থাকে।

সহসা হেমরাণী একটী পরিচিত পদশব্দ পাইবা মাত্র তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া দেখিল—দালানের এক অন্ধকারময় স্থানে দাঁড়াইয়া রাসমোহন।

হেমরাণী বলিল—"ঘরের ভিতরে এস। ওখানে দেয়ালে মাথা রাখিয়া দাঁড়াইয়া কি করিতেছ?"

রাসমোহন কোন উত্তর না করিয়া, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি কেদারায় বসিল। একবার মাত্র হেমরাণীর মুখের দিকে বিকট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, আবার সে নিজ মনে কি ভাবিতে লাগিল।

হেমরাণী একখানি পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে আসিল। রাসমোহন হস্তেঙ্গিতে নিষেধ করিয়া, হেমরাণীর মুখের উপর তাহার বিকট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কঠোর কণ্ঠে ডাকিল—"হেমরাণি!"

এ আহ্বানে প্রেমের সরসতা নাই, স্নেহ নাই, আদর নাই, সজীবতা নাই। এ যেন অতি কঠোর ও প্রাণহীন সম্বোধন! হেমরাণীর প্রাণের ভিতর যেন কি এক রকম করিয়া উঠিল।

সে বলিল,—"তুমি অমন করিতেছ কেন? তোমার কি কোন অসুখ করিয়াছে?"

রাসমোহন বিকট হাস্যের সহিত বলিল,—"নিশ্চয়ই তাই! আমার

অসুখ অতি ভয়ানক! তার চিকিৎসা নাই, ঔষধ নাই, শান্তি নাই, চিকিৎসা করিবার লোকও পৃথিবীতে জন্মায় নাই।"

হেমরাণী রাসমোহনের ভাবগতিক আর কথার ভঙ্গী দেখিয়া, মনে মনে ভয় পাইয়া বলিল—"কি বলিতেছ তুমি? তাহার অর্থ যে আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"পারিবে—এখনিই পারিবে। এই পত্রখানি একবার পড়িয়া দেখ।" এই কথা বলিয়া রুদ্ররামের লিখিত সেই সাংঘাতিক পত্রখানি রাসমোহন হেমরাণীর হাতে দিল।

পত্রপাঠ শেষ করিবামাত্রই হেমরাণীর মুখখানি শবের মত মলিন হইয়া গেল। তার প্রাণের ভিতর কেমন একটা তীব্র যাতনা ফুটিয়া উঠিল। সে আতঙ্কে, ভবিষ্যৎ অমঙ্গলাশঙ্কায়, যেন কেমনতর হইয়া পড়িল।

তারপর সে কম্পিতপ্রাণে শুষ্ককণ্ঠে বলিল—"এই রুদ্ররাম আমাদের চির-শত্রু। তার জন্যই আজ আমার এ দুর্দ্দশা। সে ঘোর শয়তান। আমার কথাটা শুনিবার আগে তাহার কথাটা কি তুমি এত সহজে বিশ্বাস করিতে চাও?"

রাসমোহন বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"চাই বই কি? এতদিন তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আর করিবও না ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু আজ করিতেছি। সত্য বল দেখি—তুমি এক দিন রাত্রে ছোট তরফের নষ্ট চরিত্র জমিদার সুরেন্দ্রকুমার রায়ের আমেদপুরের বাগানে ছিলে কি না?"

শয়তান রুদ্ররাম তাহার পত্রে সকল কথারই অবতারণা করিয়াছিল কেবল করে নাই, তাহার নিজের কথা। সমস্ত দোষটা অবশ্য তারামণির উপর চাপাইয়া, সে ফাঁক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাজেই সন্দিগ্ধচিত্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন রাসমোহন, সহজেই রুদ্ররামের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিল। কারণ যে ধরণের শিক্ষা ও উন্নত জ্ঞান থাকিলে এ সব স্থলে, একটা বুদ্ধি খরচ

করিয়া লোকে ভালমন্দ বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, সম্ভব বা অসম্ভব তলাইয়া দেখিতে পারে, তাহার সে জ্ঞান ছিল না। ক্রমাগত কুৎসিৎ সংসর্গে থাকিয়া, নেশা ভাঙ্গ করিয়া তাহার মগজটা অনেকদিন হইতেই বিগড়িয়া গিয়াছিল। আর রুদ্ররাম নিজের নীচ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাহা আরও খারাপ করিয়া দিয়াছিল।

হেমরাণীকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া রাসমোহন কঠোর স্বরে বলিল "চুপ করিয়া রহিলে যে? সত্য কথা বলিতে ভয় পাইতেছ?"

হেমরাণী তখন মনে মনে বুঝিতে পারিল, সময় আর অবসর মত সকল কথা এর আগে, তাহার এই নির্ব্বোধ স্বামীকে খুলিয়া না বলিয়া, সে বড়ই অন্যায় ও অবিবেচনার কাজ করিয়াছে। কোথা হইতে যে লুক্কায়িত কালসর্পরূপী রুদ্ররাম, তাহাকে এভাবে ভীষণ দংশন করিবে, তাহাও ত সে জানিত না। এজন্য সে কেবলমাত্র বলিল—"হাঁ আমি ছিলাম বটে।"

তারপর সে সাহস সঞ্চয় করিয়া, তাহার মাতার মৃত্যুর রাত্রের সমস্ত ঘটনা, শিবরামপুরের বাগানে গুপ্তভাবে সুরেন্দ্র ও তারামণির ভীষণ চক্রান্ত, আত্মরক্ষার্থে নদীজলে নিমজ্জন, শিবশঙ্কর বাবু কর্তৃক উদ্ধার, প্রভৃতি সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিল।

উষ্ণ মস্তিষ্ক রাসমোহন সব শুনিল। কিন্তু বিশ্বাস করিল না। কেন না রুদ্ররাম যে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে, তাহার ক্রিয়া বড়ই তীব্র হইয়া তাহার বিবেচনা শক্তিকে লোপ করিয়া দিয়াছিল।

সুতরাং সে অতি কঠোর কণ্ঠে বলিল—"যখন তুমি সেই উদ্যানে একটি রাত্রি কাটাইয়াছ, তখন তুমি আর আমার ধর্ম্মপত্নী নও—আমার পরিত্যজ্যা। তোমাকে ধর্ম্মপত্নী রূপে গৃহে আশ্রয় দিয়া আর আমি কলঙ্কিত হইতে চাহি না। আজি হইতে এ গৃহে আর তোমার স্থান নাই। আজ হইতে তোমার সহিত আমার সকল সম্পর্কই লোপ হইল। তুমি—ঘৃণিতা—কলঙ্কিতা! তোমাকে স্পর্শ করিলেও পাপ!"

অভাগিনী হেমরাণীর বুকে এই কথাগুলি শত বজ্রের মত আঘাত করিল। অতটা যাতনা সহিতে না পারিয়া, সে কাঁদিয়া ফেলিল। রাসমোহনের পদ যুগল অশ্রুজলে ধোয়াইতে ধোয়াইতে বলিল—"স্বামী তুমি! দেবতা তুমি! আমার ইষ্ট তুমি! উপাস্য তুমি! তুমি আজ আমায় একথা বলিলে? যার বাড়া স্ত্রীলোকের কলঙ্ক নাই, স্বামী হইয়া আজ তুমি আমার চরিত্রে সেই কলঙ্ক দিলে? একবার ভাবিয়া দেখিলে না—বিচার করিলে না? আমায় জন্মের মত পরিত্যাগ করিলে? আমি যদি সতী হই, স্বামী ভিন্ন অপর কাহারও চিন্তা আমার মনে কখনও উদয় না হইয়া থাকে, তোমার এত অত্যাচারে, লাঞ্ছনায় পীড়নে, যদি আমি তোমাকে আমার উপাস্য দেবতারূপে পূজা করিয়া আসিয়া থাকি, তাহা হইলে জানিও, তোমার ঐ মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া, আমি এ ভীষণ কলঙ্ক মুখ বুজিয়া সহ্য করিব। কিন্তু একদিন যখন প্রকৃত কথা প্রকাশ পাইবে—সেই দিন তোমাকে আমার জন্য কাঁদিতে হইবে। কিন্তু তখন তুমি হয় ত এ জগতে আমার সন্ধানও পাইবে না। ইহলোকের সীমা হইতে আমি অনেক দূরে আর এক রাজ্যে চলিয়া যাইব।"

রাসমোহন বলিল—"ও সব কথায় আমি আর ভুলি না। সাতদিন পরে আমি আবার এ বাড়ীতে ফিরিব। ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখি, যে তুমি তখনও এ বাড়ীতে আছ, তাহা হইলে তোমায় অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিব। সে অপমান ও লাঞ্ছনা যদি সহ্য করিতে প্রস্তুত থাক, তাহা হইলে আমার কথার বিরুদ্ধাচরণ করিও।"

এই কথা বলিয়া রাসমোহন কক্ষ হইতে বাহিরে যাইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল। হেমরাণী তাহাকে বাধা দিবার জন্য তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"নারায়ণ জানেন—আমি নির্দ্দোষী। যে নারায়ণ সর্ব্বান্তর্য্যামী, তিনি তোমার ও আমার মনের ভিতরে কি আছে সবই দেখিতেছেন। তিনিই একদিন এর বিচার করিবেন। এখনও ভাবিবার

সময় আছে, এখনও বিবেচনার সময় আছে। আজন্ম দুঃখিনী আমি। সবাই আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে! তুমি আমায় ত্যাগ করিও না!"

পাষাণ প্রাণ রাসমোহনের হৃদয় এ অশ্রুজলে একটুও কাঁপিল না। সে নির্ম্মম হৃদয়ে একটুও করুণার সঞ্চার হইল না। সে রাণীকে পদাঘাত করিয়া বীরত্ব ফলাইয়া, সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

আর হেমরাণী! তখন তাহার মাথা ঘুরিতেছে। চোখের সম্মুখে সে মৃত্যুর অন্ধকার দেখিতেছে। সমগ্র বিশ্ব যেন তাহার চোখে 'ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। তাহার হৃদয়ে যেন শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। মৃত্যুর মত একটা অবসাদময় শৈত্য আসিয়া তাহার সর্ব্ব দেহকে গ্রাস করিতেছে। তখন তাহার অবস্থা এত শোচনীয়, সে মাটী হইতে উঠিতে পারিল না। সে ছিন্ন বল্লরীর মত ভূমে পড়িয়া, চোখের জলে ভাসিয়া, সমস্ত রাত্রিটা কাটাইয়া দিল।

(২৮)

শয়তান রুদ্ররাম, সকল কাজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রামানন্দপুরের দিকে ছুটিল। তাহার মনের বিশ্বাস, হেমরাণীর পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে এই অদ্ভুত সংবাদটা তাহার মনিবকে বেচিতে পারিলে, সে নগদা-নগদি কিছু মোটা রকমের পুরস্কার লাভ করিবে।

সুরেন্দ্র তখন শিবরামপুরের বাগানেই ছিল। তাঁহার মন হইতে কোন মতেই হেমরাণীর সেই শোচনীয় পরিণামের কথাটা মুছিতেছিল না। এজন্য তাহার মনে একটা ভয়ানক আফ্‌শোষ, ভয়ানক যাতনা।

সে যাতনা নাশ করিবার জন্য, সে সে মদের মাত্রা বাড়াইল। তাহাতে তাহার অবস্থা দিন দিন অতি শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল। আর সে এই পানদোষের আধিক্যে আরও অবনতির স্তরে নামিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর স্থরেন্দ্র তাহার শিবরামপুরের বাগান-বাটীর কক্ষ মধ্যে তাহার দেহের আরামবিধায়ক সেই আরাম-চৌকীখানির উপর শুইয়া চোখ বুজিয়া একান্তচিত্তে কি ভাবিতেছে, এমন সময়ে সেই নরাধম রুদ্ররাম, অতি ধীর পদ বিক্ষেপে, তাহার চেয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"হুজুর!"

স্থরেন্দ্র চক্ষু চাহিবামাত্রই দেখিলেন—রুদ্ররাম তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। স্থরেন্দ্র বলিল—"এত শীঘ্র ফিরিয়া বাড়ী হইতে আসিলে যে তুমি?"

রুদ্ররাম ব্যস্তভাবে বলিল—"খুব একটা জবর খপর আনিয়াছি আমি। হুজুর! একবার ঘরের মধ্যে চলুন। এ বারান্দায় সে সব গোপনীয় কথা হ'তে পারে না।"

স্থরেন্দ্র বিস্মিতভাবে বারেক মাত্র রুদ্ররামের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তাই চল।"

টেবিলের উপর একশার বোতলটী ছিল। স্থরেন্দ্র রুদ্ররামের মুখের উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া বুঝিল—সে নিশ্চয়ই কোন একটা হাঙ্গাম-হুজ্জুতের ব্যাপার লইয়া আসিয়াছে। সে খানিকটা ব্রাণ্ডি ঢালিয়া গলাধঃকরণ করিয়া তাহার মগজ ও বুদ্ধিটাকে একটু সজীব করিয়া লইল। তারপর পার্শ্বস্থ কক্ষে গিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া রুদ্ররামকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"ব্যাপার কি শুনি?"

রুদ্ররাম। আপনি মরা মানুষ ফিরিয়া আসার কথা বিশ্বাস করেন কি হুজুর?

স্থরেন্দ্র রুদ্ররামের এ ভূমিকার বহর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল—"Dawnright Idiot তুমি। সোজাভাবে কখনও তুমি কোন কথা বলিতে জানিলে না। তোমার সকল কথাতেই মার-প্যাঁচ দেখিতে পাই।"

রুদ্ররাম বলিল—"হুজুর! আমার উপর রাগ করিবেন না। আমি

আপনার কাছে যে সংবাদ আনিয়াছি, তাহা অতি অপ্রত্যাশিত, অতি অদ্ভুত। আপনার হেমরাণী বাঁচিয়া আছে—মরে নাই!”

সুরেন্দ্র বিস্ময়াতিশয়ে তাহার অধিকৃত চেয়ার খানি হইতে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“সে কি! কি বলিতেছ তুমি রুদ্ররাম? Impossible—অসম্ভব! absurd হতেই পারে না।”

রুদ্ররাম বলিল—“আমি হুজুরকে একটা রচা কথা শুনাইতে আসি নাই। আর সে সাহসও আমার হইবে না। যাহাকে এক রকম নিজের চোখেই দেখিয়া আসিয়াছি—তাহারই কথা হুজুরকে বলিতেছি।”

কি কৌশলে তাহার পত্নীর সহায়তায় সে হেমরাণীর সন্ধান লইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সব কথাই সে সুরেন্দ্রকুমারকে খুলিয়া বলিল।

সুরেন্দ্রকুমার বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে, রুদ্ররামের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—“তোমার কথা অবশ্য অপ্রত্যয় করিতেছি না! এ জগতে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে, যাহা মানুষে কল্পনাতেও মনে আনিতে পারে না। কিন্তু এই হেমরাণীর ব্যাপারটা তুমি আমায় একটু নির্জ্জনে ভাবিতে দাও! কাল সকালে একবার আমার সঙ্গে দেখা করিও। এ সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু বলিবার তাহা কালই শুনিবে।”

রুদ্ররামও সেদিন অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে, এজন্য খুবই পরিশ্রান্ত। সুতরাং সে মনিবকে প্রণাম করিয়া তখনই সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

হেমরাণীর পুনরাবির্ভাব সংবাদে, সুরেন্দ্রের মগজের মধ্যে একটা ভয়ানক গোলমাল বাধিয়া গেল। সে আর এক ডোজ ব্র্যাণ্ডি গলাধঃকরণ করিয়া, মনে মনে বলিল—“আর কেন? সময় থাকিতে এ পাপ পথ হইতে মানে মানে সরিয়া দাঁড়াই। আমার মত হতভাগ্যের অদৃষ্টে বিধাতা এ ধরণের সুখ লেখেন নাই। তাহা না হইলে হেমরাণী আমার হাতের মধ্যে আসিয়া জলেই বা ডুবিবে কেন—আর বাঁচিয়াই বা উঠিবে কেন?

ইজি-চেয়ারে অঙ্গ ঢালিয়া, সে হেমরাণীর রূপ চিন্তাই করিতে লাগিল। অর্দ্ধ তন্দ্রা ও অর্দ্ধ জাগরণের মধ্যে থাকিয়া, সে যেন দেখিল—রূপসী হেমরাণী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। ভুবন আলোকরা রূপ তার। একটা অপূর্ব্ব মাধুরীময় সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা, তাহার সকল অঙ্গে, শারদ জ্যোৎস্নার মত উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এত অফুরন্ত সৌন্দর্য্য হেমরাণীর! এ সৌন্দর্য্য ভোগের কোন শক্তিই কি তাহার নাই?"

শয়তান ঠিক এই সময়ে আসিয়া তাহার কাণে কাণে বলিল—"ভয় কি? কিসের শঙ্কা তোমার? একবারের চেষ্টাতে কি এমন বহুমূল্য রত্ন লাভ হয়? অনেক ডুবিতে হয়, বিপদ সংকুল অতলে নামিতে হয়, প্রাণের ভয় ত্যাগ করিতে হয়, তবে ত "সাধের রতন" মেলে! যখন আমার অতি বিশ্বাসী ও কর্ম্মকুশল সহকারী, এই রুদ্ররামকে তোমার সহায় করিয়া দিয়াছি, তখন কিসের ভাবনা তোমার!"

যে সুরেন্দ্র একটু আগে পাপের পথ হইতে ফিরিবার সংকল্প করিতেছিল, সেই সুরেন্দ্র শয়তানের ছলনায় ভুলিয়া, আবার নরকের দ্বারে মহাশব্দে প্রচণ্ড আঘাত করিল।

সুরেন্দ্র চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, অস্থির হৃদয়ে সেই চন্দ্ররশ্মি বিচ্ছুরিত বারান্দার মধ্যে চঞ্চল ভাবে পদচারণা করিতে করিতে, অস্ফুটস্বরে বলিল—"পাপ পুণ্য—ধর্ম্ম অধর্ম্ম—কথার কথা! নির্ব্বোধ শাস্ত্রকারের অসার শাসন বাণী। এ দুনিয়ায় পাপ না করে কে? পাপ যারা করে তাদেরই ত বেশী শ্রীবৃদ্ধি হয়। পাপীর দলই যে এ সংসারে সংখ্যায় বেশী। আমি চাই ঐহিকের সুখ—আর আত্মতৃপ্তি। চারিদিকের বিরাট বিশ্ব সুখের হিল্লোলে ভাসিতেছে, সবাই মনের সাধ, প্রাণের আশা পূর্ণ করিতেছে—আর আমি সুরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ছোটতরফের মালীক, অতুল

ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, আমি কিনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মর্ম্ম জ্বালায় জ্বলিয়া নিরাশচিত্তে জ্বালাময় প্রাণে এইভাবে দিন কাটাইব? হইতেই পারে না! যখন ডুবিয়াছি, তখন অতল জলেই ডুবিব। ভাসিয়া উঠিতে পারি—ভাল; না হয় এই অতলেই আমার শেষ শয্যা বিছাইব।”

এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে সুরেন্দ্র তাহার অবসন্ন হৃদয়ে অনেকটা সাহস পাইল। যে রুদ্ররামকে সে তাহার বেতনভোগী তুচ্ছ গোলাম ভিন্ন আর কিছুই ভাবিত না, এখন তাহাকে বিশ্বাসী ও হিতকামী সুহৃৎ বলিয়াই মনে ভাবিল। সে শূন্যে মুষ্টি তুলিয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিল—“চেষ্টায় না হয় কি? আমার স্বভাবই এই, যখন যে ইচ্ছা আমার মনে উদয় হইয়াছে, তখনই তাহা অর্থবলেই হৌক—আর চেষ্টাবলেই হৌক পূর্ণ করিয়াছি; কত শক্তি ধরে এই হেমরাণী, যে আমার মত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ লোককে সে বার বার এই ভাবে লাঞ্ছিত ও নিরাশ করিবে?

ভবিষ্যতের একটা অতি নারকীয় ও কুৎসিৎ সুখের আশায় উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত হইয়া, সুরেন্দ্র রাত্রিটা খুব আনন্দে কাটাইয়া দিল। পরদিন প্রভাতে, সুরেন্দ্র সবে মাত্র চা পান শেষ করিয়াছে, আর একখানি ইংরাজি দৈনিক কাগজ খুলিয়া তাহা পাঠ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে রুদ্ররাম সম্মুখে আসিয়া, তাঁহাকে অতি বিনীতভাবে একটী প্রণাম করিল।

সুরেন্দ্র খপরের কাগজ খানি পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া, অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন মুখে বলিল—“কাল সারারাতই ভাবিয়াছি to be or not to be অর্থাৎ কিনা—এগুবো কি পেছুবো। এর মীমাংসা এই করিয়াছি হেমরাণীকে আমার চাই। রুদ্ররাম! আমার সহায়তা কর, তোমার অবস্থা ফিরাইয়া দিব।”

সুরেন্দ্র নিকটস্থ একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া রুদ্ররামকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। মনিবের সম্মুখে এ ভাবে চেয়ারে বসার অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য, রুদ্ররামের নায়েবগিরির জীবনে এই প্রথম।

রুদ্ররাম জোড়করে বলিল—"আমি ধর্ম্মাবতারের চির আশ্রিত গোলাম। হুজুরের অন্নেই আমার শরীর। আপনার কাজ করিতে গিয়া, যদি আমার জান-বাচ্ছা বিপন্ন হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত। কাল একটা কথা সময়াভাবে আপনাকে জানাইতে পারি নাই। একবার এই কাগজ খানি পড়িয়া দেখুন হুজুর!"

সুরেন্দ্র কাগজ খানি লইয়া আত্মোপান্ত পড়িয়া বলিল—"এত রমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের ভিটা বিক্রয়ের unregistered দলিল দেখিতেছি। রাস-মোহন তোমার কাছে ইহা বন্ধক রাখিতেছে। কিন্তু এই রাসমোহনটা কে? এর সঙ্গে আমাদের এ ব্যাপারের সম্পর্ক কি?"

রুদ্ররাম। এই রাসমোহনই হইতেছে হেমরাণীর স্বামী। এই দলিলের বলে হেমরাণীর বাস্তুভিটাটি পর্য্যন্ত হুজুরের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছে। রসুলপুরে যে আগুণ ধরাইয়া দিয়া আসিয়াছি, নিশ্চয় জানিবেন, তাহাতে হেমরাণীকে দেবানন্দপুরেই আবার ফিরিতে হইবে।

এইকথা বলিয়া রুদ্ররাম সুরেন্দ্রের কাণে কাণে কয়েকটী কথা বলিল। সে কথা পাঠকের এখন শুনিয়া কাজ নাই। কথাটা এত সাংঘাতিক, যে অত বড় বিবেক বুদ্ধিহীন যে সুরেন্দ্র, সেও মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল।

সুরেন্দ্র বলিল—"তোমার মতলব অতি ভয়ানক। জানিও তুমি রুদ্ররাম! আমি নিশ্চয়ই প্রকাশ্যভাবে এ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে চাহি না। আমি না হয় আমার কাশীপুরের বাগানে চলিয়া যাই। তুমি এখানকার করণীয় কাজ গুলি সুরু করিয়া দাও। যদি কোন উপায়ে এই হেমরাণীকে হস্তগত করিয়া বিনা হাঙ্গামে আমার কাশীপুরের বাগানে পৌছিয়া দিতে পার, তাহা হইলে পাঁচশত টাকা তোমার মেহনতের বকশীশ পাইবে। আর যদি না পার, কিম্বা এ সম্বন্ধে চারিদিকে একটা গোলমাল ও কেলেঙ্কারির সৃষ্টি করিয়া তোল, জানিও আর কখনও তোমার মুখদর্শন করিব না।"

রুদ্ররাম মনে মনে যে সংকল্প আঁটিয়াছিল, সত্য সত্যই তাহা অতি শয়তানী মতলব। সে যে বিনা গোলযোগে তাহার এই মতলবটী কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে, তাহাও সে বিশ্বাস করিত। কাজেই সে নির্ভীকচিত্তে, দর্পিতভাবে বলিল—"যদি হুজুর আমার উপর ষোল-আনা নির্ভর করেন, তাহা হইলে এ কাজটা বিনা গোলযোগেই হইয়া যাইবে। আজ হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে আমি এই হেমরাণীকে আপনার কাশীপুরের বাগানে পৌঁছিয়া দিব। আপনি কালই কাশীপুরে চলিয়া যান। তবে কিনা, কিছু দিন আগে এখান হইতে সরিয়া পড়াই আপনার উচিত। হাতে কলমে যখন আমিই কাজ করিব, তখন সকল ঝুঁকিই আমার। ধর্ম্মাবতার এ সম্বন্ধে খুবই নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ভবিষ্যৎ সুখের আশায় উৎফুল্লচিত্ত সুরেন্দ্র, কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—"ভাল, তাহাই হইবে। এ সব ব্যাপারে এখন উপস্থিত খরচ পত্রের জন্য কত টাকা তোমার চাই, সেটা জানিতে ইচ্ছা করি।"

টাকার কথা শুনিয়া রুদ্ররামের প্রাণটা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে বলিল—"এ সব হাঙ্গামে কাজ বিনা গোলযোগে শেষ করিতে হইলে, কিছু বেশী টাকা হাতে থাকা চাই হুজুর! শ' চারেক টাকা এখন আমার কাছে রাখিয়া যান। তার পর প্রয়োজন হয় আবার চাহিয়া লইব, না হয় হুজুরকে পাই পয়সার হিসাব বুঝাইয়া দিব। আর কোন রকম বে-হিসিবি অন্যায় খরচের জন্য খেসারত দিতেও বাধ্য থাকিব।"

সুরেন্দ্র তখনই আলমারির মধ্য হইতে একটী নোটের তাড়া বাহির করিয়া রুদ্ররামকে চারি শত টাকার নোট গণিয়া দিয়া বলিল—"খুব সাবধান! বার বার বলিতেছি—খুব সাবধান! যেন কোন গোলযোগ না হয়।"

রুদ্ররাম টাকা গুলি লইয়া তাহার জামার বুকপকেটে হেপাজাত করিয়া উৎসাহের স্বরে বলিল—"সে বিষয়ে হুজুরকে আর দ্বিতীয় বার বলিতে

হইবে না। এ সোজা কাজটা যদি বিনা গোলযোগে শেষ করিতে না পারি, ত আমার নামই রুদ্ররাম নয়। রাম রাম মণ্ডলের ছেলেই আমি নই!"

রুদ্ররাম কাছারীতে ফিরিয়া আসিয়া নোটগুলি পুনরায় গুণিয়া বাক্সে তুলিল। তার পর অস্ফুটস্বরে বলিল—"এত দিনের পর একটা কাজের মত কাজ পেয়েছি। এ সব না হ'লে কি আট টাকা মাইনেতে সংসার চলে—না পরিবারের দুখানা গহনা হয়। এখন কত চারশো যে খসাবো, তা আমার মনেই আছে।"

সুরেন্দ্রের কলিকাতার বাড়ীখানি মাসিক একশত টাকায় ভাড়া দেওয়া ছিল। কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে, সুরেন্দ্র সখ করিয়া গঙ্গার ধারে বহুদিন পূর্ব্বে এক খানি বাগান বাটী খরিদ করিয়াছিল। বৎসরের মধ্যে সে দুই চারিবার এই বাগানে আসিয়া থাকিত। রুদ্ররামের পরামর্শমতে, সুরেন্দ্র তৎপর দিনই রামানন্দপুর ত্যাগ করিয়া কাশীপুরের এই বাগানে চলিয়া গেল। আর সেই দিন অপরাহ্ণে, রুদ্ররামও রসুলপুরের পথ ধরিল। কেন তা সেই জানে।

(২৯)

হেমরাণী যে ভাবে তাহার নির্ব্বোধ, হৃদয়হীন, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য স্বামীর হাতে লাঞ্ছিতা হইয়াছিল—তাহা স্ত্রীলোকের কোমল হৃদয়ের পক্ষে, অতি সাংঘাতিক ও প্রচণ্ড আঘাত। এরূপ আঘাত যন্ত্রণায়, অনেক অসহিষ্ণু স্ত্রীলোক না বুঝিয়া রাগের বশে আত্মহত্যা করিয়া বসে। কিন্তু হেমরাণীকে বিধাতা ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার জীবনের অসংখ্য দুঃখ ও নিরাশা তাহাকে যেন আরও অনেক বেশী সহিষ্ণুতা আনিয়া দিয়াছিল।

অনেক দিক দিয়া সে ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া বুঝিল, দোষ

তাহার নিজের। সে রসুলপুরে আসিবার পর, একদিন সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া, তাহার গত জীবনের কথাগুলি যদি তাহার স্বামীকে গুছাইয়া বলিতে পারিত, তাহা হইলে রুদ্ররামের সহস্র বিদ্বেষ পূর্ণ পত্রেও কিছু হইত না।

রাসমোহন বাটী হইতে সেই রাত্রে, রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল—"তুমি এ বাটীতে থাকিতে আর আমি গৃহে ফিরিব না। যত শীঘ্র পার রসুলপুর হইতে বিদায় হও। তোমার মুখ দেখিতে আমি চাহি না।"

হেমরাণী মনে মনে ভাবিয়া দেখিল—"আমার আর এখানে থাকিয়াই বা ফল কি? বিনাপরাধে যখন স্বামীর বিশ্বাস হারাইয়াছি, তখন তাঁহার সংসারে থাকিবার অধিকারই বা আমার কই? কেন আমি তাঁহাকে বৃথা অসুখী করিব? আমার মত অভাগীর জন্য কেনই বা তিনি ঘর বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে দুঃখে কষ্টে থাকিবেন? আমিই এখান হইতে চলিয়া যাই—সব আপদ চুকিয়া যাইবে। এত সুখ এ অভাগিনীর অদৃষ্টে সহিবে কেন?

সে সেই দিনই সনাতনকে পত্র লিখিল—"আমার শরীর বড় খারাপ হইয়াছে। তুমি শীঘ্র আসিয়া আমায় দেবানন্দপুরে লইয়া যাইবে। তিনি বিদেশে চাকুরী করিতে চলিয়া গিয়াছেন, এখানে আমায় দেখে কে? সুতরাং পত্র পাইয়াই রসুলপুরে চলিয়া আসিবে।"

সনাতন রাণীর এই পত্র পাইয়া, সেই দিনই রসুলপুরে আসিয়া পৌছিল দুই তিন দিন হইল, রাসমোহন গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই তিন দিনের মধ্যেও রাণী পিসিমার কাছে আদত ঘটনার সম্বন্ধে, কোন কিছুই ব্যক্ত করে নাই। কারণ তাহাতে কোন ফল নাই—অথচ পিসিমা নিরর্থক প্রাণে একটা দারুণ কষ্ট পাইবেন।

হেমরাণীর প্রাণে দাবদাহের যাতনা। এই দুই তিন দিনে তাহার মুখখানি শুখাইয়া যেন আধখানা হইয়া গিয়াছে। কোন কষ্টকর রোগে ভুগিলে

রোগীর মুখে যেমন সর্ব্বদাই একটা যন্ত্রণাকাতর অস্বস্তিময় ভাব দেখা দেয়, রাণীর মুখের অবস্থা ঠিক সেইরূপ। সমগ্র ধরণী যেন তাহার চক্ষে মৃত।

সে খায় না, দায় না, চুল বাঁধে না, সংসারের নিত্যকাজও পিসিমার সেবা করিতে হয় বলিয়া করিয়া যায়। রাত্রে একাকিনী শয্যায় শুইয়া কাঁদে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, উচ্ছাসরুদ্ধ কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে ভগবানকে একমনে ডাকে। এই ভাবেই তার দিন গুলি কাটিতেছে। সে নরক যন্ত্রণার অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

পিসিমা রাণীর এই অবস্থা দেখিয়া, একদিন তাহাকে বলিলেন "হ্যাঁ বৌমা! তোমার কি কোন অসুখ করেছে? তোমার মুখ অত শুক্‌নো কেন?"

রাণী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হাঁ পিসিমা! সত্যই আমার বড় অসুখ! রাত্রে ঘুম হয় না, মধ্যে মধ্যে মা'কে স্বপ্নে দেখি। বুক ধড় ফড় করে। বুকের মধ্যে কি যেন একটা বেদনা এমন জোরে চেপে ধরে, তাতে দম্ বন্ধ হয়ে যায়। কি হবে পিসিমা!"

পিসিমা হেমরাণীকে বড়ই ভাল বসিতেন। কথাটা শুনিয়া তাঁর মনটা বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ছলছল নেত্রে বলিলেন—"সবাই মরে জুড়ুলো, আর আমার মত অভাগীকে যম ভুলে বসে আছে। অমন ভাই গেল, ভাজ গেল, তোমাদের এ সব কষ্ট দেখবার জন্য রইলুম কিনা আমি অভাগী। কি হবে বৌমা! রাসু যে কোথায় চলে গেল—তা ত জানিনি। এ পোড়া গাঁয়ে আবার ভাল ডাক্তার-বদ্দি নেই। তোমার চিকিচ্ছের ত একটা ব্যবস্থা করা ত চাই? কিন্তু আমি মেয়েমানুষ। আমার ক্ষমতাই বা কি?

হেমরাণী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তার জন্য ভেবনা পিসিমা! দেবানন্দপুরে আমার মা বাপ কেউ নেই বটে, কিন্তু আমার হেমেন দাদা আছেন। তিনি জমীদার লোক। আমাকে তাঁর ছোট বোনের মত দেখেন। আমার বাপ তাঁর কাছেই চাকরী কত্তেন। ভাল ভাল

ডাক্তার-বদ্দি তাঁর হাত ধরা। মাসখানেক দেবানন্দপুরে থাকলে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা খুব ভালই হবে। মাস খানেকের জন্য না হয় আমি সেখান থেকে একবার ঘুরে আসি। কি বল পিসিমা ?”

পিসিমা হেমরাণীর এ যুক্তিটা খুবই ভাল বুঝিয়া বলিলেন—“তাই কর মা—তাই কর। আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, সেই সনাতনকে আনিয়ে তার সঙ্গে তুমি দেবানন্দপুরে চলে যাও। তোমার মত লক্ষ্মী বৌকে যে বিনা তিকিচ্ছায় হারাবো, তা আমার প্রাণে সইবে না।”

হেমরাণী একটু ঢোঁক গিলিয়া বলিল—“কিন্তু তিনি যদি রাগ করেন ?

পিসিমা। রাসুর কথা বল্‌ছো ? আমি পাঠালে সে রাগ করবে ? তুমি সনাতনকে একখানা পোষ্টকার্ড আজই দাও, সে চিঠি পেলেই এসে পড়বে। আমি তোমাকে যেতে অনুমতি দিচ্ছি। রাসমোহন কখনো তার পিসিমার কথায় অমত কর্ব্বে না !

হেমরাণী বলিল—“কিন্তু পিসিমা, আমি গেলে তোমার যে বড় কষ্ট হবে ! তুমি এ বুড়োবয়সে সংসারের এত খাটুনি খাটতে পারবে কি ?

পিসিমা বলিলেন—“আমার কষ্ট বড়, না তোমার প্রাণটা বড় বৌমা ! আমার ভাজ মরার পর থেকে ত এ কষ্ট আমার গা-সহা হয়ে গেছে বৌমা। একটা পেট—আমার। আর একখানা বোক্‌নো মাজা বইতো নয়। চলে যাবে—মা চলে যাবে। একটা মাস বই তো নয় ! তা আমি বেশ চালিয়ে নিতে পারবো।”

হেমরাণী যে ভাবে পিসিমার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, তাহাতে সে মিথ্যা কথা না বলিয়া প্রকারান্তরে তাহার দেহের ও মনের অবস্থাটা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল। আর এই কথার মারপেঁচের অন্তরালে যে আর একটা সাংঘাতিক ব্যাপার প্রচ্ছন্ন রহিয়া গেল, পিসিমা তাহার কিছু মাত্রই জানিতে পারিলেন না।

আর সনাতন ? সে রাণীর অসুখের কথা শুনিয়াই এই ঘটনার তৃতীয় দিনের প্রভাতে রসুলপুরে আসিয়া হাজির হইয়াছে।

রাণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবামাত্রই, সনাতন ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিল—"একি মা! তোমার চেহারায় কালি মাখিয়ে দিলে কে মা! সত্যই কি তোমার খুব অসুখ?"

রাণীর মনের ইচ্ছা এমন নয়, এই সনাতন—যাহার কাছে সে কখনও কোন কথা গোপন করে নাই, সেও এ ঘৃণ্য ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতে পারে। কাজেই সে মলিন মুখে, পিসিমাকে তাহার অসুখের সম্বন্ধে, যেরূপ একটা তথা-কল্পিত ইতিহাস দিয়াছিল, সনাতনকে তাহাই দিল। রাণীর মুখের রক্তহীন বিবর্ণ অবস্থা, আর কষ্টের সহিত কথা বলিবার ভঙ্গীতে সনাতনও বুঝিল, যে তার মায়ের পীড়াটী বড় সহজ নয়।

তবুও সনাতন কৌতুহলবশে রাণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবাঠাকুরকে এ বাড়ীতে দেখ্‌তে পাচ্ছিনি যে? তিনি কোথায় মা?"

রাণী একটী ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"সংসারের অভাব বুঝে তিনি কল্‌কেতায় চাকরীর চেষ্টায় গেছেন।"

এই চাকরীর কথাটা সনাতনের মনে বড়ই বেখাপ বলিয়া বোধ হইল। তারপর সে ধীর ভাবে বলিল—"তাঁর মত না নিয়ে তোমায় দেবানন্দপুরে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক কাজ হবে মা?"

রাণী তার হৃদয়কে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বলিল—"এখানে চিকিৎসা হবে না বলেই, তিনি আমায় দেবানন্দপুরে যাবার অনুমতি দিয়ে গেছেন। আর তাঁর উপর হ'চ্ছেন আমার এই পিস্‌শাশুড়ী। তিনিও আমায় পাঠিয়ে দেবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন। কাজেই ও সম্বন্ধে তুমি বৃথা ভেবো না।"

সনাতন মনে মনে কি ভাবিয়া বলিল—"আমি তোমার সন্তান। তোমার আজ্ঞা পালন করাই আমার কর্ত্তব্য। দেবানন্দপুরে গেলে অবশ্য

হেমেন্দ্রবাবু তোমার চিকিৎসার খুব ভাল বন্দোবস্তই করে দেবেন। কেন না—তোমার পত্রখানা তাঁকে না দেখিয়ে, আর তাঁর মত না নিয়ে আমি এখানে আসি নি। তা কবে তুমি যেতে ইচ্ছা কচ্ছো?"

রাণী বলিল—"আজই যেতে হবে। কেননা—কাল বৃহস্পতিবার। পরশু অমাবস্যা। আজই তুমি আহারাদির পর পাল্কী নিয়ে এস।"

মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া সনাতন চণ্ডীমণ্ডপে শুইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিল। তারপর সে পাল্কীর সন্ধানে বাজারের দিকে গেল। রসুলপুরের হাটে একটী পাল্কীর আড্ডা আছে, সনাতন তাহা জানিত।

যথা সময়ে পাল্কী আনিয়া সনাতন হেমরাণীকে বলিল—"মা! আকাশটা একটু মেঘ মেঘ করছে। আর এখনকার দিনকালও ভাল নয়, কেন না আজ কাল দেখ্ছি বিকালে প্রায়ই আঁধার করে উঠে। ঝড় আসে। তুমি শীঘ্র তৈরি হয়ে নাও।"

তৈরি হওয়া আর ছাই! রাণী পিসিমার পদ বন্দনা করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে পাল্কিতে উঠিল। পিসিমাও পাল্কীখানি দৃষ্টি পথের বাহিরে চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, এক দৃষ্টে পাল্কির দিকে চাহিয়া চাহিয়া শূন্যমনে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, ও চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"আজ আমার বাড়ী যেন পিতিমেহীন দালানের মত অন্ধকার হয়ে গেল।"

রসুলপুর হুগলী হইতে দুই তিন ক্রোশ। দেবানন্দপুর হইতে সাড়ে তিন বা চারি ক্রোশ পথ। পালকীখানি তখন মাঠের মধ্য দিয়াই চলিতেছিল। আর পাল্কীর দ্বার অর্দ্ধ উন্মুক্ত করিয়া রাণী আকাশ পাতাল ও ভূত ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছিল।

সনাতন পাল্কীর একটু দূরে দূরে চলিয়াছে। সহসা এই সময়ে আকাশটা আরও অন্ধকার করিয়া উঠিল। ছোট ছোট কালো কালো মেঘগুলা, যেন বাতাসের জোরে ফুলিয়া ফুলিয়া, খুব বড় হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমশঃ একটু জোরে হাওয়াও উঠিল। তারপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। আকাশের অবস্থা দেখিয়া সনাতন একটু ভয় পাইল। এখনিই যে বৃষ্টি থামিবে, তাহার কোন আশাই নাই। আর দুইখানা ছোট মাঠ পার হইলেই ত দেবানন্দপুর। কিন্তু মেঘ বৃষ্টি কি তৎক্ষণে একেবারে থামিয়া যাইবে? নিকটে কোন গ্রাম নাই, চটী নাই, গাছতলা ভিন্ন বিশ্রাম স্থান নাই। সনাতন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এখন করা যায় কি?

সনাতন দেখিল, বেহারারা নিরুপায় হইয়া গাছতলায় পালকী নামাইল। সে বেহারাদের এই ব্যবস্থায় কোন আপত্তি করিতেও পারিল না। আর করিলেই বা তাহারা শুনিবে কেন? তারা চারটী টাকা ভাড়ার জন্য জান ত দিতে পারে না। সুতরাং নিরুপায় হইয়া সনাতন ও বেহারারা এ দুর্যোগে গাছতলায় আশ্রয় লইল।

সহসা নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গলের মধ্য হইতে ভীমাকৃতি দুইজন লোক বাহির হইয়া পিছন দিক হইতে, সনাতনের মাথায় সবলে লাঠির আঘাত করিল। আঘাতটা এত অব্যর্থ ও এতটা প্রচণ্ড, যে তাহাতে তাহার ভাঙ্গা ছাতাটি চুরমার হইয়া গিয়া, লাঠিটা তাহার মাথাতে ও কাঁধের উপর পড়িল। সনাতন সে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াও উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার ডান পায়ের গোছের উপর আবার আঘাত করায়, সে "বাপ্ রে" বলিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

এই সময়ে একজন সেই জঙ্গলের অপর দিক হইতে বাহির হইয়া বলিল—"বহুত আচ্ছা বাপ সব। এখন ঐ পালকীর ভিতর যে মেয়ে সওয়ারী আছে, তার হাত পা মুখ বাঁধিয়া, পালকী খানা সরাসর হুগলীর ঘাটে লইয়া যা। আমি তোদের খুব ভালরূপ বকশীশ করিব। ঘাটে আমাদেরই নৌকা আছে। আমি সেখানে পৌছিয়াই তোদের টাকা কড়ি দিব।"

আদেশ প্রাপ্তি মাত্র, সেই দুইজন দস্যু পালকী খুলিল। হেমরাণী

তাহাদের যমদূত গোছ চেহারা দেখিয়া, ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল আর তাহারাও ক্ষিপ্র গতিতে একখানা কাপড় দিয়া তাহার মুখ চো বাঁধিয়া ফেলিল। হেমরাণী এই অতর্কিত আক্রমণে ভয়ে মূর্চ্ছিত হই পড়ায়, তাহারা অতি সহজেই তাহাকে পালকীতে শোয়াইয়া দিল। আ বেহারারা সেই পালকী উঠাইয়া সেই প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করি হুগলীর পথ ধরিল।

এই হুকুমদাতা আর কেহই নহে—সেই শয়তান রুদ্ররাম। এই লাঠিয়া গণ তাহারই নিয়োজিত। পালকী-বাহক দুলেরা তাহারই অনুগত প্রজা সে এত বড় একটা ব্যাপার এত সহজে সম্পন্ন করিয়া ফেলিল—তাহা একট পূর্ব্ব চক্রান্তের ফল। আর বেহারারা যে মাঠের মধ্যেই পালকীখানা আনি ফেলিয়াছিল, তাহা তাহারই পরামর্শে। মনিবকে কাশীপুরের বাগানে পাঠাই দিয়া, সে এই দস্যুতা করিবার জন্যই রসুলপুরে আসিয়াছিল। টাকার লো বড় ভয়ানক জিনিস। তারপর রুদ্ররামের মত শয়তানের হাতে যদি টাক পড়ে, তাহা হইলে সে এর চেয়েও মহাপ্রলয় কাণ্ড করিতে পারে।

(৩০)

হরিমতি চায়, তাহার ভবিষ্যৎ খোর-পোষের একটা ব্যবস্থা করিতে সেই জন্যই সে একদিন কৌশল করিয়া সুরেন্দ্রকে হাতের মধ্যে রাখিবার জ শিবরামপুরের বাগান হইতে সেই কয়খানি প্রয়োজনীয় পত্র সংগ্রহ করিয়াছিল

সে নিজের শোচনীয় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, প্রেতিনী মত আমি সুরেন্দ্রর অনুসরণ করিব। সে ভবিষ্যতে যাহাতে আর কো অভাগিনীর এভাবে যাহাতে সর্ব্বনাশ করিতে না পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিব নিজের জীবন দিয়াও সেই বিপন্নাকে রক্ষা করিব। এইরূপ একটা সিদ্ধান্তে ফলেই সে সুরেন্দ্রের সঙ্গত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক।

হরিমতি এখন আর তারামণির গৃহে থাকে না। সে দেবানন্দপুরের শেষপ্রান্তে নিজে একখানি ঘর বাঁধিয়া, সেখানে বাস করিতেছিল। আর সনাতনের নিকট সে হেমরাণীর সম্বন্ধে পূর্ব্বকার সকল সংবাদই অবগত হইয়াছিল।

যাই হোক, সুরেন্দ্রর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার জন্য সে একদিন শিবরামপুরের বাগানে দেখা দিল। সেই বাগান বাটীর রক্ষক রূপে বাস করিতেছিল, নবীন খানসামা, ওরফে নবীনচন্দ্র শাসমল।

হরিমতির মাজাঘসা সৌন্দর্য্যটা, নবীনের মনে বড়ই একটা দাগ কাটিয়া দিয়াছিল। সে কিছুতেই হরিমতির সেই টানা-টানা চোখ দুটি, মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিটুকু, ভুলিতে পারিতেছিল না। সে জানিত, হরিমতির উপর তাহার বাবুর আর সে সুনজর নাই। সুতরাং একটা পাকাপাকি গোছের কারখত উভয়ের মধ্যে হইয়া গেলে, এই দর্পিতা হরিমতিকে আয়ত্ব করিতে তাহার বেশী কষ্ট হইবে না।

নবীন সহসা হরিমতিকে বাগানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, সহাস্তে বলিল—"বলি আজ দিন দুপুরে চাঁদের উদয় কেন গো? কি ভাগ্য! না জানি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম।"

হরিমতি বলিল—"ওসব বাজে কথা এখন রাখ। সত্য বল দেখি তোমার বাবু কোথায়?"

নবীন মৃদুহাস্যের সহিত বলিল,—"এখনও তোমার বাবুর উপর অত টান? বাবু কখন কোথায় যান, কি করেন, আমাকে কি সব জানিয়ে করেন? আশ্চর্য্যের কথা এই হরিমতি—এত হেনেস্থার পরও তোমার বাবুর উপর এত [illegible] খাঁটি বাবু-কেলাসের লোক যারা, তারা কি চিরদিন একজনেরই এন্তেজারি করে? না হয় আমরা—গরীব দুঃখী! গরীবের প্রাণ কি প্রাণ নয়—না তাতে ভালবাসা নেই।"

একটু মুচ্‌কী হাসিয়া, অপাঙ্গে একটু বিদ্যুত খেলাইয়া, হরিমতি বলিল—"আমরা কি ও সব বুঝি না নবীনবাবু! আজ না হয় তুমি পয়সার অভাবে নবীন খানসামা। কিন্তু কাল যদি কোথাও থেকে লাখ-দুলাখ পেয়ে যাও, আর কলকেতায় গিয়ে একখানা বাড়ী ফেঁদে জাঁকিয়ে বসতে পার, তা হ'লে কত লোকে 'বাবু বাবু' করে তোমার কাণ দুটোতে তালা ধরিয়ে দেবে। তা দে'খ তুমি যখন অতটা খোলাখুলি কথা বল্লে, তখন আমিও বলি—তোমার উপর যে আমার একটুও টান নেই তা নয়। তবে তোমার বাবুর জন্য বড় ভয় হয়।"

হরিমতির মুখে এইরূপ আশাজনক কথা শুনিয়া, নবীন যেন কি এক রকম হইয়া গিয়া বলিল—"বাবুর কথা ছেড়ে দাও। এই ক'দিন ধরে সেই রুদ্দুরে নায়েব আর বাবুর মধ্যে একটা সঙ্গীন পরামর্শ চলছে। সব কথা না শুনলেও এটুকু বুঝেছি, আমার বাবু হেমরাণী বলে এক ভদ্র কন্যার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছেন। আর ধরা ছোঁয়ার মধ্যে না পড়েন, এই ভয়ে বাবু আমার কলকেতার কাশীপুরের বাগানে স'রে গেছেন। বল কি হরিমতি! এক তাড়া নোট—সেই রুদ্দুরে মোড়ল ব্যাটা, কিনা বাবুকে বোকা বানিয়ে এক কথায় নিয়ে গেল! কি আফ্‌শোষ!"

হরিমতি কথার ছলে, তাহার জ্ঞাতব্য বিষয়টী জানিতে পারিয়া বুঝিল নবীনের মত একটা হীন লোকের কাছে এতক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহায় তাহার ইষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে।

কাজেই সে একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"তোমার ঐ বাবুদলের লোকের টাকা ঐ রকমেই সবাই ফাঁকি দিয়ে খায়। না আছে ক্রিয়া কলাপ, না আছে দানধ্যান, কিম্বা গরীবের উপর দয়া। ও ঠিক হয়েছে! তোমার হাতে না পড়ে না হয় রুদ্দুর নায়েবের হাতে পড়লো এইত? যাক্—ভাল কথা মনে পড়েছে। এ দলে সেই তারামণিও আছে নাকি?"

নবীন হাসিয়া বলিল—"এখনো বোধ হয় তার ভাতের হাঁড়িতে লাটি পড়েনি। সে আজ কল্‌কেতায় বাবুর কাছে যাবে।"

হরিমতি উঠিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া নবীন বলিল—"সেকি? এত শীঘ্র উঠ্‌লে যে?"

"কাল কি পরশু আবার আসবো! আজ একটু কাজ আছে। আজ তবে আসি নবীন বাবু!" বলিয়া মৃদু হাস্যের সহিত গজমন্থর গতিতে হরিমতি সেই বাগান হইতে বাহির হইয়া গেল। নবীন তাহাকে কোনরূপ বাধা দিতে সাহস করিল না।

বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া, হরিমতি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চিন্তা করিয়া মনে মনে বুঝিল, এ সম্বন্ধে তাহার একমাত্র সহায় সনাতনের সহিত একটা পরামর্শ করা দরকার।

এইরূপ স্থির সংকল্প করিয়া সে পর দিনের প্রভাতেই দেবানন্দপুরের পথ ধরিল। তাহার নিতান্ত সৌভাগ্য, সে যে সময়ে সনাতনের বাড়ীর দরোজার কাছে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—একাবারে বাড়ীর ভিতরে যাইব কিনা—তাহার ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়ে বাড়ীর সদর দরোজা খুলিয়া সনাতন বাহিরে আসিল।

মাথায় লাঠির আঘাত লাগায়, সনাতন সে দিন কিয়ৎক্ষণের জন্য সংজ্ঞাহীন হইয়াছিল মাত্র। তাহার পরম সৌভাগ্য, এই লাঠীর প্রচণ্ড আঘাতটা তাহার কাঁধের উপরই বেশী জোরে পড়িয়াছিল। এজন্য সাংঘাতিক হয় নাই। সে সহজে সারিয়া উঠিল।

যখন তাহার চেতনা হইল, তখন সে সকল কথাই বুঝিতে পারিল। কিন্তু এই ডাকাতের সর্দ্দার যে কে, তৎসম্বন্ধে তাহার মনে বড়ই একটা খট্‌কা বাঁধিয়া গেল। চেতনাপ্রাপ্তির পর সে সবিস্ময়ে দেখিল, সেখানে পালকী বেহারা ও হেমরাণী কেউই নাই। সে অনেক কষ্টে সেই রাত্রে

মাঠ পার হইয়া দেবানন্দপুরে পৌছিল বটে, কিন্তু এই ভয়ানক ব্যাপারের কারণ যে কি, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় চোখের জল ফেলিয়া, দিন কাটাইতেছিল। বলা বাহুল্য, হেমেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করিয়া সে তাঁহাকে সমস্ত কথাই বলিল বটে, কিন্তু হেমেন্দ্রবাবুও তাহারই মত বুক ভাঙ্গা হইয়া পড়িলেন। কারণ সুরেন্দ্র এত ফাঁকে দাঁড়াইয়া কাজ করিতেছিল, যে তাহাকে এ ব্যাপারের মধ্যে আইনমতে জড়ানো আর রুদ্ররামকে ধরা বড় শক্ত ব্যাপার।

সহসা হরিমতিকে তাহার সম্মুখে দেখিয়া বিস্মিতভাবে সনাতন বলিল—"এ কি! তুমি সহসা কোথা থেকে হরিমতি?"

হরিমতি বলিল—"সনাতন দাদা! কিছুক্ষণের জন্য আমি তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে কথা কহিতে চাই।"

বাড়ীতে সেদিন আর কেহ ছিল না, সুতরাং সনাতন হরিমতিকে তাহাদের বাহিরের সেই চণ্ডীমণ্ডপে বসাইল। হরিমতি বিশুষ্ক মুখে বলিল—"হেমরাণীর খপর কিছু জান কি তুমি সনাতন দাদা?"

সনাতন তখন হেমরাণীসম্বন্ধে ডাকাতির দিন যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সবই খুলিয়া বলিল। সমস্ত কথা শুনিয়া হরিমতি একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তা হ'লেই ঠিক হয়েছে! এটা ঠিক্ ডাকাতি নয়। রুদ্দুর নায়েব ডাকাতির ভাণ করে হেমরাণীর সর্ব্বনাশের জন্য তাকে নিশ্চয়ই এবার কাশী-পুরের বাগানে নিয়ে গেছে। রুদ্ররাম যে এ ভয়ানক কাজ করেছে, তার কতক প্রমাণ আমার কাছে।"

সনাতন। কি প্রমাণ?

হরিমতি তার আঁচল হইতে দুই চারিখানি চিঠি বাহির করিয়া সনাতনকে পড়িতে দিল। এই চিঠি গুলিই সে প্রয়োজন বুঝিয়া, সুরেন্দ্রের ড্রয়ার হইতে সেই দিন রাত্রে চুরী করিয়াছিল।

সনাতন পত্রগুলি পড়িয়া বলিল—"এই সব পত্র রুদ্ররাম সুরেন্দ্রবাবুকে লিখিয়াছে। আর হেমরাণীর সম্বন্ধেও বটে! একটা কাজ করিলে হয় না?"

হরিমতি। কি কাজ?

সনাতন। পুলিসে খপর দিয়া রুদ্ররামকে গ্রেপ্তার করাইলে হয় না?

হরিমতি। তুমি সেই শয়তান রুদ্ররামকে চেন না। তাই ওই কথা লিতেছ। সে পুলিসের হাঙ্গাম দেখিলেই, হয় ভয়ে গা ঢাকা দিবে, না য়, এ চিঠিগুলো যে তার লেখা নয়—বলিয়া বিশ বাঁও জলে ফেলিবে!

সনাতন। কিন্তু—বোধ হয় তা পারবে না। আমাদের পুলিস নস্‌পেক্টার সনাতনবাবুটি বড় খাটি লোক। আর আমাদের হেমেনবাবুর ঙ্গে ত তাঁর খুব বন্ধুত্ব বেশী।

হরিমতি। তা হ'লেও এই শয়তান রুদ্ররাম, জাল—ফেরেব ও য়তানীতে অদ্বিতীয়। তোমাদের রমাপ্রসন্ন ঠাকুরের ব্যাপারেই তা বোধ হয় াল রকম বুঝিয়াছ! রুদ্ররামকে আর কোন উপায়ে জালে জড়াইতে ইবে। আর আমার বিশ্বাস—যে অনাথের নাথ, গরীবের সহায় ভগবান, কদিন না একদিন সে পথ আমাদের দেখাইয়া দিবেন।

সনাতন বলিল—"তাহা হইলে এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত বল দেখি? নর্থক সময় নষ্ট করা ত ঠিক নয়!

হরিমতি সহসা কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল—"সনাতন দা! আমার মাথায় কটা মতলব এসেছে!"

সনাতন। কি মতলব?

হরিমতি। আমি কাল নবীন খানসামার কাছে খপর পেয়েছি, তারামণি াল রাত্রেই কল্‌কেতায় চ'লে গেছে। এই নবীন খানসামাও বোধ হয় ই এক দিনে কল্‌কেতায় চলে যাবে। সে সেখানে থাক্‌তে থাক্‌তে আমার পৌঁছান চাই। পারি যদি এই নবীনকে হাত করেই, আমি হেমরাণীকে বাগান

থেকে সরিয়ে দোব। না পারি, সেখানে বেশী কড়াকড় বন্দোবস্ত দেখি তোমায় এসে খপর দিলে, তুমি তখন হেমেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে য করবার তাই ক'রো। কলকেতায় গিয়ে পুলিশ হাঙ্গামটা কল্লেই যে ভাল হয়।

সনাতন বলিল—"সেই বেশ কথা! কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে গে হয় না। একা তুমি! আর সুরেন্দ্রও অতি ভয়ানক লোক।"

হরিমতি বলিল—"না—তোমার গিয়ে কাজ নাই। সে বাগানে আমি একা যত সহজে ঢুকতে পারবো, তুমি সঙ্গে থাকলে হয়তো সেটা ঘটে না। সুরেন্দ্রকে আমি যতটা জানি, তাতে আমার বিশ্বাস, সে ঘোর কাপুরুষ! সতীর তেজ যে নারীর মনে বিদ্যুতের মত জ্বলছে, তাকে স্পর্শ করা বড় সোজা কাজ নয়। দেখ—এই কাশীপুরের বাগানেই শয়তান সুরেন্দ্র আমার সর্ব্বনাশ করেছিল। আমি আর সময় নষ্ট করবো না এর পর ঠিক সময়ে তোমায় খপর দোব। আর একটা কথা এই, পোড়ার মুখী তারামণি যখন সেখানে গিয়েছে, তখন এটা বুঝতে হবে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই, সুরেন্দ্র তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছে।

সনাতনকে চিন্তিত দেখিয়া হরিমতি বলিল—"কে যেন আমার মনের ভেতর থেকে বলছে, আমি একাই সেই বাঘের গুহা থেকে সেই সতী সাধ্বী হেমরাণীকে উদ্ধার করে আনতে পারবো। তুমি আশীর্ব্বাদ কর সনাতন দা, যেন আমার মনের বাসনা সফল হয়।" এই কথা বলিয়া, সে তখনই সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল।

(৩১)

হেমরাণী যথা সময়ে, সেই ঘটনার দিন প্রত্যুষে উদ্যান বাটীতে পৌঁছিল। তখনও তাঁহার চেতনা হয় নাই। মূর্চ্ছিতা হেমরাণীর শুশ্রূষার বন্দোবস্ত

করিয়া, সুরেন্দ্রকুমার রুদ্ররামের চেষ্টা সফলীকৃত দেখিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য সেই মুহূর্ত্তেই সেই শয়তানকে এক শত টাকা বক্‌শীশ করিলেন।

কলিকাতার উপকণ্ঠে ডাক্তার কবিরাজের অভাব নাই। তাহার পত্নীর সাংঘাতিক পীড়া বলিয়া, ডবল ভিজিট দিয়া, সুরেন্দ্রকুমার তাঁহার অপরিচিত একজন এলোপ্যাথকে আনাইয়া, হেমরাণীর চিকিৎসা করাইতে লাগিল। একজন আধাবয়সী ঠিকা ঝিকে, হেমরাণীর শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত করিয়া সুরেন্দ্রকুমার তারামণিকে আনিবার জন্য রুদ্ররামকে দেশে পাঠাইয়া দিল। বলা বাহুল্য, সেই দিন সন্ধ্যার সময় তারামণি সেই বাগানে আসিয়া পৌছিল। রুদ্ররামের একটুও ইচ্ছা ছিল না, যে তারামণি এই ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া তাহার প্রতিপত্তির ও লাভের হানি করে। কিন্তু সে কি করিবে? মনিবের হুকুম। আর আবার অন্য দিকে তারামণিও, রুদ্ররামকে তাহার ভবিষ্যৎ স্বার্থের পরম শত্রু বুঝিয়া, মনে মনে তাহার উপর বড়ই বিরক্ত হইল।

যথা সময়ে হেমরাণীর চেতনা হইল। রাণী, তাহার সম্মুখে তারামণিকে দেখিয়াই ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। চৈতন্যহীনতা, তাহাকে চিন্তা ও বিপদ ভীতি মুক্ত রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহার জ্ঞান হইবার পর শয়তানী তারামণিকে সেখানে দেখিয়া তাহার প্রাণ শুখাইয়া গেল। মুখখানি এতটুকু হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া তারামণি আত্মীয়তা জানাইয়া বলিল—"আহা বাছারে আমার! মুখখানি একাবারে শুখিয়ে গেছে! যা হোক এখন তুমি কেমন আছ মা!"

হেমরাণীর ইচ্ছা হইতেছিল, সে পদাঘাতে তখনই সেই পাপিষ্ঠাকে ঘরের বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু সে শক্তি তাহার ত নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে হেমরাণী বুঝিল, সে আবার সুরেন্দ্রকুমারের কবলিত হইয়াছে। কোথায় যে তাহাকে তাহারা আনিয়াছে, তাহা জানিবার উপায় সে খুঁজিয়া পাইল

না। সুরেন্দ্রের অর্থে ক্রীতা এই শয়তানী তারামণি যে একটীও ভিতরের কথা তাহাকে বলিবে না, এটা খুবই নিশ্চিত।

তারামণি আত্মীয়তা জানাইয়া বলিল—"তুমি সেরে উঠেছো মা! আমি বাঁচলুম। সুবোধ মেয়ের মত বুঝে সুঝে চল্লে, তোমার কোন কষ্টই হবে না। সোয়ামী তোমায় ত্যাগ করেছে। তার উপরে তুমি আমার বাবুর সুনজরে পড়েছ। তোমার ভাবনা কি মা?" তারামণি এবার প্রচ্ছন্ন ভাবের গণ্ডীর বাহিরে গিয়া, একটু বেশী স্বাধীনতা লইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়াছিল।

হেমরাণী গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,—"ইহকাল লইয়াই আছিস্ তুই! কিন্তু পরকালের ভাবনা কি একবারও ভাবিস নি?"

তারামণি। মরার পর কি হ'বে তা ভেবে ঐহিকের পাওনাগণ্ডা গুলো নষ্ট করি কেন বাছা! আমাদের পেট চলবে কিরূপে?

হেমরাণী। হিন্দু গৃহস্থের দ্বারে "জয়-রাধে-কৃষ্ণ" বলে দাঁড়ালে ত এখনও লোকে মুষ্টি ভিক্ষা পায়। একবার ধর্ম্ম পথে চলে দেখ্ দেখি, দিন চ'লে কি না। যার বাড়া পাপ নেই, পোড়া পেটের দায়ে সে মহা পাপ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিস্ কেন?

তারামণি হঠিবার পাত্রী নয়। সে বলিল—"এ পেটের ভার ত আর তুমি নিতে পারবে না। তবে আর ও কথা বলা কেন? তা ছা'ড়া যার যা লল্লাটের লেখা, তাকে ত তাই কর্ত্তে হ'বে!"

হেমরাণী কিয়ৎক্ষণ মনে মনে ভাবিয়া দেখিয়া বুঝিল—এ পথে গেলে এই হতভাগিনীকে সোজা পথে আনা বড়ই কষ্টকর হইবে। এজন্য সে বলিল—"আচ্ছা! যাতে তোর পেট চলে, আর কখনো এসব কাজ কর্ত্তে না হয়, তার ব্যবস্থা আমি কচ্ছি!"

তারামণি বিস্মিত ভাবে একবার হেমরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল

"ও মা! সে কি? তুমি করবে? এত বড় একটা জমীদার সুরেনবাবু! সেই-ই কর্ত্তে পাল্লে না। আমায় কি বোকা পেয়েছ?"

হেমরাণী বলিল—"এ সংসারে কেউই বোকা সাজতে চায় না। যে ভাল কাজ করে, তারও যেমন যুক্তি আছে আর সে নিজের বুদ্ধিকে বাহাদুরী দেয়, এই দুনিয়ার খেলায় যে মন্দ কাজ করে, সেও কতকগুলো যুক্তিকে সবলে তার দিকে টেনে এনে, তার কাজের সাফাই গেয়ে যায়। যাক্ তোর দরকার ত টাকা!"

তারামণি এক গাল হাসিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই তাই! টাকার জন্যই ত সব! পাপ পুণ্যির নজীর টাকার কাছে চলে না।"

হেমরাণী তাহার হাতের সোণার চুড়ীগুলি ও বালা জোড়াটি আর গলার হার ছড়াটীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"আমার এই গয়নাগুলো যদি তোকে দিই?"

সেই চক্‌চকে পাকা সোণার গহনাগুলির দিকে বারেকমাত্র সতৃষ্ণ নেত্রে চাহিয়া, তারামণি আমতা আমতা করিয়া বলিল—"কেন - কেন, তোমার ও সব গয়না খুলে আমায় দেবে কেন মা?"

হেমরাণী। তুই আমায় এখান থেকে মুক্ত করে দে।

তারামণি বিস্মিত নেত্রে হেমরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তা হ'তেই পারে না। তোমায় পাবার জন্যে এই সুরেন্দ্রবাবু যে খুব লালায়িত তা যে সব কাণ্ড তোমাকে পাবার জন্য হয়ে গেল, তা থেকেই ত বুঝতে পাচ্ছ মা! তোমায় যদি ছেড়ে দি, আর এই গোঁয়ার-গোবিন্দ মাতাল সুরেন্দ্র তা জানতে পারে, তা হ'লে আমার পিটে ঘোড়ার চাবুক বসাবে, না হয় আমায় খুন করেই ফেল্‌বে।"

হেমরাণী একটু বিরক্তির সহিত বলিল—"আর যদি এসব ব্যাপার নিয়ে কখনও কোন পুলিস হাঙ্গাম ঘটে, তখন কি মনে ভেবেছ, এই সুরেন্দ্রবাবু তোমায় এ ব্যাপারে না জড়িয়ে ছেড়ে দেবে!"

এ কথাটা শুনিয়া, তারামণির প্রাণে একটা আতঙ্ক জন্মিল। হেমরাণী যাহা বলিতেছে, তাহা একটুও অসম্ভব নয়। এই ব্যাপারে লাভের পনর আনা তিন পাই খাইবে সেই রুদ্দুর নায়েব। তবে এত ঝক্কি সহ্য করা কেন? এই জন্য হেমরাণীর এই কথাটা শুনিয়া সে একটু দমিয়া গিয়া বলিল—"তুমি যা বলছো, আমাকে একবার ভাল করে ভাবতে দাও। আমি তোমার সম্বন্ধে কতটা কি কর্ত্তে পারি, তা কাল তোমাকে জানাবো।"

হেমরাণী। তাই ভাল! কিন্তু একটা কথা আমাকে সত্য বলবে কি?

তারামণি। কি?

হেমরাণী। এরা কোথায় আমাকে এনেছে তা বলতে পার তারামণি?

তারামণি। কলকেতায় কাশীপুরের বাগানে।

তারামণির মনটা হেমরাণীর কথায় খুবই ওলট-পালট হইয়া গিয়াছিল। সে যখন বুঝিল, রুদ্দুর নায়েব যখন এ ব্যাপারের মধ্যে আছে, আর গোড়া হইতে তাহাকে আনান হয় নাই, তখন সে মনে মনে স্থির করিল, কেন বৃথা পাঁক ঘাটিয়া হাতে গন্ধ করি। দেখি—যদি এর কোন উপকার করিতে পারি। অই গয়না গুলো যদি সত্যিই দেয়, তাহ'লে বড় কম পাবোনা। না হয় শেষ রামানন্দপুর থেকে বাস উঠিয়ে, কোন দূর গাঁয়ে চলে যাব।

মধ্যে মধ্যে তারামণির বাতজ্বর দেখা দেয়। সে দিন তার শরীরটা বড়ই খারাপ। সে জানিত যে হেমরাণী এখন আর পলাইবার চেষ্টা করিবে না। সুতরাং সে তাহার নিজের রোগের যাতনায় কাতর হইয়া পাশের একটী কক্ষে শুইল। এ কয় দিন হেমরাণীর সঙ্গে রাত জাগিয়া সে বড়ই কষ্ট পাইয়াছে, সুতরাং সে খুব শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

হেমরাণী ঠিক এই সময়ে বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছে,—"হায়! এই কি নারীর অদৃষ্ট! যার বাড়া ভয়ানক কলঙ্ক নাই, বিনা দোষে, আমার সে কলঙ্কও হইয়াছে। আর এ অপবাদ দিয়াছেন কে—আমার স্বামী। যিনি

আমার ইহকাল পরকাল, লজ্জা নিবারণের কর্ত্তা, আবরু রক্ষার মালিক, তিনিই সকল ব্যাপার ভাল করিয়া না বুঝিয়া আমার হৃদয় খানিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বলিতে পারি না—নারীকুলে আমার মত অভাগিনী আর কেহ জন্মিয়াছে কিনা? মরিলে হয় না? একবার ত মরিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, পারিলাম কই? মৃত্যু পর্য্যন্ত যে এ অভাগিনীর উপর বিরূপ। ভগবান! নারায়ণ। কৃপা কর। আর যে যাতনা সহিতে পারি না।"

হেমরাণী যখন এইরূপ মস্তিষ্কবিপ্লবকারী চিন্তায় অভিভূত, তখন, সেই গভীর নিশীথে কে একজন আসিয়া মৃদুভাবে তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া বলিল—"তুমি ঘুমাইয়াছ কি?"

হেমরাণী চমকিয়া উঠিয়া শয্যা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া দেখিল, এক স্ত্রীমূর্ত্তি তাহার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। ঘরের কোণে একটী প্রদীপ মিট-মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। হেমরাণী ঠিক ধরিতে পারিল না, এই অপরিচিতা স্ত্রীলোক কে? সে বলিল—"কেও তারামণি?"

সেই স্ত্রীলোক বলিল—"চুপ! আস্তে কথা কও। আমি তারামণি নই। আমি হরিমতি?"

হেমরাণী সবিস্ময়ে বলিল—"আমার সহিত তোমার কি প্রয়োজন?"

হরিমতি। আমি তোমায় মুক্ত করিতে আসিয়াছি।

হেমরাণী। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু তোমার পরিচয় জানিতে পারিব না কি?

হরিমতি। সনাতন দাদা আমাকে এখানে পাঠাইয়াছে। কোন ভয় নাই তোমার। আমার উপর বিশ্বাস কর! এই সুরেন্দ্র, একদিন তোমার মত আমাকে এই বাগানে এইভাবে আটক করিয়া, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তারপর অতি নিষ্ঠুরের মত পরিত্যাগ করিয়া, আমায় পথে বসাইয়াছে।

হেমরাণী এই অপরিচিতা রমণীর কথায় যেন আশার আলোক দেখিতে

পাইল। সে ভাবিল ভগবান তাহার উদ্ধারের জন্য নিশ্চয়ই এই দেবদূতীকে পাঠাইয়াছেন। সে অতি ব্যগ্রভাবে বলিল—“চল তাহা হইলে আমরা যাই!”

হরিমতি বলিল—“না বোন্! আজ নয়, এখন নয়। বাগানের প্রাচীর খুব উচুঁ। সদর ফাটকে কড়াকড় পাহারা। আমি যে উপায়ে আজ এ বাগানে প্রবেশ করিয়াছি, তুমি সে উপায়ে বাহিরে যাইতে পারিবে না। সুবিধা মত পথ না পাইলে তোমায় মুক্ত করিতে পারিতেছি না। আজ আর কাল দুটো দিন এখানে থাক। এখানকার ঝি সেই তারামণি কোথায় বলিতে পার?”

হেমরাণী। সে এই পাশের ঘরে ঘুমাইয়া আছে।

হরিমতি বলিল—“আজ এই পর্য্যন্ত। যখন আমি তোমার ধর্ম্মছেলে সনাতনের প্রেরিত, তখন তুমি আমাকে ষোল আনা বিশ্বাস করিতে পার। মনে রাখিও, উপযুক্ত সুযোগ না পাইলে সুরেন্দ্র কখনই তোমার উপর অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না। সে সুযোগ ঘটিতেও সময় দিব না।

হরিমতি আর কিছু না বলিয়া, তখনই কক্ষের বাহিরে নিঃশব্দে চলিয়া গেল। হেমরাণী আশা ও নিরাশার তুমুল আবর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া সেই রাত্রিটা কাটাইয়া দিল।

(৩২)

রুদ্রারাম, রামানন্দ পুরে ফিরিয়া রাসমোহনের লিখিত সেই দলিল খানি রেজেষ্ট্রী করিবার জন্য, খুবই চেষ্টা করিতে লাগিল। টাকাটা সে মনিবের তহবিল হইতে দিয়াছিল বলিয়া, এই টাকার জন্য সে নিজে দায়ী। সুতরাং দলিলটা রেজেষ্ট্রী করিয়া পাকা করিয়া না লইলে, আর রমাপ্রসন্নের ভিটা-বাড়ী সেই দলিল বলে দখল করিতে না পারিলে, সে বিশবাঁও জলে নামিয়া পড়িবে।

অভাগিনী হেমরাণীর সর্ব্বনাশ সাধনের পর, রুদ্ররাম অতি গোপনে আর একবার রসুলপুরে চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া শুনিল, যে দিন তাহার সেই সাংঘাতিক পত্র খানি রাসমোহনের হস্তগত হয়, সেই দিন রাত্রেই রাসমোহন বাড়ী ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সে তাহার সন্ধান জন্য কলিকাতার সেই আড্ডায় ও অন্যান্য স্থানে অনেক অনুসন্ধান করিল। কিন্তু কোথাও তাহার দেখা পাইল না।

তখন সে মহাবিপদে পড়িয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, রামানন্দপুরের এক অতি দুঃস্থ প্রজা কাঙ্গালীচরণ কপালিকে, এক শত টাকায় রাজি করিয়া তাহাকে ভাল কাপড় চোপড় পরাইয়া, সম্পত্তি বিক্রেতা রাসমোহনের নকল সাজাইয়া, সেই দলিলখানা রেজেষ্ট্রী আফিস হইতে রেজেষ্ট্রারি করাইয়া লইল। এ সব জাল জালিয়াতিতে সে সিদ্ধ হস্ত, সুতরাং বায়াকে সনাক্তের জন্য তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

তারপর দুই জন পাইক সঙ্গে লইয়া, একদিন সে দেবানন্দপুরে হেমরাণীর পৈত্রিক ভিটাটী দখল করিতে গেল। তখনও সেই বাড়ীর রক্ষক রতনা পাইক ও সনাতন। তাহারা দুই জনেই সেখানে তখন উপস্থিত।

এই অবস্থায় লোকজন সঙ্গে রুদ্ররামকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, সনাতন ও রতন বড়ই বিস্মিত হইল। সনাতন বলিল—"এখানে কি চান আপনি নায়েব মশাই?"

রুদ্ররাম প্রভুত্ব সূচক স্বরে বলিল—"এই বাড়ী আমি বিক্রয় কোবালায় খরিদ করিয়াছি। আর এ ক্রীত সম্পত্তি আমার মনিবের হইয়া দখল করিতে আসিয়াছি।"

সনাতন একথায় খুবই বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল,—"কে আপনাকে এ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে?"

রুদ্ররাম। হেমরাণীর স্বামী, রমাপ্রসন্নের জামাতা, রাসমোহন আমাকে বিক্রয় করিয়াছে।

সনাতন। হেমরাণী জীবিত থাকিতে, রাসমোহন ঠাকুরের এ সম্পত্তিতে অধিকার কি ?

রুদ্ররাম বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"সে তর্ক আমি তোমার মত চাষার সহিত করিতে চাই না। আদালত খোলা আছে, স্বচ্ছন্দে তুমি বা তোমার দল সেখানে যাইতে পার।"

রুদ্ররামের এই দর্পিত কথাগুলি, সনাতনের গায়ে যেন আগুণের কণা ছড়াইয়া দিল। কিন্তু সে অনেক কষ্টে রাগটা দমন করিয়া বলিল,—"ভাল! তুমি তোমার কাজ কর, আমিও আমার কাজটা শেষ করিয়া আসি।"

সনাতন উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া সরাসর হেমেন্দ্রকুমারের কাছে গিয়া বলিল—"আপনি জমীদার—দেশের রাজা। এক অত্যাচার-পীড়িতা, অনাথার বাস্ত ভিটাটুকু যায়। আপনি কি তার কোন ব্যবস্থাই করিবেন না ?"

সনাতন হেমেন্দ্রকুমারের পা জড়াইয়া ধরিতে গেল। হেমেন্দ্র পা সরাইয়া লইয়া বলিলেন—"ব্যাপার কি সনাতন ?"

সনাতন হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"ছোট তরফের রুদ্ররাম নায়েব এক জাল দলিলের বলে, রমাপ্রসন্ন ঠাকুরের ভিটাটুকু দখল করিতে আসিয়াছে। তার সঙ্গে দু'জন নগদী লাঠিয়াল। আপনার জমীদারীর, আপনার নিজ গ্রামের মধ্যে, সেই শয়তান এই অত্যাচার করিয়া চলিয়া যাইবে, ধর্ম্মাবতার কি এটা মুখ বুজিয়া সহ্য করিবেন ? যদি তাই করেন এ ভিটা রক্ষার জন্য না হয় এ গোলামই জীবন দান করিবে। ধর্ম্মাবতার! এই রুদ্দুর নায়েব কি দেশের মালিক যে সে যা ইচ্ছা তাই করিবে ?"

হেমেন্দ্রকুমার কথাটা শুনিয়া রাগে গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বটে!"

এত স্পর্দ্ধা সে ব্যাটার!" হেমেন্দ্রের চোখ দুটী ভীষণ ক্রোধে তখন বাঘের চোখের মত জ্বলিতেছে। রাগের চোটে সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

তিনি তখনই তাঁহার সর্দ্দার লাঠিয়াল স্বরূপকে তলব করিয়া পাঠাইলেন। স্বরূপ জাতিতে বাগ্‌দী—অতি দুর্দ্ধর্ষ। মৃত্যু—তাহার পক্ষে খেলার জিনিস। সে হেমেন্দ্রের সদর বাড়ীর পিছনেই তাঁহার পুরীরক্ষক রূপে বাস করিত।

স্বরূপ আসিয়া তাহার মনিবকে নমস্কার করিয়া বলিল—"হুকুম কি ধর্ম্মাবতার?"

হেমেন্দ্র কঠোর স্বরে আদেশ করিলেন—"এখনই চারি জন লাঠিয়াল লইয়া গিয়া রমাপ্রসন্ন ঠাকুরের ভিটা রক্ষা কর। সাবধান! যেন নরহত্যা না হয়! আর যে শয়তান ফেরেবি করিয়া অতিরিক্ত স্পর্দ্ধা প্রকাশে, আমার গ্রামে আসিয়া আমার প্রজার বাস্ত উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে কাণে ধরিয়া এখনি এখানে হাজির কর। এই সনাতন তোমাদের সেই লোকটাকে চিনাইয়া দিবে। আমি এখনই পুলিসে এ সংবাদ পাঠাইতেছি।"

বলাবাহুল্য, স্বরূপ হুকুম পাইবামাত্রই চারিজন বাছা বাছা লাঠিয়াল ও সড়কীওয়ালা লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। রুদ্ররাম স্বরূপকে যমের মত ভয় করিত। বেগতিক দেখিয়া সে দল বল সমেত লম্বা দিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু পারিল না। স্বরূপ সর্দ্দার বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিল।

রুদ্ররাম হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"এখন আমাকে বাগে পাইয়া এইভাবে অপমান করিতেছ, কিন্তু জানিও, এর পর এই জন্য তোমাকে জেলে যাইতে হইবে। এ কথাটা যেন মনে থাকে।"

"সে জন্য তোমায় কষ্ট পেতে হবে না। স্বরূপের না হোক তোমার

জেলে যাবার ব্যবস্থা আমাদের দিক থেকেই হবে”—এই কথা বলিয়া সনাতন স্বরূপকে বলিল—“স্বরূপ ভাই! কেন মিছে দেরী কচ্ছ? ব্যাটার কাণ পাকড়াও।”

মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ ভুজঙ্গের মত রুদ্ররাম, মনে মনে গর্জ্জন করিতেছিল। সে বুঝিল—সে যাত্রা তাহার নিস্তার নাই। কাজেই সে স্বরূপকে বলিল—“আমি বিনা গোলযোগে তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আর এত লোকের সুমুখে আমায় অপমান করো না।”

বলা বাহুল্য, কলিকাতার মত সহর হইলে, মজা দেখিবার জন্য সেখানে একটা চড়ক-হাটার লোক জমিয়া যাইত। কিন্তু পল্লীগ্রাম বলিয়া জনতাটা তত জমাট হইতে পারে নাই। তাহা বলিয়া যে একাবারে হয় নাই তাও নয়।

সহসা এই জনতার মধ্য হইতে কে একজন বিকৃত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—“লাগাও শালাকে জুতো। শালা আমাকে কি ঠকানটাই ঠকিয়েছে!”

সনাতন মুখ ফিরাইয়া দেখিল—“এই বক্তা আর কেউ নয়। সেই গ্রামের একটা ভবঘুরে কাঙ্গালী কপালি।”

এই কপালীকে দেখিবামাত্রই রুদ্ররাম বড়ই দমিয়া পড়িল। একশত টাকা দিব বলিয়া, জাল রাসমোহন সাজাইয়া, এই কপালীর সহায়তাতেই সে দলিল খানি রেজেষ্টারি করাইয়া লইলেও, তাহাকে পঁচিশটী বই টাকা দেয় নাই। এত বড় দাগাবাজ সে!

সনাতন, কাঙ্গালীকে কাছে টানিয়া লইয়া কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিল—“ব্যাপার কি কপালীর পো!”

কাঙ্গালী তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলে—সনাতন একটা আশার আলোক দেখিতে পাইয়া বলিল—“ভয় কি কপালির পো! আমি হেমেন

বাবুকে বলিয়া তোমার টাকা আদায় করিয়া দিব। তুমি আমাদের সঙ্গে আমার বাবুর কাছে চল।”

স্বরূপ রুদ্ধশ্বাস রুদ্ররামকে লইয়া তাহার মনিব হেমেন্দ্র বাবুর বৈঠক খানায় উপস্থিত করিয়া ছাড়িয়া দিল।

রুদ্ররাম স্বরূপের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—“হুজুর! আমি দস্তুর মত রেজেষ্টারি দলিল লইয়া রমাপ্রসন্ন বামুনের ভিটা দখল করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি এমন বে-আইনি কাজ করিলেন কেন?”

হেমেন্দ্র রুদ্ররামের এ ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া, স্বরূপকে হুকুম করিলেন—“পাঁচ জুতা লাগা ব্যাটাকে—স্বরূপ! শয়তান আমাকে আইন দেখাইতে আসিয়াছে।”

স্বরূপকে জুতা খুলিতে দেখিয়া রুদ্ররাম ভয় পাইয়া হেমেন্দ্রের পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—“হুজুর! আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে এ গ্রাম হইতে চলিয়া যাইতেছি।”

দয়াবান হেমেন্দ্রকুমার অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন—“ভাল! আমি তোমায় মার্জ্জনা করিতে পারি, যদি তুমি আমার প্রশ্ন গুলির ঠিক ঠিক উত্তর দাও। ও ভিটা রমাপ্রসন্ন বাবু আমার কাছে অনেক দিন আগে বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন। আমার অনুমতি না লইয়া তুমি সে ভিটার প্রবেশ কর কি সাহসে?”

রুদ্ররাম বলিল—“রমাপ্রসন্ন ঠাকুরের জামাতা, রামমোহন আমার মনিবের কাছে টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। আমার বেনামীতে মনিব ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। আমি তাহা সম্প্রতি রেজেষ্ট্রী করাইয়া লইয়াছি।”

ঠিক এই সময়ে কাঙ্গালীকপালী সনাতনের সহিত সেই বৈঠক খানা

গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিল—"হুজুর! সাপকে ধরে ছেড়ে দিতে নাই। এ শয়তান ব্যাটা—ভারি জালিয়াত। আমাকে এক রাশ টাকা কবুল করে জাল রাসমোহন বামুন সাজিয়ে, ব্যাটা দলিল রেজেষ্টারি করে নিলে। তার পর পঁচিশ টাকা বই দিলে না। ও শয়তানকে জব্দ করবার জন্য সাক্ষী দিয়ে যদি আমাকে জেল খাটিতেও হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত।"

দেবানন্দপুরেই পুলিস ষ্টেসন। তখন নসীরাম বাবু বলিয়া একজন সব-ইনস্‌পেকটার থানার চার্জ্জে ছিলেন। হেমেন্দ্রের আবাসবাটী হইতে পুলিস-ষ্টেসন বেশী দূরে নয়। ন্যায়পরায়ণ, প্রজারঞ্জক জমীদার বলিয়া নসীরাম বাবু হেমেন্দ্রকুমারকে বড়ই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। হেমেন্দ্রের আহ্বানে, তনি তখনই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর তাঁহারই উপদেশে, পার্শ্বের কক্ষে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।

হেমেন্দ্রকুমার রুদ্ররামের মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"এই লোকটী যা বলিতেছে, তা সত্য কি?"

রুদ্ররাম, সন্তরণজ্ঞানহীন লোকের মত গভীর জলে ডুবিয়াও আবার ভাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"আমি এ পর্য্যন্ত একে চোখে দেখি নাই!"

হেমেন্দ্র। ও কথা এখন থাক। কে সত্যকথা বলিতেছে, তাহা তোমার বিরুদ্ধে মোকদ্দামা করা হইলেই প্রমাণ হইবে। তোমায় আমি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সত্য বল—হেমরাণী এখন কোথায়?

রুদ্ররাম। তাহার আমি কিছুই জানিনা!

হেমেন্দ্রকুমার। হেমরাণীকে শ্মশান ঘাট হইতে ডাকাতি করি লইয়া গিয়াছিলে তুমি?

ধর্ম্মের কল আপনি নড়ে। কে জানে কি কারণে রুদ্ররাম বলিল- "আমি সে দলে ছিলাম বটে, কিন্তু আমার মনিব আর তারামণির চেষ্টাতে এ কাজ হইয়াছে। আমি তত্তটা দোষী নই।"

হেমেন্দ্রকুমার গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন—"নসীরাম বাবু! একবার এ ঘরে আসুন।"

দুই ঘরের মাঝখানে সে দরোজা ছিল, তাহা ঠেলিয়া পুলিসের পোষাক পরা, ইনস্‌পেক্টার নসীরাম বাবু সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। এই নসীরাম বাবুকে রুদ্ররাম খুব ভাল রকমই জানিত।

হেমেন্দ্রকুমার বলিলেন—"বোধ হয় আপনি পাশের ঘর হইতে সব কথাই শুনিয়াছেন। আমি এ লোকটার নামে আপনার থানাতে ডায়ারী করাইয়া আসিয়াছি। থানায় না গেলে, এর মুখ হইতে সত্য কথা বাহির হইবে না। এখন আপনি আপনার কর্ত্তব্য করিতে পারেন।"

হেমেন্দ্র বাবু, ইনস্‌পেক্টার নসীরাম বাবুর জন্য একখানি গাড়ী আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। নসীরাম বাবু, কাঙ্গালী কপালি সনাতন ও রুদ্ররামকে লইয়া সেই গাড়ীতে উঠিয়া থানায় চলিয়া গেলেন।

(৩৩)

হেমরাণীর মনটা খুবই খারাপ। হরিমতি কবে আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে, কেবলমাত্র এই আশাতেই সে সাহসী হইয়া দিন কাটাইতেছে।

আর সুরেন্দ্রর মনটাও আজকাল খুব খারাপ যাইতেছে। কয়েক দিন হইতে সে রুদ্ররামের কোন পত্রাদি পাইতেছিল না। কেবলমাত্র নবীন খানসামা, এক খানা পোষ্ট-কার্ডে লিখিয়াছে,—"এখানে একটা ভয়ানক গোলযোগ বাধিয়াছে। সেটার শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া আমি হুজুরের নিকট হাজির হইতে পারিতেছি না।" এই জন্য সুরেন্দ্র বড়ই চঞ্চল।

মনের এই চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য, সুরেন্দ্র সেই দিন সন্ধ্যার পর হইতে মদিরার মাত্রা বাড়াইল। চাকর বাকরদের বিদায় করিয়া দিয়া, নিজের কক্ষে একাকী বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

সহসা হেমরাণীর সুন্দর কান্তি তাহার চোখের সুমুখে ফুটিয়া উঠিল। আর শয়তানও সেই সময়ে আসিয়া, তাহার কাণে কাণে বলিল—“আজ তোমার যে সুযোগ আসিয়াছে, এ সুযোগ আর কখনও ঘটিবে কিনা সন্দেহ। তারামণি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, হেমরাণী নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। আর তোমার ঠিকা ঝি, সেও আজ রাত্রের জন্য তোমার কাছে ছুটী লইয়া চলিয়া গিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। জোর হাওয়া বহিতেছে। চারিদিকে মিশকালো অন্ধকার। হেমরাণী সহস্র চীৎকার করিলেও কেহ তাহা শুনিবে না। কেহ তাহার সাহায্যের জন্য আসিবে না।”

তখন রাত্রি এগারটা উত্তীর্ণ হইয়াছে। মদিরা পানে উত্তেজিত মস্তিষ্ক, বিকল চিত্ত সুরেন্দ্র, শয়তানের এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আর এক মাত্রা ব্রাণ্ডি পান করিল। তারপর একটী ক্যাণ্ডেল-ষ্টিক, হাতে করিয়া, ব্রাণ্ডির ফ্লাস্কটী তাহার কোটের পকেটে পুরিয়া, চোরের মত অতি ধীর পদে নীচে নামিয়া আসিল।

হেমরাণী তাহার কক্ষের দরোজাগুলি বন্ধ করিয়াই শুইয়াছিল। কিন্তু সে অভাগিনী জানিত না, পিছনের দিকে যে ছোট দরোজাটী ছিল, তাহার খিল অন্যদিক হইতে বন্ধ আছে। এই ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়াই সুরেন্দ্র হেমরাণীর কক্ষ মধ্যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিল।

আধারসমেত হাতের বাতিটি, এক কুলুঙ্গীর মধ্যে রাখিয়া সে কম্পিত হৃদয়ে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, হেমরাণীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“কি অপূর্ব্ব রূপ! জাননা তুমি হেমরাণী! আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে পাইলে, এ দুনিয়ার সকল সুখই অগ্রাহ্য করিতে পারি।”

অভাগিনী হেমরাণী তখন নিদ্রিত। সে জানিতে পারে নাই, তখনই তাহার কি মহা সর্ব্বনাশ ঘটিবে! মূর্ত্তিমান পিশাচরূপে সুরেন্দ্র তাহার

শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। শিকারলোলুপ বাঘ যেমন একদৃষ্টে তাহার শিকারের দিকে চাহিয়া থাকে, সুরেন্দ্রর অবস্থা ঠিক সেইরূপ।

পলকহীন নেত্রে তৃষিতহৃদয়ে সুরেন্দ্র হেমরাণীর সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। শুভ্র উপাধানের উপর ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মৃণালবৎ বাহুবল্লী অসাবধান ভাবে, উপাধানের উপর পতিত। মৃদু বিকম্পিত উরস দেশের বস্ত্র, নিদ্রাঘোরে স্থানচ্যুত হইয়াছে। আরক্ত ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে।

সুরেন্দ্র তাহার পকেট হইতে ব্রাণ্ডির আধারটী বাহির করিয়া আবার মদিরা পান করিল। তাহার অবসন্ন হৃদয়ে, লালসার আগুণ হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে জ্ঞান বুদ্ধি, বিবেক, কর্ত্তব্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, ইহকাল পরকাল, সবই ভুলিয়া গেল। সে দৃঢ় সংকল্প করিল, আজই সে হেমরাণীকে তাহার মনের কথা ব্যক্ত করিয়া, তাহার প্রাণের বোঝাটা নামাইয়া ফেলিবে। আজই তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, তাহার প্রাণের জ্বালা শান্তি করিবে। এই কলুষিত বাসনার উত্তেজনায়, সে সহসা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"হেমরাণি—হেমরাণি!"

এ চীৎকারে হেমরাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে নামিয়া পড়িয়া বলিল—"কে আপনি?

সুরেন্দ্র জড়িতস্বরে বলিল—"আমি সুরেন্দ্র! আমি ছোট—তরফের মালিক—জমীদার সুরেন্দ্রকুমার! তোমার ক্রীত দাস! আর আমি এভাবে জ্বলিতে না পারিয়া, এই গভীর নিশীথে তোমার কক্ষে তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। হেমরাণি! তোমাকে পাইবার জন্য আমি না করিয়াছি কি? তবুও পাই নাই। দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

হেমরাণী মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিল, যে তাহার সমূহ বিপদ উপস্থিত। এ বিপদে সাহস হারাইলেই তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিবে! এজন্য সে সাহস সঞ্চয় করিয়া

প্রাণটাকে খুব জোরে বাঁধিয়া বলিল—"আমার সর্ব্বনাশ করিবেন বলিয়া যাহা কিছু আপনি করিয়াছেন, অতি হৃদয়হীন মানুষেও তাহা করিতে পারে না। সুরেন্দ্রবাবু আপনি না শিক্ষিত? আপনি না এক মহৎ বংশে জন্মিয়াছেন? ছি! ছি! এ পাপকথা মুখে আনিতেও আপনার সংকোচ বোধ হইল না? এখনও নির্লজ্জের মত আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন আপনি?"

সুরেন্দ্র জড়িতস্বরে বলিল—"দোষ কি আমার একার হেমরাণি! তোমার ঐ ভুবনমোহন সৌন্দর্য্যকে দোষ দাও সুন্দরি! হায়! কেন আমি তোমার ঐ রূপ দেখিয়াছিলাম?"

হেমরাণী দেখিল, সুরেন্দ্র যথেষ্ট পরিমাণে মদ্য পান করিয়াছে। তাহার স্বর জড়িত। হাত কাঁপিতেছে—কথাগুলি বলিতে কষ্ট বোধ হইতেছে। সে বুঝিল, সুরেন্দ্রের সহিত বাজে কথায় যতটুকু সময় সে কাটাইয়া দিতে পারে, ততক্ষণই তাহার মঙ্গল।

এই জন্য হেমরাণী সাহস সঞ্চয় করিয়া ঘৃণাপূর্ণস্বরে বলিল—"ছার এ রূপ! এ রূপ কি চিরদিন থাকিবে সুরেন্দ্রবাবু? আপনার ঐ রূপের মোহ কি চিরদিন এই ভাবেই থাকিবে? তবে কেন এ শোচনীয় মহা ভ্রম আপনার! আমি আপনার জ্যেষ্ঠ হেমেন্দ্রবাবুকে দাদা বলিয়া ডাকি। সেই সম্পর্কে আপনিও আমার সোদরতুল্য। আমি অনাথা। এ দুনিয়ায় আমার আপনার বলিতে কেউ নাই! শক্তিমান পুরুষ আপনি। এই শক্তির অপব্যবহারে পাপ—সদ্ব্যবহারে পুণ্য। অনাথাকে অযথা পীড়ন করিয়া কি লাভ সুরেন্দ্রবাবু! উপরে ভগবান আছেন। মানুষেরও ইহকাল পরকাল আছে। পাপ পুণ্য বিচারশক্তি আছে। সামান্য এক মুহূর্ত্তের ভ্রমে পড়িয়া, আপনি এক কুলমহিলার মহা সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? হায়! এ বীভৎস মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে সুরেন্দ্রবাবু?

এ সব কথা শুনিবার জন্য ত সুরেন্দ্র সেখানে আসে নাই। তখন

তাহার প্রাণে প্রবল গর্জ্জনে বাসনার আগুণ জ্বলিতেছে। তাহার আশার ও আকাঙ্ক্ষার ধন, স্বপ্নমাধুরীমাখা দেবীপ্রতিমা যে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। তবুও সে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। কি আফ্‌শোস!

সুরেন্দ্র তাহার ব্রাণ্ডির ক্ষুদ্র ফ্লাস্কটী বাহির করিয়া সেই আধারে যতটুকু মদিরা ছিল, সবটা তাহার গলায় ঢালিয়া দিল। আর সেই তীব্র উত্তেজনাময়ী সুরাপ্রবাহে, তাহার হৃদয়ের শীলতা, করুণা, বিবেক জ্ঞান, সবই তৃণের মত ভাসিয়া গেল।

সে আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—"আমি তোমায় সোনায় মুড়িয়া দিব, হীরায় সাজাইয়া দিব। রাজরাণীর মত আদরে রাখিয়া চিরদিন তোমার গোলাম হইয়া থাকিব। আমার একটা অনুরোধ রক্ষা কর। আমার সঙ্গে একবার উপরের বৈঠকখানায় চল। অনুরাগ না পাই, তোমার বিরাগেই আমার তৃপ্তি। স্নেহ না পাই, তোমার নিষ্ঠুরতাতেই আমার আনন্দ। এস—এস হেমরাণী! এস এস আমার জীবনানন্দদায়িনী! এস এস প্রাণাধিকে!" এই কথা বলিয়া সে হেমরাণীর খুব কাছে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

হেমরাণী সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"নারায়ণ! রক্ষা কর! হায়! এ বাড়ীতে এমন কেউ কি নাই, যে আমাকে এই মানুষরূপী রাক্ষসের হাত হইতে উদ্ধার করে?"

সহসা সেই উন্মুক্ত সিঁড়ির দ্বার দিয়া এক স্ত্রীলোক সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"কেউ না কেউ—আছে বই কি মা! কেউ না থাকে—ভগবান ত আছেন! কার সাধ্য সতীর দেহ স্পর্শ করে!"

সহসা সেই রাত্রে, হরিমতিকে সেই কক্ষমধ্যে সশরীরে দেখিয়া, সুরেন্দ্র হেমরাণীর আশা ছাড়িয়া দিয়া, ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল—"হরিমতি! শয়তানি তুই এখানে কেন?"

হরিমতি হো হো শব্দে, উন্মাদিনীর মত হাস্য করিয়া বলিল—"আমি শয়তানী—না তুমি শয়তান! সাধ্য কি তোমার, যে তুমি এই সতীরাণীর দেহ স্পর্শ কর। তোমার পাপের সহায় রুদ্ররাম এখন হাজতে পচিতেছে, তোমার পাপ সহচরী তারামণি মরণাপন্ন অবস্থায় শয্যায় শুইয়াছে, আর হেমেন বাবু তোমার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া এই হেমরাণীকে অপহরণ করার জন্য পুলিশ লইয়া তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছেন! আর আমি আসিয়াছি, এই অভাগিনী হেমরাণীকে তোমার কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য!"

এই কথা বলিয়াই, হরিমতি তাহার বুকের ভিতর হইতে সহসা একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল—"সাবধান! ভাল চাও ত এখনি এ স্থান ত্যাগ কর। আমার সৎপরামর্শ শোন। কাশীপুরের এই বাগান ত্যাগ করিয়া পশ্চিমে কোথায় পলাইয়া যাও। রমাপ্রসন্ন মরেন নাই। তিনিই তোমার নামে মেয়ে চুরির দাবি করিয়া পুলিসে জানাইয়াছেন। আর তোমার নেমকহারাম নায়েব রুদ্ররাম, জাল করিয়া হাজতে গিয়া বেগতিক দেখিয়া তোমার সম্বন্ধে সব কথাই বলিয়া দিয়াছে। এইবার তোমার জেলে ঢুকিবার পালা।"

সুরেন্দ্র হরিমতির এসব কথায় একাবারে বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িল। ভীত মেস শাবকের মত সে সভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। আর হরিমতি—সময় নষ্ট না করিয়া, হেমরাণীকে লইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিল। সেই বাগানের পিছনের দিকে, এক ক্ষুদ্র ঝোপের আড়ালে উদ্যান প্রাচীরের একাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বাগানের মালী ছাড়া কেহই তাহা জানিত না। হরিমতি সেই পথ দিয়াই বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল, আর সেই পথ দিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

তারপর একটা ক্ষুদ্র পল্লীপথ ধরিয়া, সেই ভীষণ অন্ধকাররাশি মথিত

করিয়া, তাহারা অতি কষ্টে পথ চলিতে লাগিল। কাহারও মুখে কথাটী মাত্র নাই। তবে কেহ গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য হরিমতি এক একবার পিছন ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। আর গাঢ় অন্ধকার বলিয়া হেমরাণী তাহা লক্ষ্য করিল না।

অন্ধকারে পথ লক্ষ্য করিয়া কিয়দ্দূর চলিবার পর, জাহ্নবী তীরে তাহারা এক ভাঙ্গা ঘাটের একটী সিঁড়ির উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। হরিমতি হেমরাণীকে বলিল—"আর কোন ভয় নাই। আজ রাত্রের মত আমরা নিশ্চিন্ত। এখানে কেহই আমাদের সন্ধানে আসিবে না। কাল সকালে একখানা নৌকা করিয়া আমরা আর কোথাও চলিয়া যাইব।"

হেমরাণী হরিমতির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"তুমি আর জন্মে হয়ত আমার কেউ ছিলে! তোমার এ উপকারের ঋণ কি শোধ করিতে পারিব আমি। কি কষ্টটাই তুমি আমার জন্য না করিলে?"

হরিমতি সহাস্য মুখে বলিল—"আগে দেনা—পাওনার হিসাব কহনাটাই ঠিক হোক্। তারপর না হয় ঋণের মীমাংসা হইবে।"

হেমরাণী বলিল—"আমার বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে। চল আমরা গঙ্গায় নামিয়া একটু জল খাইয়া আসি।"

দুই জনে তখন এক ভাঙ্গা চাতালের সম্মুখে আসিয়া, ঘাটের সিঁড়ি খুঁজিতে লাগিল। এই সময়ে সহসা বিদ্যুৎ চমকাইয়া ওঠায়, তাহারা যা দেখিল, তাহাতে দুজনেই ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া সেই চাতালের উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা সেই ক্ষণপ্রভার সমুজ্জ্বল আলোকে সাবিস্ময়ে দেখিল, এক সন্ন্যাসী সেই অন্ধকারে তাহাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন।

সেই সন্ন্যাসী তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে, হরিমতি ও হেমরাণী সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিল। হেমরাণীর ভয়ে বাক্যস্ফূর্তি হইতেছিল না। হরিমতি সাহসাবলম্বনে জিজ্ঞাসা করিল—"কে বাবা! আপনি?—"

সন্ন্যাসী কোমল স্বরে বলিলেন—"আমি যেই হই না কেন, সংসার বিরাগী উদাসীন ছাড়া আর কিছুই ত নই মা! আমা হইতে তোমাদের কোন অনিষ্টই হইবে না। বরঞ্চ আমি তোমাদের ইচ্ছামত উপকার করিতে পারি। কিন্তু কে তোমরা? এতরাত্রে এখানে কি করিতেছ?"

হরিমতি বলিল—"আমরা বড়ই অভাগিনী। আমার নাম হরিমতি। আর এঁর নাম হেমরাণী। ইনি মহাবিপদগ্রস্ত ব্রাহ্মণ কন্যা।"

সন্ন্যাসী বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"দেবানন্দপুরের রমাপ্রসন্নের কন্যা হেমরাণী?"

হরিমতি। আজ্ঞে হাঁ।

সন্ন্যাসী। আর তুমি দেবানন্দপুরের মাধব গোয়ালার মেয়ে হরিমতি?

হরিমতি। আপনি নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী দেবতা। তা না হইলে আমাদের পরিচয় জানিলেন কিরূপে?

সন্ন্যাসী। না মা—আমি দেবতা নই সামান্য মানুষ। সত্য কথা বল, তোমরা এতরাত্রে এখানে কেন?

হরিমতি নির্ভয় চিত্তে সুরেন্দ্রকুমারের কাশীপুরের বাগানের সমস্ত কথা সন্ন্যাসীর নিকট ব্যক্ত করিল। সন্ন্যাসী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"সব বুঝিয়াছি! আর বলিতে হইবে না। ঐ ঘাটের বাম দিকে এক বটগাছের আড়ালে, আমার নৌকাখানা বাঁধা আছে। তোমরা নির্ভয় চিত্তে আমার সঙ্গে এস। নৌকায় খাদ্য পানীয়ের অভাব হইবে না।"

সেই সন্ন্যাসী অগ্রবর্ত্তী। হেমরাণী ও হরিমতি অতি সন্তর্পণে আন্দাজে আন্দাজে, নদী সৈকতের কাদা ভাঙ্গিয়া পথ চলিতে লাগিল। অদূরে একটা বট গাছের তলায় সত্য সত্যই একখানা নৌকা বাঁধা ছিল। সন্ন্যাসী তাহাদের হাত ধরিয়া নৌকায় তুলিলেন।

নৌকায় আলো জ্বলিতেছেল। সন্ন্যাসীর মুখে সেই আলোক রেখা

পতিত হইবা মাত্রই হেমরাণী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"বা—বা !"

উত্তেজনায় ও আতঙ্কে হেমরাণীর মূর্চ্ছার মত হইল। সন্ন্যাসী তখনই পাটাতনের উপর বসিয়া, নিকটস্থ এক জল পাত্র হইতে জল লইয়া তাহার মুখে চোখে ছিটা দিয়া, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। হরিমতিও দীপালোকে সন্ন্যাসীকে চিনিয়াছিল। কিন্তু বিস্ময়বশে একটীও কথা কহিতেছিল না।

হেমরাণী চকিতনেত্রে চারি দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ! আমার পিতা কি আমার দুঃখ দেখিয়া স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন ? বাবা ! বাবা ! কোথায় গেলে তুমি ?"

সন্ন্যাসী হেমরাণীর অৰ্দ্ধ মূচ্ছিত দেহ কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—"হেমরাণী আমি মরি নাই। আজ এভাবে তোমার শুশ্রূষা করিবার জন্যই ভগবান আমাকে যেন আজ পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছেন। ঐ হরিমতি আমাকে চেনে, কিন্তু আমার নিষেধে সে একথা কাহারও কাছে ব্যক্ত করে নাই। জানিনা ঐ হরিমতি আর জন্মে তোমার কে ছিল। "বলা বাহুল্য, এই সন্ন্যাসী আমাদের রমাপ্রসন্ন।

হেমরাণী উঠিয়া বসিয়া পিতার বুকে মুখ লুকাইয়া অনেক কাঁদিল। ক্রন্দনে তাহার বুকের বোঝাটা অনেক কমিয়া গেল। সে স্নেহভরা স্বরে আবার ডাকিল—"বাবা !"

সন্ন্যাসী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন—"কেন মা ?"

রমাপ্রসন্ন খড়দহে তাঁহার এক আত্মীয়ের সহিত দেখা করিতে যাইতে-ছিলেন। পথে সন্ধ্যা হওয়ায় আর আকাশটা অন্ধকার করিয়া আসায়, তিনি মাঝিদের সেই ভাঙ্গা ঘাটের নিকট নৌকা বাঁধিতে বলেন।

প্রতি অমাবস্থার রাত্রে, তিনি জপ ও পুরশ্চারণ করিয়া থাকেন।

মেঘ কাটিয়া গেল দেখিয়া, তিনি সেই ভাঙ্গা-ঘাটের এক নিভৃত স্থানে বসিয়া গ্রহশান্তির জন্য ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতেছিলেন।

সহসা সেই ঘাটে, ভতরাত্রে দুইজন স্ত্রীলোককে দেখিয়া তিনি সন্দেহ ও কৌতূহলচালিত হইয়া, তাহাদের পরিচয় লইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। তাহার পর কি ঘটিয়াছিল, পাঠক তাহা দেখিয়াছেন।

হেমেন্দ্র বাবুর সহিত আজকাল তাঁহার নিয়মিত পত্র বিনিময় হইতেছিল। দুই দিন পূর্ব্বে, তিনি তাঁহার কলিকাতায় বাসায় হেমেন্দ্রের এক পত্র হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন, যে রুদ্ররাম তাঁহার ভিটা দখলের চেষ্টায় জাল দলিল প্রস্তুত করায়, ফৌজদারী মোকদ্দামায় পড়িয়া হাজতে গিয়াছে।

যে রুদ্ররাম আজীবন তাঁহার অনিষ্ট করিয়া আসিয়াছে, তাহার এই বিপদে তিনি আহ্লাদিত না হইয়া, বরঞ্চ একটু মনোকষ্ট অনুভব করিলেন। হেমেন্দ্র বাবু, হেমরাণীর দ্বিতীয় বিপদ সম্বন্ধে সব কথাই সনাতনের কাছে শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রমাপ্রসন্নের নিকট হেমরাণীর দ্বিতীয় বার লাঞ্ছনার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রূপেই গোপন রাখিয়া গিয়াছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, যে ইহাতে রমাপ্রসন্নের মর্ম্ম যাতনায় বৃদ্ধি হইবে মাত্র। আর রমাপ্রসন্নের মনের ধারণা, যে হেমরাণী তাহার শ্বশুর বাটীতেই আছে।

সেই দিন রাত্রে হরিমতির মুখে, তিনি সুরেন্দ্রকুমারের দ্বিতীয় অপকীর্ত্তির সমস্ত কথাই শুনিলেন। আর হেমরাণী তার পর দিন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে রামমোহনের নিষ্ঠুর ব্যবহার সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলিয়া ফেলিল।

নৌকা জাহ্নবী সলিলরাশি মথিত করিয়া, পাইল ভরে জোর হওয়ায় চলিতেছে। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। হেমরাণী তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এখন আমরা কোথায় যাইব বাবা?"

রমাপ্রসন্ন বলিলেন—"আমি আমার এক গুরু-ভাই এর সহিত দেখা করিবার জন্য খড়দহে যাইতেছিলাম। তোমাদের পাইয়া এখন সে সংকল্প

ত্যাগ করিয়াছি। এইবার আমরা কলিকাতায় পৌছিয়া, একটী দিন মাত্র শিবশঙ্কর বাবুর বাসায় বিশ্রাম করিয়া, রাত্রের ট্রেণে দেবানন্দপুরে চলিয়া যাইব। দেবানন্দপুরে গমনের আর কোন ব্যাঘাতই এখন ত আর নাই মা!"

রমাপ্রসন্ন সশরীরে দেবানন্দপুরে সহসা ফিরিয়া আসায়, একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হেমেন্দ্রকুমার রমাপ্রসন্নকে দেবানন্দপুরে ফিরিবার জন্য বিশেষ নির্ব্বন্ধ করিয়া বহুবার পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার বসত বাটীকে ইতিপূর্ব্বে বাসযোগ্য অবস্থাতেই পরিণত করা হইয়াছিল। আর রুদ্ররামের এই ভিটা দখলের পর হইতে, সনাতনই সেখানে বাস করিতেছিল।

রমাপ্রসন্ন দেবানন্দপুরে ফিরিয়া তাঁহার সন্ন্যাসী বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া গোঁফ দাড়ি মুড়াইয়া, আবার পূর্ব্বকার রমাপ্রসন্ন হইলেন। আবার তাঁহার গৃহে সন্ধ্যার দীপ জলিল। আর হেমেন্দ্রকুমার সনাতনের পিতা নবকুমার মণ্ডলকে নায়েবীপদ দিয়া, রমাপ্রসন্নকে তাঁহার জমীদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন।

আর রুদ্ররাম? সে তখন হাজতে পচিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে দলিল ও মালজাল মোকদ্দমাটা বড়ই সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। সে নিজের শোচনীয় ভবিষ্যৎ চিন্তায়, আধমরা হইয়া গিয়াছে। যার জন্য সে এত কাণ্ড করিল, সেই মনিব তাহার মোকদ্দমার জন্য কোনরূপ তদারক করিতেছেন না, বা তাহাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন না ভাবিয়া সে সুরেন্দ্রকুমারের উপর বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া, মনে মনে তাহার সর্ব্বনাশ কামনা পোষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তখন সে একেবারে কি দাঁত ভাঙ্গা হইয়া পড়িয়াছে। জেলে যাওয়া ভিন্ন তার আর কোন উপায়ই নাই।

পাপী চিরদিন পাপ করে না। এক সময়ে না এক সময়ে, বিবেক ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বড়ই দংশন করিতে থাকে। হেমরাণী, জীবনে

এই রুদ্ররামের কোন অনিষ্টই করে নাই, অথচ সে বিনাদোষে এই নিরীহা অবলার সর্ব্বনাশের জন্য যে সব ভয়ানক কাজ করিয়াছিল, তাহা পিশাচেও করিতে পারে না। সুতরাং বিবেকের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, সে এক দিন হেমেন্দ্রকুমারকে হাজতে ডাকিয়া পাঠাইল।

সহসা রুদ্ররামের এ জরুর তলব আসিল কেন, ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া হেমেন বাবু তাহার সহিত হাজতে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রুদ্ররাম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বড় বাবু! আমি অতি নরাধম! অতি শয়তান! এ জীবনে অনেক পাপ করিয়াছি, এইবার তাহার প্রায়শ্চিত্তের সময় আসিয়াছে। কিন্তু আমার সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক পাপ, রমাপ্রসন্নের কন্যা সাধ্বী হেমরাণীর সর্ব্বনাশ চেষ্টা। সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত সময় থাকিতে করিতে চাই। আমার বুকে তুষানলের আগুণ জ্বলিতেছে। বিনা প্রায়শ্চিত্তে সে আগুণ কখনই নিভিবে না।"

এই কথা বলিয়া সে, রাসমোহনকে যে সাংঘাতিক পত্রখানি লিখিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সমস্ত কথা হেমেন্দ্র বাবুকে খুলিয়া বলিল। হেমেন্দ্রকুমার এ পত্র সম্বন্ধে কোন কথাই জানিতেন না। হেমরাণী সনাতনকে পর্য্যন্ত এ পত্র সম্বন্ধে কোন কথা বলে নাই। সুতরাং ভিতরের সমস্ত সাংঘাতিক ব্যাপারটা, কেবল হেমরাণী ও রাসমোহনের মনের নিভৃত গম্ভীর মধ্যে এ পর্য্যন্ত নিবদ্ধ ছিল।

হেমেন্দ্রকুমার রুদ্ররামের সমস্ত কথা শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। ঘৃণায় তাঁহার মুখ সংকুচিত হইল। মানুষ যে এত দূর শয়তান হইতে পারে, অর্থের লোভে এতটা হীন কাজ করিতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণাতেই আসিল না। তিনি সরোষে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রুদ্ররাম! ভগবানের বজ্র নিদ্রিত নয়। সেই বজ্র তোর মাথাতেই পড়িবে। কেবল ইহকাল নয়, পরকালও তোর জন্য নূতন দণ্ড, নূতন

নরক, নূতন শাস্তি লইয়া বসিয়া আছে। এখন আমায় ডাকিয়াছিস্ কেন ?"

রুদ্ররাম বলিল—"এই সব কথা শুনাইবার জন্য। আমার বুকের বোঝাটা লাঘব করিবার জন্য। আমার মাথায় আগুণ জ্বলিতেছে, বুকের ভিতর পাঁজার আগুণ ধরিয়াছে। আপনি না হইলে, রাসমোহনকে কেহই এখানে আনাইতে পারিবে না। তাহার কাছে আমার এই ভয়ানক পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে, যে ক'টা দিন বাঁচিব এই ভাবেই আমায় জ্বলিতে হইবে।"

হেমেন্দ্র ঘৃণার স্বরে বলিল—"তোর মত শয়তানকে দয়া করাও পাপ। কিন্তু যখন তুই এতটা অনুতপ্ত হইয়াছিস্, তখন আমি রাসমোহনকে যত শীঘ্র পারি আনাইবার চেষ্টা করিব। এই কথা বলিয়া হেমেন্দ্র ঘৃণার সহিত সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

(৩৪

"দাদা !"

"কেন ভাই ?"

"আমি বোধ হয় এ যাত্রা বাঁচিব না। আমার জীবনের গণা দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। আমি তোমাদের গর্ব্বভরা রায়বংশের কুলাঙ্গার। মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। কিন্তু মরিতে বড় ভয় হইতেছে! কত পাপ আমার দাদা !"

"ছিঃ! ওকথা বলিতে নাই। এ সংসারে মানুষ মাত্রেই ভ্রমের অধীন। এরূপ কত ভ্রম, ভগবানের জগতে সকলেই নিত্য করিতেছে। তারপর আলোক বিকাশে যেমন অন্ধকার সরিয়া যায়, তেমনি বিবেকের বিকাশে অজ্ঞান বা ভ্রমও সরিয়া যায়। এজন্য তোমার জীবনে ঘৃণা জন্মিবার কোন সার্থকতাই নাই ভাই। তুমি ত পাপ কর নাই—তবে পাপকার্য্যের চেষ্টা করিয়াছিলে।"

"কিন্তু শুনিয়াছি, কোন মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে সে পাপ সঙ্গে সঙ্গে যায় দাদা।"

কথা হইতেছিল, সুরেন্দ্র ও হেমেন্দ্রের মধ্যে। হরিমতি পূর্ব্বরাে বলিয়া গিয়াছিল, তারপর দিন প্রভাতে নবীন খানসামা আসিয়া তাহারই সমর্থন করিল। রুদ্ররাম জাল করিয়া হাজতে গিয়াছে, আর সে নেমকহারামি করিয়া তাহাকেও এই সব ব্যাপারে জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা ভাবিয় সুরেন্দ্রকুমার একাবারে বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িল। শয়তান তাঁহাকে জন্মে মত ছাড়িয়া গেল। বিবেক তাহার হৃদয়ে আবার পুণ্যালোক ফুটাইয়া দিল

নিরুপায় সুরেন্দ্র, সেই দিনই কাশীপুরের বাগান ত্যাগ করিয়া, অতি গোপনে শিবরামপুরের বাগানে ফিরিয়া আসিল। ক্রমাগতঃ মর্ম্মদাহী প্রচণ্ড জ্বালাময় দুশ্চিন্তায়, তাহার মুখখানি একাবারে শুখাইয়া গিয়াছে। সে প্রাণের অস্থিরতা দমন করিতে না পারিয়া, পানের মাত্রা চারি গুণ করিয় দিল। কিন্তু রক্ত মাংসের শরীর বইতো নয়! কত অত্যাচার এই দেহে সহিবে? একদিন রাত্রে সহসা প্রবল জ্বর দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে লিভারের বেদনা তার উপর নূতন উপসর্গ কাসি ও কাসির সঙ্গে শোণিতের ছিটা। চিকিৎসক আসিল, ঔষধ ব্যবস্থা করিল, কিন্তু রোগ না কমিয় দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। সুরেন্দ্র সর্ব্ব রকমে বুক ভাঙ্গা হইয়া পড়িল।

সুরেন্দ্র বুঝিল, তাহার গণা দিনগুলি শেষ হইয়া আসিতেছে। এই শয়তান রুদ্ররামের কুটিল মন্ত্রণাতেই সে তার হেমেন দাদার শত্রু হইয় দাঁড়াইয়াছিল। এক রক্ত, এক বংশ, একই জমীদারী, কেবল বুদ্ধির দোষে হেমেন্দ্র সকল বিষয়েই তাহার হেমেন দা'র পর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই হেমেন্দ্র যে সকল বিষয়েই বড়। জ্ঞানে, লোকপ্রিয়তায়, দয়ায়, প্রাণের মহত্ত্বে, সকল বিষয়েই যে এই হেমেন্দ্র শ্রেষ্ঠ।

সে রুগ্নশয্যায় পড়িয়া দিন রাতই কেবল ভাবিতে লাগিল, এমন দেব

চরিত্র হেমেন দাদার সঙ্গে আমি কিনা এক শয়তানের ছলনায় ভুলিয়া, বিবাদ করিয়া আসিয়াছি ! হায় ! এ সংসারে আমার আপনার বলিতে ত আর কেউ নাই ! পিতা নাই, মাতা নাই, পত্নী নাই, ভগ্নী নাই, আছেন কেবল ঐ ভাই হেমেন্দ্রকুমার ! অত উদার প্রাণ যার, অত মহত্ত্বময় হৃদয় যার, অত করুণা ও ক্ষমাপূর্ণ প্রাণ যার, সেই হেমেন দাদা কি আমার এই শোচনীয় শেষ মুহূর্ত্তে, এ মহাবিপদে আমাকে ত্যাগ করিবেন ? এইরূপ ভাবিয়া অনুতপ্ত চিত্ত সুরেন্দ্র একখানি পত্র লিখিয়া, নবীনের হাতে হেমেন্দ্রের নিকট পাঠাইল। এ পত্র অনুতাপের জ্বালাময়ী শোণিত রঞ্জিত।

পত্রখানি পাঠ শেষ করিবামাত্রই, হেমেন্দ্রের চোখে জল আসিল। তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে নবীনকে বলিলেন—"ছোট বাবুর ব্যায়রাম কি খুব শক্ত হয়েছে নবীন ?

নবীন অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"হাঁ বড় বাবু ! এ যাত্রা বোধ হয় তিনি বাঁচবেন না। জ্বর, লিবারে বেদনা, মুখ দিয়া রক্ত উঠছে, আর এই কয়দিনে একাবারে যেন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছেন।"

হেমেন্দ্র তখনই পালকী আনিতে আদেশ করিলেন ও আধ ঘণ্টার মধ্যে শিবরামপুরের বাগানে পৌঁছিয়া সুরেন্দ্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন— "ভয় কি তোমার সুরেন ! তোমার বড় যে—সে এখনও বাঁচিয়া আছে। ভগবান তোমায় রক্ষা করিবেন। তোমার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত আমিই করিব।"

হেমেন্দ্রকুমার শিবরামপুরের বাগানেই রহিয়া গেলেন। সদর হইতে সিভিল সার্জ্জন সাহেবকে আনাইয়া, আরও দুই তিন জন ভাল ভাল ডাক্তার জড় করিয়া, নিজে সারারাত জাগিয়া সুরেন্দ্রর অবস্থা খুবই ভালর দিকে আনিলেন। কিন্তু অনুতপ্ত সুরেন্দ্রের মনে তখন কেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, এক সতীর উপর অত্যাচার করিতে গিয়াই তাহার এ সাংঘাতিক

রোগের সূচনা! সতীর সীমন্ত-শোভিত উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দুর কি এতই তেজ! হেমরাণী যদি আমায় মার্জ্জনা না করে, তাহা হইলে কিছুতেই আমি মনের শান্তি পাইব না। এই রোগেই আমায় মরিতে হইবে। তাই সে তার হেমেনদার সহিত উল্লিখিত ভাবে অনুতপ্ত ও নিরাশ হৃদয়ে কথোপকথন করিতেছিল।

সুরেন্দ্রকে অনেকটা সুস্থ দেখিয়া, হেমেন্দ্রকুমার বলিলেন—"তুমি খুবই ভাল আছ আজ সুরেন! একবার ঘণ্টা কয়েকের জন্য আমার দেবানন্দপুরে যাইতে হইবে। কোন বিশেষ প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর আবার এখানে আসিব।"

হেমেন্দ্রের আসিবার কারণ আর কিছুই নয়, তিনি রাসমোহনকে দেবানন্দপুরে আনিবার জন্য সনাতনকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সনাতনের সেই দিন অপরাহ্ণে ফিরিবার কথা। পত্রখানি তিনি এমন কোশলে লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহা পড়িয়া রাসমোহনকে দেবানন্দপুরে আসিতেই হইবে। সে কোনরূপ আপত্তিই করিতে পারিবে না।

তাঁহার এ অনুমান ব্যর্থ হইল না। রাসমোহন সেই পত্র পাইবামাত্র একটা দুর্ব্বোধ্য সমস্যায় পড়িয়া, সনাতনের সহিত দেবানন্দপুরে হেমেনবাবুর বাটীতে আসিল। তাহার আদর যত্ন পরিচর্য্যায় কোন ত্রুটিই হইল না।

হেমেন্দ্রবাবু রাসমোহনকে দেখিয়া, খুবই সুখী হইলেন। কেননা এই রাসমোহনের মনের অনুরাগ বিরাগের উপরই, তাঁহার স্নেহময়ী ভগ্নী হেমরাণীর ভবিষ্যৎ জীবনের সকল সুখ স্বচ্ছন্দ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া রাসমোহনকে লইয়া থানার হাজতে গেলেন।

আর রুদ্ররাম! সে রাসমোহকে দেখিয়া যেন মৃত্যু ভয়ের মত একটা বিভীষিকাময় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে তাহার পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভীষণ চক্রান্তের সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া বলিল।

আর রাসমোহন সে সব কথা শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। নিরপরাধিনী, নিষ্কলঙ্কা, পত্নীর উপর সে যে পশুর মত হৃদয়হীন ব্যবহার করিয়াছে, ইহা ভাবিয়া তাহার বুকে সহস্র শেল বিঁধিতে লাগিল। যাহা কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার এই রুদ্ররামের স্বীকারোক্তিতেই সব প্রকাশ পাইল। আর সেই সঙ্গে মনের গোলও মিটিল।

শেষ কথা।

হেমেন্দ্রের চেষ্টায়, পরামর্শে, ব্যবস্থায়, রাসমোহন রসুলপুর ত্যাগ করিয়া দেবানন্দপুরেই বাস করিতে লাগিল। আবার হেমরাণীর সুখের দিন ফিরিয়া আসিল। আবার অন্ধকারময় গৃহে উজ্জ্বল দীপালোক জ্বলিল।

সুরেন্দ্রকুমার এখন অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছেন। ডাক্তারেরা তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুরেন্দ্রকুমার উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইবার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া, একদিন সহসা হেমেন্দ্রের দেবানন্দ-পুরের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এটা কিন্তু অনেক দিন হয় নাই। কিন্তু হেমেন্দ্র হৃদয়ের গুণে আবার চূর্ণ স্ফাটিকপাত্র এক হইয়া গেল।

হেমেন্দ্রের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া দুই ভায়ে কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। সুরেন্দ্র বলিল—"দাদা! তোমার যত্নেই আমি এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। দিন কতক পশ্চিম ঘুরিয়া আসি। আমার বিষয় আশয় তুমিই দেখিও। সে রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর কন্যার উপর আমি এতটা অত্যাচার করিয়াছি, সেই রমাপ্রসন্ন আজ হইতে ছোট ও বড় উভয় তরফের জয়েণ্ট ম্যানেজার হইলেন। এই পুলিন্দাটী রাখিয়া দাও। ইহার মধ্যে আমার রেজেষ্টারি করা নিয়োগ পত্র আছে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না। আমার ঠিকানা, অর্থাৎ পশ্চিমের যখন যেখানে আমি থাকিব, তোমাকে নিয়মিতরূপে জানাইব। তোমার এ নরাধম ভাইকে ভুলিয়া থাকিও না হেমেন দাদা!"

এই কথা বলিয়া সুরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণনেত্রে হেমেন্দ্রের পদধূলি লইল। হেমেন্দ্রও স্নেহভরে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। দুই জনের চোখেই অশ্রুধারা। আজ বিরাট পাষাণ শতধা চূর্ণ হইল। বিবাদ চলিয়া গেল—ভালবাসা ফিরিয়া আসিল। অশান্তি গেল—চির শান্তি আসিল। অমাবস্যার আঁধার দূর করিয়া দিয়া, স্নেহ ও প্রেমের পূর্ণিমার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল।

তারপর সুরেন্দ্র তাহার কোটের পকেট হইতে একটী ভেল্‌ভেট-কেস্ বাহির করিয়া, তাহা হেমেন্দ্রের হাতে দিয়া বলিল—"সোনায়-গড়া, হীরেয় মোড়া, এই সিন্দুর কৌটা আমার পত্নীর ছিল। "সতীর সিন্দুরের "মূল্য কি, মর্য্যাদা কি, শক্তি কি, তাহা আমি এতদিন পরে বুঝিয়াছি। হেমরাণীকে স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ এ সোণার কৌটাটী উপহার দিলাম। সে যদি গ্রহণ না করে, তাহা হইলে বুঝিব সে আমাকে মার্জ্জনা করে নাই।" সুরেন্দ্রের চক্ষুর্দ্বয় তখন অশ্রুপূর্ণ।

সুরেন্দ্র তখনই সেই কক্ষ হইতে চলিয়া গেল। আর সেই দিন সন্ধ্যার পরই ইনস্‌পেক্‌টার সনাতন বাবু, হেমেন্দ্র বাবুকে সংবাদ পাঠাইলেন সহসা হার্টফেল হওয়ায়, রুদ্ররামের হাজতেই মৃত্যু হইয়াছে।

সম্পূর্ণ।